অভিসার রঙ্গনটী

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
৫ই ফাল্গুন ১৩৭১

প্রকাশক
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
১১/১ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
নিরঞ্জন বসু
নন্দন প্রিন্টার্স
৩৪/২ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বারো টাকা

এই প্রসঙ্গে

ইদানীং নানা ধরনের গল্প সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ একটি সমাজ বা সম্প্রদায়কে নিয়ে নানাজনের রচিত গল্পগুলির সংকলন-গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি বলেই আমার ধারণা। বিশেষ করে, বারবনিতা নারীর চরিত্র নিয়ে রচিত বাংলা গল্পগুলি একত্রিকরণের প্রচেষ্টা এই সংকলন-গ্রন্থের পূর্বে আর দেখা যায়নি বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হবে না।

আমাদের সভ্যসমাজের হিংস্র কশাঘাতে যুগে যুগে যারা আহত ও রক্তাক্ত হয়েছে, তাদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো পতিতা সম্প্রদায়। এরা আমাদের আলোকপ্রাপ্ত সভ্যসমাজের একটি অন্ধকারের দিক। একটি লজ্জা ও গ্লানির উজ্জ্বল চিহ্ন। কিন্তু তবু, আলোর পাশে অনিবার্য অন্ধকারের মতো এই পতিতা সম্প্রদায় আমাদের সভ্যসমাজের পাশাপাশিই নিত্য স্পন্দিত। সভ্যমানুষের ঘৃণ্য ও পরিহার্য হয়েও এরা আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে আবহমানকাল ধরে। আমাদের আলোর জগতের পাশে এরা গড়ে তুলেছে একটি অন্ধকারের জগত। যেখানে পাপ আর ব্যাভিচারের ইতিহাস রচিত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গতিতে।

আমাদের সেই বহুনিন্দিত ও বহু আলোচিত পতিতা সম্প্রদায়কে নিয়েই 'অভিসার রঙ্গনটী'র গল্পগুলি রচিত। তবু এ সংকলনের লেখা-গুলির মাধ্যমে শুধু সেই অন্ধকার জগতের রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত কদর্য ব্যাভিচারের কাহিনীই বিধৃত হয়নি, লেখা হয়নি শুধু অর্থের বিনিময়ে কলঙ্কিনী পতিতা রমণীর আত্মদানের পৌনঃপুনিতার ইতিবৃত্ত। শত কলুষ সত্ত্বেও এখানে অনেক মহৎ মনের সন্ধান মিলবে, দেখা যাবে বহু বিচিত্রতর নারী চরিত্র। নির্যাতিত নারী প্রকৃতি এখানে উপস্থিত হয়েছে তার অন্তরের ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা, আর প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি নিয়ে। ওই অন্ধকার পৃথিবী থেকে সরে এসে সহজ-স্বাচ্ছন্দে সুস্থ জীবন যাপন করতে চেয়েছে কেউ কেউ। কেউবা

গড়ে তুলতে চেয়েছে একান্ত নিজস্ব একটি সংসার, মাধুর্যতায় ভরা আলোকউজ্জ্বল একটি আবাস। পতিতা নারীর দৈনন্দিন জীবনধারা, তাদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্যার সহজ চিত্রসমূহ এই সংকলনের গল্পগুলির মধ্যে নিপুণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনযুদ্ধে জর্জরিতা দুঃখিনী পতিতা রমণীর প্রতি প্রতিষ্ঠাবান কথাশিল্পীর আন্তরিক দরদ সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করেছে 'অভিসার রঙ্গনটী'র প্রতিটি লেখায়। তাদের অপমানে দুঃখে নির্যাতনে গভীর বেদনাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে রস-স্রষ্টার অন্তঃদৃষ্টিতে। তাই এ সংকলনের প্রায় প্রতিটি গল্পের প্রতিটি নারী চরিত্রই জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। নিরেট নিচ্ছিদ্র একটি অন্ধকারের ছবি আঁকতে বসে এখানে আশাবাদী কথা-শিল্পী বার বার অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছেন। এনে দিয়েছেন আলোর ইঙ্গিত। তাই 'অভিসার রঙ্গনটী'র অনেক চরিত্রই অন্ধকার গলি পেরিয়ে জীবনের রাজপথে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে। সেইজন্যই শশী তার প্রেয়সী টগরকে 'নিবিড়তর সামীপ্যে' কাছে টেনে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছে 'ভয় কি, আমি তোকে আকাশের সূয্যি এনে দেব।' আবার কেউ এসে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে, বলেছে 'এমন একটা দিন আসবে যখন তোদের এ জীবনের আর দরকার হবে না, মানুষ আর সমাজ একদিন ভেঙে পিষে নতুনভাবে তৈরী হবে।' এই পুরানো সমাজ ভেঙে পিষে নতুন সমাজ তৈরী হওয়ার স্বপ্ন শুধু শশীই দেখেনি, নগ্ন প্রত্যাশার উল্লাসে স্তিমিত দৃষ্টিতে এ স্বপ্ন আরও অনেকেই দেখেছে। প্রাত্যহিক বিলাসমত্ততার ফাঁকে ফাঁকে এই একই স্বপ্ন দেখেছে নলিনী আদরিণী আর থিরেশা, কম্‌লি, সরলা আর বেগুন। এই একই স্বপ্নের ভাবালুতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল পক্ষীবিবির নারী হৃদয়। গৃহবধূর অভিনয় করতে বসে যে একদা 'ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো' তার নিজেরই ছদ্মমূর্তিটিকে ভুল করে বড বেশি ভালবেসে ফেলেছিল। আর দেখেছিল প্রমদা। তবু সে তার কন্যা বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে অকালে নিজের সমস্ত সখ-সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করেও শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। একটি নতুন আলোর প্রত্যাশায় সেই অন্ধকার

জগতের আরও অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে—বিন্দু পারুল টগর আর নীলা স্বপ্না মাতঙ্গ। যমুনা আঙুরলতা স্বর্মা আর কৃষ্ণভামিনী রাধা—এরা প্রত্যেকেই সেই একই মায়াময় স্বপ্নের শিকার হয়ে 'অভিসার রজনটী'র মুখর মিছিলে এসে থেমে রয়েছে।

চিত্তের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবণতায় আমাদের যে সব কথা-সাহিত্যিক বারনারীর চরিত্র নিয়ে গল্প লিখেছেন, তাঁদের সেই সব রচনাগুলিই এই সংকলন-গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলো।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বিচারক' গল্প দিয়ে এ সংকলন-গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়েছে। সেজন্য তাঁর পূর্ববর্তীকালের কোনো লেখক পতিতা চরিত্র নিয়ে গল্প লিখেছেন কি না, তা ভেবে দেখার অবকাশ এক্ষেত্রে ছিল না। তবে এ-কালীন কথাসাহিত্যিকদের এই সম্পর্কিত কোনো গল্প যদি এখানে অনুপস্থিত থাকে, তবে তা আমার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বলেই ধরে নিতে হবে। এ ধরনের গল্প-সংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ বলেই আমি মনে করি। সেজন্য সাম্প্রতিককালের কোনো লেখকের এই বিষয়ক গল্প আমার অসাবধানে এই সংগ্রহ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কোনো ত্রুটি থাকলে পরবর্তী সংস্করণে যে তা আমি সংশোধনে প্রয়াসী হবো, তা বলে রাখা উচিত মনে করছি। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও বলে রাখা প্রয়োজন যে, কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় এ-কালীন কথাসাহিত্যিক পতিতা চরিত্র নিয়ে এ পর্যন্ত কোন গল্প লেখেন নি। সেজন্য তাঁদের রচনা 'অভিসার রজনটী'তে দেওয়া গেল না।

এ সংকলন সম্পাদনা কার্যে কয়েকজন হিতকাঙ্খী বন্ধু আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে এই গ্রন্থের তরুণ প্রকাশক বন্ধু শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডলের কথা ভোলা যায় না। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে, অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এ সংকলন গ্রন্থের কাজ শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। সাহিত্যরসিক বন্ধু শ্রীঅমিতাভ বসু কয়েকখানি গ্রন্থ দিয়ে লেখা সংগ্রহের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের দুরূহ কাজ

সম্পন্ন করেছেন শ্রীবিকাশ বাগচী এবং শিল্প সমৃদ্ধ প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের দ্বারা বইটিকে আরও মূল্যবান করে তুলেছেন শিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই এ সংকলনের লেখক ও লেখার সত্বাধিকারীদের। রবীন্দ্রনাথের গল্পটি প্রকাশ করার অনুমতি দান করেছেন বিশ্বভারতী, এবং শরৎচন্দ্রের লেখাটি পাওয়া গেছে শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। এঁদের সকলের কাছেই আমি অনুগৃহিত।

পরিশেষে আর একটি কথা যা সব প্রথমের, 'অভিসার রঙ্গনটী' নামে সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরীর একটি ছোটগল্প আছে, এক সময় ঐ নামে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংকলনের নামকরণের উৎস সেখানেই। সেজন্য শ্রীযুক্ত চৌধুরীর কাছে আমি ঋণী।

বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

বিচারক | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালো-মন্দ, অনেক সুখদুঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহ-প্রাচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি

বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া—যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া—সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চির পরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়—তখনও যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই--সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই—তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই—যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নূতন হৃদয়-হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে—তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো' 'ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মতো

গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রণপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভয়কাতর কণ্ঠে 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিসট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্যুটরি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কলেজে সেকেণ্ড্ ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে

খরক্ষুরধারে শুষ্কশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল, সেই দূরত্বের বিচ্ছেদ-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহার হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা যেন এই লোক-চলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোন্নত স্ফীত-বক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ-সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদ্‌পিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্য-বিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া থাকিত সেই অদূরে বাতায়নের আলোক ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীব মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অংগারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না, তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কার দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র'-নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ পূর্ণ উত্তর পাইল এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সম্ভ্রমে আশায়-আশংকায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়সুখমত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিধবার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল। বলিল, 'ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।' মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না, মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত, মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল

বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা—এ-সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বুঝিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্খানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চির-পরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে, তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল, সকরুণ অনুনয়-সহকারে বলিতে লাগিল, 'এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।' কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না, এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্খিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একঘেয়ে হইয়া উঠে এইজন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্‌গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমত তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতুহল হইল। বন্দিনী-শালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে। মৃত্যু সন্নিকট, তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশ দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, 'ওগো জজ্‌বাবু, দোহাই তোমার। উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।'

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না, গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।

প্রহরীকে কহিলেন, 'কই, আংটি দেখি।'—প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রু-

শোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

॥ গল্পগুচ্ছ-২য় ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সচ্চরিত্র | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে বুধবারে গেজেটে খবর বাহির হইল সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন, —সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে নাই—তাহাদের তিনি সামান্য চাকুরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আইন পাস করিয়া সুরেন ওকালতী করে,—সুরেনও নিজের জীবনের গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল, আইন পড়ার খরচা যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন, 'ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।' কিন্তু সুরেন বলিল, 'কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।'

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মতলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না। মাকে

বলিল, 'কলকাতায় যাই, ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জন করব, তাইতে আমার বাসা-খরচ চলে যাবে।'

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাঙিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। আইন ক্লাসে নাম লেখাইল। কয়েক দিনের চেষ্টায়, দশটাকা বেতনের একটি প্রাইভেট্ টিউসনও জুটিল; আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনও রকমে বাসা খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ি হইতে টাকা যাহা আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল। সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে ক্রমে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুন্‌গুন্ করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে সুরেন্দ্র একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল—'সুরেনবাবু হ্যায়?'

সরমন্ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল, 'বাবু ছাদমে আছে দেখা হোবে।' বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ; কেহ তাহাকে হিন্দীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্ খট্ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

'কে ও—রজনী দাদা যে।'

'সুরেন, ভাল আছিস?'

রজনী দাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। কন্ট্রাক্টারী ব্যবসায় করেন। অনেক টাকা উপার্জন।

হ্যারিসন্ রোড হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল—সে আলোকে সুরেন্দ্র দেখিল, রজনীর পায়ে রেশমী মোজা চিক্‌চিক্ করিতেছে—তদুপরি পম্প্‌শু। গায়ে রেশমী পাঞ্জাবির উপর জরির পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেন্টের ও মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছে।

'সুরেন ভাল আছিস্?'

'ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনী দাদা? খবর কি?'

রজনী বলিল, 'একটা কথা আছে, এখানে বলব ? তোর ঘরে চল্ না।'

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল, 'ঘরেও তো লোক আছে।'

রজনী বলিল, 'তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট্ করে জামা পরে একটা চাদর নে।'

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকা-গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল, 'আয়।'

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় ? কি বলবে এইখানেই বল না।'

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে বারংবার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন রোজোটার সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল, 'আমি যাচ্ছি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বললে আমার দেরি হয়ে যাবে। পথে বলব। এইটুকু আর হেঁটে আসতে পারবি নে ? ভারি নবাব হয়েছিস যে দেখছি। আয় আয়।'

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল, 'বিডন ইষ্টিট্।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাড়ি চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপারখানা কি ?'

'তোর জন্যে একটা প্রাইভেট টিউশন ঠিক করেছি।'

সুরেন খুশী হইয়া বলিল, 'কোথায় ? কত ?'

'মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।'

সুরেন শুনিয়া মহা খুশী। বলিল, 'পঁচিশ টাকা ? বল কি রজনী দাদা ? কখন ?'

'বিকেলে দু'ঘণ্টা।'

'কি পড়াতে হবে ?'

'এক ঘণ্টা বাংলা, এক ঘণ্টা ইংরেজী।'

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র ; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল, 'ক'টি ছেলে ?'

রজনী বলিল, 'একটিও না।' বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল, 'একটিও না! তার মানে কি ?'

'ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।'

'মেয়ে ? কত বড় মেয়ে ?'

রজনী হাসিয়া বলিল, 'তোর সে খোঁজে কাজ কি ? তুই যাবি, পড়াবি। বয়স যতই হোক না।'

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

রজনী তখন উদারভাবে বলিল, 'বয়স পনেরো ষোলো।'

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্রাহ্ম ?'

'না।'

'ক্রিশ্চান্ ?'

'না।'

'তবে কি ? হিন্দু নাকি ?'

'তাই।'

'হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে ? কার মেয়ে, বাপের নাম কি ?'

রজনী হাসিয়া বলিল, 'খোদা জানে। মার নাম জিজ্ঞাসা করিস তো বলতে পারি।'

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ?'

'মার নাম আমোদিনী। বেঙ্গল থিয়েটারের আমোদিনী। নাম শুনেছিস ?'

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'শুনেছি।'

রজনী বলিল, 'কি বলিস্ ?'

সুরেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল, 'আমার দ্বারা হবে না।'

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ?'

সুরেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলিল, 'বেশ্যার মেয়েকে পড়াব ? কখনই না।'

রজনী বলিল, 'অতি গর্দভ তুই! কেন, আপত্তিটা কি শুনি ?'

সুরেন বলিল, 'আপত্তি অনেক।'

'কি ? এ উপার্জন অনেষ্ট্ নয় ?'

'অনেষ্ট হবে না কেন ?'

'তবে ? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস ?'

সুরেন গর্বিতভাবে বলিল, 'সে ভয় করিনে ?'

'তবে ? তবে কি আপত্তি বল।'

'বেশ্যার মেয়েকে পড়াব ? লোকে শুনলে বলবে কি ?'

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল, 'অতি গর্দভ তুই! বি-এ পাস করে এমন কথাটা বললি ? লোকে কি বলবে না বলবে সেই ভয়েই জড়সড় ?'

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রজনী বলিল—'শোন্। ও আপত্তি কোনও কাজের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি ? পড়াতে যাচ্ছিস্ না পড়াতে যাচ্ছিস। কাকে পড়াতে যাচ্ছিস, কোথায় পড়াতে যাচ্ছিস, এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি ? তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস্ নিজের মনে যথেষ্ট বল নেই, চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে, তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ করে বুঝে দেখ নিজের মনে।'

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হইল। সগর্বে বলিল, 'সেজন্যে ভেব না।'

রজনী বলিল, 'তবে নে। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে তার কাজ করব। অমনি তো আর টাকা নিচ্ছিনে।'

সুরেন ভাবিয়া বলিল, 'বাড়ির লোক যদি শোনে তো কি বলবে ?'

রজনী বলিল, 'অতি গর্দভ তুই! বাড়ির লোক জানবে কি করে ? এ কলকাতা শহর সমুদ্দুর। কে কার খবর রাখে—তুইও যেমন!'

গাড়ি এই সময় থিয়েটারে পৌঁছিল। রজনী বলিল, 'তাহলে, কি বলিস ? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার—কি বলব ?'

সুরেন একবার মনে করিল বলি—'না।' আবার ভাবিল, 'এত তাড়াতাড়ি কি—না হয় দু'দিন পরেই বলব।' বলিল, 'রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই একদিন পরে বলব।'—বলিয়া বিদায় চাহিল।

রজনী বলিল, 'আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় লিখিস ; কিন্তু ঐ কথা রে ভাই। যদি বুঝিস নিজে ঠিক থাকতে পারবি, নিজের মনে এক চুল্ এদিক্ ওদিক্ হবে না—তবেই নিস। আমরা তো বয়ে গেছিই। তোরা এখন

ছেলেমানুষ আছিস—গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।'—বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল—সুরেনও ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি সুরেনের ভাল নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কাজটা অস্বীকার করি তবে রজনী দাদা ভাবিবে, নিজের চরিত্রবলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অগ্রসর হইল না। এই ভাবের সহিত—অর্থকৃচ্ছ্রতাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা—পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি মাসে পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতী পাস করিয়া, তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে? ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল, এক কাজ করা যাউক। এখন কাজটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট্ টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। রজনী দাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে—পরিশ্রম করিব, টাকা লইব—কিরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি?

জানাজানির ভয়টা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু তাহার উৎসাহ ভারি কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। 'কলকাতা শহর সমুদ্দুর—কে কার খবর রাখে!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনী দাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া, সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল—কাগজে কলমে এর সাক্ষী সাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনী দাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া

বউবাজারে রজনী দাদার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে, খবর কি ?'

সুরেন বলিল, 'খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

রজনী বলিল, 'ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া।'—বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, 'আয়।'

দুই জনে একাকী হইলে রজনী বলিল, 'কি ঠিক করলি ?'

সুরেন বলিল, 'নেওয়াই ঠিক করলাম।'

রজনী বলিল, 'তা বেশ, কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই। ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস তো। তোকে জানি ছেলেবেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোক্‌রা, তাই সাহস করে তোকে এ কাজে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব করে বলেছি যে তুই অতি সচ্চরিত্র, কোনও রকম খেলাপ হবে না।'

সুরেন বলিল, 'কেন রজনী দাদা, সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মাবামারি কেন এ সব লোকের ?'

রজনী বলিল, 'আঃ—এইটুকু বুঝতে পারলিনে, বি-এ পাস করেছিস! অতি গর্দভ তুই। কেন, বলি শোন্‌। আমোদিনী একজন মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস্‌। ওর ইচ্ছে, ওর মেয়েও একদিন একটা মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস্‌ হয়। সেই জন্যে ভাল রকম লেখাপড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়বার জন্যে বুড়োগোছ পণ্ডিত-টণ্ডিত রাখত, কিন্তু বুড়ো হলে হবে কি—বুড়োদের প্রাণে আবার বেশী সখ। পড়ায় না—খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখলে কোনও ভয় থাকে না—এই জন্যে আর কি—বুঝেছিস ?'

সুরেন বলিল, 'ওঃ—তা বটে।' ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এ বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল, 'তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পরশু একদিন যাস—গিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিস।'

সুরেন বলিল, 'না রজনী দাদা, আমি একলা যেতে পারব না।'

কেন ? 'মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীট চিনিস্‌নে ?'

'তা চিনি, কিন্তু একলা যেতে পারব না রজনী দাদা।'

'অতি গর্দভ তুই! আচ্ছা আসিস্ কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে করে।'

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস, আর রয়্যাল্ রীডার নম্বর থ্রী। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজী কি পড়ে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল, 'রয়্যাল্ রীডার নম্বর থার্ড।' সুরেন সংশোধন করিয়া দিল, 'নম্বর থ্রী বলিবে, থার্ড হয় না।' তখনই বিনীতভাবে 'নম্বর থ্রী' বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবারে ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল, 'আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।' যতটা খুশী হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুশী হইতে রাজী হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে—পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প, আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশতঃ এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পুরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনে করিল—আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্মল, বিধাতার স্বহস্ত-নির্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হবে—ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় কি নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল, যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে সে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল, 'কি করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?'

সুরেন বলিল, 'এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, দিনের বেলা আমরা যা চিন্তা করি রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখি।'

নলিনী বলিল, 'না তা নয়। আমাদের আত্মা আছে কি না। একজনকার আত্মা, যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায়, তাহলে দুজনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙলে শুধু একজনকার মনে থাকে, একজন ভুলে যায়।'

সুরেন বলিল, 'বাঃ বেশ তো।'

মাস্টারবাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পান রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল, 'আজকের পানটা খুব ভাল করেছে অন্যদিনের চেয়ে।'

নলিনী বালিকাসুলভ গর্বে বলিল, 'ভাল হয়েছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাস্টার মশায়।'

সুরেন বলিল, 'বটে। তুমি এমন পান সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পান সাজে, রাম রাম।'

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল, 'আপনাদের বাসায় পান ভাল হয় না বলছিলেন, গোটাকতক পান তৈরি করেছি নিয়ে যাবেন?'

সুরেন পান লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'ভারি লক্ষ্মী তুমি।'

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল। তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন, তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে, সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ। সুরেন তাহার মার গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, কি একটা অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় ও অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছুদিনে সে নিজের

মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল ; কিন্তু কোনও প্রতিকার চেষ্টা করিল না। বুঝিল, মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে, নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই সে তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতেই তাহার মানব জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দ্দেশে কর্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায় ও সুখে পুলক-কম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—'আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না ; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্যে ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয় ? আমরা এমন কোথাও যাব যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। কি খাব ? পরিশ্রম করব ;—আবশ্যক হয় দুজনে পরিশ্রম করব। দু'বেলা না জোটে, একবেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।'

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে সে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুইজনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপুর মাতিয়া রহিল।

সোমবারে বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল, নলিনী নাই—সে তাহার মাসীর বাড়ি গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল—নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল? বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল?

গিয়াছে, তাহাও দুই চারিদিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহারও অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না! বাজে কথা। আজ দুইমাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছে, একদিনও তো সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল; আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস্ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে, মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগল।

এই এক মাসের কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা—সেই স্বপ্নের জাগ্রৎ অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লঘু হইল। তখন মনে হইল—'উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি!'

'কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম?'

'কি সর্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল!'

'কি মোহেই পড়িয়াছিলাম। ভগবান এ জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না।'

'কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! যদি শুনিতাম তাহার মাতা তাহার উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে লইয়া তখনই কোথাও পলাইয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙা আর জোড়া লাগিত না।'

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বিকাল বেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিমবাবুর 'ধর্মতত্ত্ব' পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল—নলিনীর হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল—ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

৪৪।১নং নীলমণি বসুর গলি,
ভবানীপুর

প্রিয়তম,

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে—আমি স্বীকার করি যে আমি তোমায় ভালবাসি। মা বলিল —তুমি ভিক্ষুক, নিজে খাইতে পাও না ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কর, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থির হইয়া দুইদিন বাদেই আমাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চির-বিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্তের তরেও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কি হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম; কিন্তু হে আমার স্বামী, আমায় না পাইলে

তুমিও সুখী হইবে না এ বিশ্বাস তুমি আমার মনে জন্মাইয়াছ। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য, আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে, তাহার উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী

পুঃ—'ঠিক সাতটার সময় আসিও।'

পত্র পড়িয়া সুরেন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল, 'বাড়ি হতে এইমাত্র চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।'

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল, 'সরমন একখানা গাড়ি ডাক, জল্‌দি।' গাড়ি আসিলে জিনিসপত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ি পৌঁছিল।

মাকে বলিল, 'কলকাতায় ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।'

॥ ষোড়শী ॥
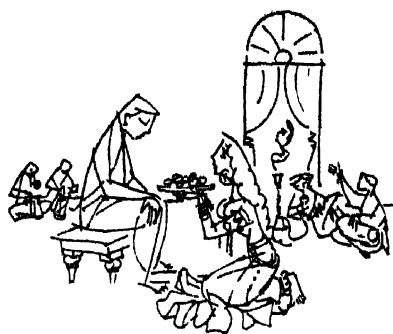
আঁধারে আলো | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সে অনেক দিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে; বি-এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী —বাবা কথা শোন্, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাশ হতে পারব না।

কেন পারবিনে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাশ হতে তোর কি বাধা হবে আমি তো ভেবে পাইনে সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাসনে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েচি বাবা, আমার মান রাখবিনে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, সে আমার

দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে তো মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ্।

আচ্ছা, পরে বলব, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারী শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্র-পুত্রবধূর হাতে জমিদারী এবং সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর মৃত্যুর পর এ-বাটীতে এতদিন পর্যন্ত কোন কাজ কর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত-উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুজ্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে তো মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয় দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্ণ বেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুণটি কে হীরামুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যের চমক ভাঙিল, সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই তো আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে—ঐ এক ফোঁটা মেয়ের সামনে তোর আর লজ্জা কি।

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া

সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না—আমার ভারী মাথা ধরেচে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এ সব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে ?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্চি। এম্ এ-র পড়া সোজা নয় তো! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন ? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্। আর এক মুহূর্ত—ঝুম্ ঝুম্। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা ?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি ?

আমার নাম রাধারাণী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দুই

এক ফোঁটা রাধারাণীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সত্য এম.এ. পাশ করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তো কোন মতেই না, খুব সম্ভব পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন একরকম করিয়া উঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া একাকী বিরাজ করে—সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন, অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইযা লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ, হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূরে নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশি নয়। পরনে সাদাসিধা কালাপেড়ে শাড়ি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত, হাটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদ-মুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দুজনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটার হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল তখন সেই অসামান্য রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা-গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গা যাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল তখন পূর্ব-দিনের মত আজও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তিন

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি, তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয় সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রমণী যেই হোন তিনি যে চোখ দিয়া কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন'। মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে

লাইনের ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিত্তলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্ত বস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি উৎসুক চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন তো বড ভাল হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যর মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া বমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে—আপনারও দেখছি এ বদ্ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন ?

চোরবাগানে আমাব বাসা।

আমাদের বাডি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড রাস্তা হযে যাবেন।

তাই হবে।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবাতা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিযা রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইযা আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি, এবার যেতে পারব। নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড গুজিযা তাডাতাড়ি চলিযা গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিযা তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানানো অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইযাছে শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনিই বুঝিবেন—সেদিন কি হইয়াছিল, সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়—সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পডিবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল। সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা তাহার সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েছে তুলে দিতে পারিসনি ? যা তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল ; সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া রাস্তার দুই দিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে ? আমি আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শিগগির নেয়ে নিন্, আজও আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল। সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায় ?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেছি।

আপনি ভাড়া দিলেন !

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হউক, একেবারও সন্দেহ হইত—এ সব কি !

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগানে ?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে ?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন ?

আপনি তো চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক্ মরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল শব্দে—অর্থাৎ ওরে মুগ্ধ, ওরে অন্ধ যুবক, সাবধান! এ সব ছলনা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে তো আপনার দেওয়াই হয়েছে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর আছে কি যে দেব। যা ছিল সমস্তই তো তুমি চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তে সাধ হইল, এই প্রকাশ্য রাজপথেই ওই দুটি রাঙা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমেষে গভীর লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাঁহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? বলি কিছু আছে-টাছে? দু পয়সা টানতে পারবে তো?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবা-গাবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি। কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর। যেমন চোখ মুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিতে দিব্যি মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে—যেন একটি জোড়া গোলাপ ফুটে ছিল!

রমণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে তো না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্যকথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্‌জুয়ানের বাঙলা তর্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা শহরের পথে-ঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে-বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল; আস্তে আস্তে বলিল, হ্যাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ কি ভয়ানক কষ্ট। আচ্ছা, সরলাই বা তাব স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড় জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই। বিয়ে তো সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্যন্ত ভালবাসা কি, জানতে পায় না।—জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গানবাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতে পারেই না। লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর—স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল; সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি সয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাকতুম তো রাক্ষুসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্তে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যিই তো কেউ ছিল না—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে, সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরাজি জানিনে তো, বাঙলা বই যা বেরোয় সব পড়ি—এক একদিন সারা রাত্রি পড়ি। এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে, সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি?

হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি—

ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে আজ তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

পাঁচ

সকাল-বেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চার দিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসে না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা

নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়তো তিনি বাঁচিয়া নাই। হয় তো বা মৃত্যুশয্যায়। কে জানে!

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই, কেন সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল!

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা-কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাঁহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তাঁর? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না। দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ। আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না তো? তিনি তো আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায় মনে হইল সেগুলি চমৎকার সাজানো।

কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল; দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া সেইখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়ম, একজন বাঁয়া তবলা লইয়া বসিয়া আছে, আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন। দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছে, ত্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরূগি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিসনে, ওঠ্—ওসবে আমার ভারি ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া ওঠে, ইহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতী বিজলী। তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?

সমস্ত লোকগুলো হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজলী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্, বাড়াবাড়ি করিসনে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন-যৌবন সফল করি' মাননু

দশ-দিশ ভেল নিরনন্দা।
আজু মঝু গেহ, গেহ করি' মানহু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়েল,
টুটল সবহু সন্দেহা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অব সে ন যবহু মরি পরিহোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ সাজাচ্চ?

বিজলী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ বলেই তো এমন আমোদের দিনে ধরে এনে তোমাদের তামাসা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস্ গাবু, সত্যি বল্ তো ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান —খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এত বড ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা নয় বিধবা—কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল্ তো? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভারি একটা হাসি উঠিল। তারপর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে কি ভাবিতেছিল তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে! থাক সে।

বিজলী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ তো আমি!

যা ক্ষ্যামা, শীগ্‌গির যা—বাবুর খাবার নিয়ে আয়; স্নান করে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাসাই কচ্চি যে! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল

পূর্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বহু-তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজলী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ি না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তাহলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজলী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখ্‌চি। বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দমাত্র, হাসি নয়। তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, হাবু নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখনো শিখিনি, কিন্তু, নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজলী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না?

না।

বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল, জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দুদিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড় তা সবাই টের পেয়েচে, কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, কাল নয়, দুদিন পরে নয়, এ জন্মে নয়, আগামী জন্মে নয়—কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজলীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। যেতে দাও, যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজলী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। যথার্থই, তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে তো কল্পনাও করে নাই, এমন মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বোসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁহুঁ হুঁ, প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বিজলী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই—নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমা'র পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো, পায় পড়চি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজলী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ঢোঁক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে?

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-ষোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে তাহার কাছে তো ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজলীর বুক ভাঙিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি? হায় হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজলীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই। বিজলী মুখ না তুলিয়াও বুঝিল, সত্য অপেক্ষা

করিয়া আছে; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরাগুলো ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে।

সে ভালবাসিয়াছে। যে ভালবাসার একটা কথা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে। সে যে দাগী আসামী। অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারকের সুমুখে দাঁড়াইয়া আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে। সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল, চললুম।

বিজলী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস কর, সকলের দেহেতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরে দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে তো উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে তো অস্বীকার করা চলে না। বিজলী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী। আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ। ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে কি যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল, কি বাঈজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে

দিলে না? দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও তো, হ্যা—বলিয়া নিজেই টানিয়া লইয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটা কথাও বিজলীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে-বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পরব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাঈজী মরেছে।

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাঈজী?

বাঈজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে, আজ সেই রোগেই তোমাদের বাঈজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।

ছয়

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারাণী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল তো?

রাধারাণী স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাঈজীদের সাজ-সজ্জা—কিন্তু হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস্!

সত্যি। 'আচ্ছা, দেখচ তো, বল দেখি ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারাণী আঙুল তুলিয়া যে স্ত্রীলোকটিকে সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক্, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু এদের মজুরি কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দুজনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বলচ তার দু'শ টাকা।

রাধারাণী চমকিয়া উঠিল—দু'শ। কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত, কিন্তু এখন পারবে কি না বলা যায় না।

তবে অত টাকা দিয়ে আনলে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েছে।

রাধারাণী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক্, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি। দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারাণী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই। কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন?

শুনবে?

হ্যাঁ, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিলেন, ওর নাম বিজলী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রাণি, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওঁকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারাণী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরে বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজলী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

'আপনাকে ডাকচেন।' বিজলী মুখ তুলিয়া দেখিল, পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজলী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে ডাকচেন?

মা ডাকচেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞেস করে এস।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজলী তো? আপনাকেই ডাকচেন—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজলী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারাণী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রস্ত কুন্ঠিত-পদে বিজলী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই সে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল; একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজলী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারাণী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোট বোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে; কিন্তু এটিকে না চিনতে পারলে সত্যিই ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজলী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যোবিকশিত গোলাপসদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারাণী নিস্তব্ধ। বিজলী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারাণী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাধারাণী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোট বোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রর একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া লইয়া বিজলী একদৃষ্টে দেখিতেছিল; মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন? আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারাণী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি?

বিজলী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না।

কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙে দিলেন। তিনি ভেঙে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আর কেউ জানে না বোন। বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে আমি যে সব দিকে মাটি হযে যেতুম। তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কান্নায় রাধারাণীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজলী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এব বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারাণী গাঢস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবাব কবে দেখা হবে দিদি?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রয় করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল?

লজ্জায় রাধারাণীর মুখ আরক্ত হইযা উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিযা রহিল।

বিজলী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝেচি। আমাকে অপমান করবেন বলে—না? তা ছাড়া এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার তো কোন কারণ দেখিনে।

রাধারাণীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজলী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পাযে আমার শত-কোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি।

নমস্কার বোন। বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার তো আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্। চললুম।

"শ্রেষ্ঠ গল্প"

পোড়ারমুখী | হেমেন্দ্রকুমার রায়

এইখানেই আমার জন্ম। শুনেছি, আমার মা কুলত্যাগ করে এসেছিলেন। লোকে বলে, সেটা পাপ। পাপ কি পুণ্য জানি না, কারণ সে-শিক্ষা আমার কখনো হয়নি। যদি পাপ হয়, তবে বলতে হবে যে, মার সে পাপের শাস্তি ভোগ করছি আমি।

রূপকথায় এক কুৎসিত রাজকন্যার কথা শুনেছি, আরসিতে নিজের মুখ দেখে তিনি আরসিখানাকেই ভেঙে খান্ খান্ করে ফেলেছিলেন। জানি না, তিনি আমার চেয়েও কুৎসিত ছিলেন কি না।

আরসিতে আমিও মুখ দেখি, দেখি, আর আমার বুকটা কেমন করে ওঠে। মনে হয় আমিও আরসিখানাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলি। কিন্তু তাতে হবে কি? আমার এ কুরূপের ছায়া শুধু ঐ এক আয়নাতেই তো ধরা পড়ে না—এ যে মানুষের চোখে চোখে ছড়িয়ে বেড়ায়!

নিজের চেহারার খুঁৎ, নিজের চোখে একরকম মানানসই হয়ে যায়, কিন্তু হায়, আমার মুখে এমন কিছুই নেই, যা আমার নিজের চোখেও ভাল লাগতে পারে—এ যেন মানুষের মুখই নয়। তাই কিছুতেই আমি মনকে চোখ ঠেরে

বোঝ মানাতে পারি না। মানুষকে গড়বার সময়ে ভগবান এতটাও নিষ্ঠুর হতে পারেন!

বুঝতে পারি না, আমার মুখে কী এমন আছে, যাতে-করে লোকে আমার দিকে তাকালে কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না! সাহেবদের দোকানের জানলায় যে-সব বেয়াড়া রকমের অস্বাভাবিক মুখোস দেখা যায় আমার মুখটাও যেন অনেকটা সেই ধরনের। তাই কি লোকে অমন করে হাসে? ওঃ, এ কী হাসি! মানুষের অবজ্ঞার চেয়ে মানুষের এই হাসি আমার প্রাণে যেন আরো নিদারুণ হয়ে বাজে।

বিকালে পাউডারে, রঙে, গয়নায় আর রঙিন জামা-কাপড়ে আমার এই কুরূপ যতটা পারি ঢেকে-ঢুকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। যতক্ষণ দিন থাকে, ততক্ষণ কেউ আমার কাছে ঘেঁষে না। সন্ধ্যে হলে যখন আর চোখ চলে না, তখন রাস্তা থেকে ঠাহর না-পেয়ে কেউ-কেউ আমার কাছে উপরে উঠে আসে। তারপর, আমার চেহারা দেখবার জন্যে সিগারেট ধরাবার অছিলায় ফস্-করে একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে আমার মুখের কাছে ধরে; আর আমাকে দেখেই হেসে ওঠে।

ওগো, দুনিয়ায় যার ভালবাসার কেউ নেই, যার প্রেমের ফুল আপনি ফুটে আপনি ঝরে যায়, যার বাসনা কখনো তৃপ্তির স্বাদ পায়নি, সে অভাগিনীর মনের ব্যথা প্রাণের কথা তোমরা কেউ বুঝতে পারবে না! আমার রূপ নেই, কিন্তু যৌবনের আকাঙ্ক্ষা তো আছে।

কুরূপা কুব্জা এই জ্বালা বুকে পুরে না-জানি কত কান্নাই কেঁদেছিল! কিন্তু তার নিন্দিত জীবনও নন্দিত করে একদিন তো শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন। আমার এই অনাদৃত জীবন-যৌবনও কি একদিন কোন অজানা অতিথির পদস্পর্শে সফল হয়ে উঠবে না?

অন্ধকারে, বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে আমি সেই অজানা অনাগত অতিথির কথা ভাবি। আর সবাই আমাকে পায়ে ঠেলে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি যেদিন আসবেন সেইদিনই বুঝতে পারবেন, ছাই ঢাকা আগুনের মত আমার এই কুদর্শন কুগঠন দেহের তলে-তলে প্রাণ-যৌবনের শতমুখী সৌন্দর্যের ফোয়ারা উথলে উথলে উঠছে!

সেই অজানা অতিথির পথ চেয়ে আছি। সেই আশাই যে আমার এই আঁধার প্রাণের ধ্রুবতারা! আমার এই তৃষাতাপিত জীবনের পথে আজ

কোন পথিক নেই বটে, কিন্তু আমি জানি, একদিন তিনি আসবেন, তিনি আসবেনই!

রূপের ঝিকিমিকি যার ব্যবসা, রূপ না থাকলে তার তো চলে না। আমারও দিন চলত না—ভাগ্যে মা একখানা বাড়ি রেখে গেছেন, তাই কোন-গতিকে আমার দিন-গুজরান হচ্ছে।

বাড়িতে আমার জনকত ভাড়াটিয়া আছে—তারা সবাই স্ত্রীলোক, কারুরই সমাজে ঠাঁই নেই। রোজ তাদের ঘরে লোক আসে, গানবাজনা হয়, হাসির হল্লা ওঠে। তাদের সেই আমোদ-প্রমোদের ধ্বনি যখন আমার ঘরে এসে ঢোকে, তখন ইচ্ছা হয়, দি সব ভাড়াটেকে দূর করে তাড়িয়ে! কিন্তু তাহলে যে আমার দিন চলবে না—পেটের অন্ন জুটবে না। মনের হিংসা মনেই চেপে আমি যেন গুমরে মরতে থাকি।

বাড়ির দোতলায় একটি মেয়ে দুখানা ঘর নিয়ে আছে, তার সঙ্গে আমি 'মকর' পাতিয়েছি। মকর দেখতে যেমন পরীর মত, তার গানের গলাও তেমনি চমৎকার। শহরের বড় বড় বাবু তার ঘরে আসবার জন্যে লালায়িত—'মুজরো'য় গিয়ে প্রায়ই সে মোটা টাকা ঘরে আনে।

সেদিন শুনলুম, কোন বাবুর বাগানে সে গান গাইতে যাবে। কেমন শখ হল, আমি তাকে বললুম, 'মকর, ভাই, আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি?'

মকর বললে, 'বেশ তো, চল না।'

বাগানে যাবার সুবিধা আমার তো কখনো ঘটেনি—ঘটবেও না; যার মুখ দেখলে লোকে নাক বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, পয়সা খরচ করে তাকে বাগানে নিয়ে যাবে এমন বাবু কে আছে? অথচ শুনতে পাই, বাগানে নাকি ভারি ঘটা হয়! তাই দেখতে বড় সাধ ছিল; দেখি, মকরের দৌলতে সে সাধটা যদি মিটিয়ে নিতে পারি।

হাঁ৷ আমার ছার কপাল, এমন জানলে কে বাগানে আসতে চাইত! সেই জমকালো সাজানো ঘরে গিয়ে যখন ঢুকলুম তখন চারিদিক থেকে অনেকগুলো চোখ বিস্ময়ে কৌতুকে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে আমার পানে স্থির হয়ে রইল। সে কি নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি। আমি যেন মরমে মরে গেলুম।

মকর চালাক মেয়ে, সে তখনি এই চাহনির অর্থ ধরে ফেললে। আমার একহাত নিজের হাতে নিয়ে সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, 'এ আমার মকর,

একে আমিই সঙ্গে করে এনেছি!' রূপসী মকর[illegible]লত, আমি তার সঙ্গে এসেছি শুনলে সকলের কাছে এখনি আমার কদর বেড়ে যাবে! কেননা আমাকে তাচ্ছিল্য করে তার নেকনজর থেকে বঞ্চিত হতে কেউ তো চাইবে না!

বাগানের যিনি মালিক সেই বাবুটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে এস—এস, তুমি ডালিমবিবির মকর, আমাদের মাথার মণি!'

অমনি আরো অনেকে বলে উঠিল, 'বসুন, বসুন।'

বুঝলুম, এ আমাকে আদর নয়—আমার ভিতর দিয়ে এ আদর গিয়ে পড়তে চাইচে, সুন্দরী মকরের রাঙা পায়ের তলায়। যাক্—এও তবু মন্দের ভাল।

সভার মাঝখানে গিয়ে, চোখে-মুখে রূপের দেমাক্ নিয়ে মকর দিব্যি জাঁকিয়ে বসল। চারিদিকে সবাই তাকে খাতির জানাবার জন্যে একেবারে তটস্থ। কেউ পানের ডিবেটা তাকে এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ নিজের হাতেই তাকে বাতাস করছে, তার মন-রাখা কথা কইছে, আর কেউ-বা কিছুই করতে না-পেরে দীন ভাবে নীরবে তার পানে ফ্যাল্‌ফ্যালে চোখে তাকিয়ে আছে। মাগো মা, রূপ দেখলে পুরুষগুলো কি এমনি হয়ে যায়! রূপ, রূপ, রূপ। দুনিয়ায় প্রাণ কেউ খোঁজে না, চায় শুধু ছাই রূপ। মরণ।

বাগানের কর্তাটি, একেবারে বিনয়ের অবতার। দুটি হাত জোড় করে মকরের সামনে এসে তিনি নিবেদন জানালেন, 'ডালিমবিবি, অধীনের একটি আর্‌জি আছে।'

মকর সিল্কের রঙ্‌চঙে রুমালখানা মুখের কাছে ঘোরাতে-ঘোরাতে, ভঙ্গি-ভরে যেন ভেঙে পড়ে বললে, 'হুকুম।'

'সে কি ভাই, আমরা হুকুম করবার কে, হুকুম-দেনেওয়ালা তো তুমি! বলছি কি—এতগুলো ভদ্রলোক তীর্থের কাকের মত হাঁ-করে বসে আছে, একটা গান গাইতে আজ্ঞা হোক্।'

মকর সদর্পে অবহেলাভরে সেলাম করে অনুগ্রহ জানিয়ে বললে, 'যো হুকুম।'—বলে একটু নড়েচড়ে বসে হারমোনিয়মে সুর ধরলে।

ঘরসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'এই গোল কোরো না—গোল কোরো না।' গোল থামাতে গিয়ে গোলমাল শেষটা এমনি বেড়ে উঠল যে, কান পাতে কার সাধ্যি!

হঠাৎ আমার চোখ একটি লোকের উপর পড়ল। তাঁকে দেখতে বেশ হোমরা-চোমরা—বুকের পকেটে সোনার ঘড়ি—ঘড়ির চেন, হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি, বোধহয় তিনি খুব বড়মানুষ। লোকটি একদৃষ্টিতে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিলেন। তিনি কি দেখছেন? আমার এই অপরূপ রূপ?

মকরের গান শুরু হল। গানের সুর বেমালুম ডুবিয়ে 'বাহবা'র উচ্চস্বরে সারা ঘরখানা ভরে উঠল।

আর একবার সেই লোকটির দিকে তাকালুম। গান বা বাহবা—কিছুই তিনি শুনছিলেন না—মৃদু মৃদু হাসতে-হাসতে তেমনি করে তখনো আমার দিকে চেয়েছিলেন। সে দৃষ্টিতে আমার কুরূপের প্রতি যে কিছুমাত্র কটাক্ষ বা ঘৃণার ভাব ছিল না, তাও আমি বুঝতে পারলুম। তবে? তবে কি · না, না, সে যে অসম্ভব। আমাকে দেখে তিনি···না, তা হতেই পারে না।

হঠাৎ তিনি উঠে-পড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর—আমি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না—তারপর, তিনি সত্যি-সত্যিই আমাকে ইশারা করে ডাকলেন।

প্রথমটা আমি যেন কেমন মূর্ছাহতের মত হয়ে গেলুম। এমন করে কোন অজানা পুরুষ তো আজ পর্যন্ত আমাকে কাছে ডাকেনি। এই এক আহ্বানের মধুর রসেই আমার সকল প্রাণমন যে পুরে উঠল! অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে আবার পুলকে তাঁর দিকে তাকালুম—আবার তিনি আমাকে হাত-নেড়ে ডাকলেন।

ঘরের ভিতরে তখনো সবাই বাহবা দিতে ব্যস্ত; সেই অবকাশে আস্তে-আস্তে উঠে, আমি বাইরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার দিকে হাসিমাখা চোখে চেয়ে তিনি বললেন, 'তোমার নাম কি?'

'কামিনী।'

'কোথায় থাক?'

আমি ঠিকানা বললুম।

'তোমার বাড়িতে কাল সন্ধ্যের সময়ে আমি যাব। এই নাও, আগাম কিছু বায়না দিচ্ছি।'—এই বলে আমার হাতে তিনি চারটে টাকা গুঁজে দিলেন।

আমি আর কি বলব—কি বলতে পারি ?· ····আমার বুকের মাঝে আনন্দের স্রোত যেন উথলে উঠে আছড়ে-আছড়ে পড়তে লাগল—আমি যেন কেমন বিহ্বলের মত হয়ে গেলুম !

তিনি আর-কিছু না-বলে শুধু একটু মুচকে হেসে কের ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন।

মকর তখন মাথার উপর মদ ভরা গেলাস বসিয়ে, দু-হাত দু-দিকে লীলায়িত করে নাচতে-নাচতে গান ধরেছিল—

'চলো গুঁইয়া, আজু খেলে হোরি।'

এতদিন কাল গুনে বসে থাকবার পর, আজ কি সত্যই আমার ঘরে অতিথি আসবেন ? আমার সকল কুরূপ আজ কি তাঁর স্পর্শে ধন্ত হয়ে উঠবে ? হাব. জীবনে এই আমার প্রথম অতিথি—কি দিয়ে তাঁকে তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা আমি করব, কেমন করে তাঁর সঙ্গে কথা কইব ?

ফুলেব মালায় ঘর সাজিয়ে, আলো জেলে, সেজেগুজে আমি বসে আছি, আকুলপ্রাণে নববধূটির মত। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে প্রথম-বসন্তের মৃদু-মৃদু মন-ভোলান হাওয়া আমার বুকের পরে এসে আবেগ-ভরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল—দুরুদুরু প্রাণে আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ. তিনিই বটে।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, 'আসুন, আসুন।'

তিনি সেদিনকার মত তেমনি চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

আমি তাঁকে খাটের উপরে বসিযে পানের ডিবেটা তাঁর সামনে এগিয়ে দিলুম। কেমন এক যন্ত্রণাভরা সুখে আমার প্রাণ-মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে নেতিয়ে এল। মনে হতে লাগল, আজ যেন এ-জগতে আর কেউ কোথাও নেই—শুধু তিনি আর আমি, তিনি আর আমি !···

আমার চিবুকে হাত দিয়ে আমার মুখখানা তিনি তুলে ধরলেন—সে স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে শিউরে উঠল, আমার দু-চোখ ধীরে ধীরে আপনি মুদে গেল।

কিন্তু এ কি। আমি চোখ মুদতে না মুদতে, তিনি যে একেবারে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন !

সে হাসির পরিচয় আমি জানি গো, জানি! আমার দিকে তাকালে আর সবাই যে হাসি হাসে, আজ এঁর গলাতেও আমি যে ঠিক সেই হাসিই শুনছি! চমকে চোখ চেয়ে আমি দু পা পিছিয়ে এলুম। থেমে থেমে বললুম, 'আপনি হাসচেন যে!'

অনেক চেষ্টায় হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, 'উঃ, এ যে হেসে মরে যাবার গতিক! তুমি যখন চোখ বুঁজে কেমন-একরকম মুখ করেছিলে, বাপ্, তখন তোমাকে দেখলে মড়াও যে হেসে উঠত!'

আমি কর্কশস্বরে বললুম, 'কি বলচেন?'

—'কামিনী, সত্যি বলচি, তোমার মুখের জোড়া মেলা ভার! তোমাকে যদি দুদিন শিখিয়ে-টিখিয়ে থিয়েটারে নামাই, তাহলে তোমার চেয়ে ভাল হাসির অভিনয় আর কেউ করতে পারবে না। লোকে চেষ্টা করে, বিতিকিচ্ছি মুখভঙ্গী করে লোক হাসায়, তোমাকে কিন্তু সে-সব কিচ্ছু করতে হবে না। ভগবান তোমাকে এমনি আশ্চর্য মুখ দিয়েছেন যে, আমার মত গম্ভীর লোকও তোমাকে দেখে না-হেসে থাকতে পারলে না।'

আমি ঠোঁট কামড়ে অধীর স্বরে বললুম, 'কে আপনি?'

—'আমি 'ভেনাস' থিয়েটারের ম্যানেজার।'

—'কি চান এখানে?'

—'তুমি আমার থিয়েটারে অভিনয় করবে? দু-চারদিন শিখলেই তুমি হাস্যরসের খুব ভাল অভিনেত্রী হতে পারবে; তোমার ঐ মজার মুখ দেখেই আমি সেটা বুঝে নিয়েছি। তাতে তোমার আর আমার—দুজনেরই লাভ!'

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'না না! চলে যান আপনি! যান—যান বলছি!'

অত্যন্ত আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে লোকটা ঘর থেকে সুড়্ সুড়্ করে বেরিয়ে গেল।

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের মত দক্ষিণ বাতাস আমার ঘরে ঢুকে, ফুলের মালাগুলোকে দোলা দিয়ে গেল।

মালাগুলো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, জানলা বন্ধ করে আমি আলো নিবিয়ে দিলুম।...ওরে আমার পোড়ার মুখ, এ অন্ধকারে তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না রে, কেউ দেখতে পাবে না!

॥ সিঁদুর চুপড়ী ॥

আদরিণী | প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ভাদ্র মাসের এক পড়ন্ত বেলায় খালধার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের ঠেলায় শহরবাসীরা অস্থির। মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দেবী তাঁর ত্যজ্যসন্তান বঙ্গবাসীদের ওপর দিয়ে তাপসহনশীলতার যে পরীক্ষা চালান তারই একটি মহলা চলেছিল। ঘামে আর খালধারের মেটে রাস্তার ধুলোয় অঙ্গটি পচা ভাদ্রের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ হয়ে উঠেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হয়ে গেল। বরাতে দুঃখ আছে ভেবে দৌড়ে-হাঁটা শুরু করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছু-দূর যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আরও দু'চারজন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় খোলার চালের বাড়ি, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর ঝোলা—তারই নিচে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলুম। মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগল

আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আত্মসম্ভ্রমের ওপর বলাৎকার শুরু করে দিলে।

অনন্যোপায় হয়ে কাকভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একে একে সরে পড়তে লাগল। আমার বাড়ি অনেক দূরে—বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না থামলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশপাশের চারিদিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ হলো। গলিটা বেশ চওড়া—দু'খানা গরুর গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। গলির দু'ধারেই খোলার বাড়ি—একেবারে শেষ অবধি।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ির গা ঘেঁষে এক ভিখারী বসে অবিশ্রান্ত চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথায় লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চ্যাচাচ্ছিল—সে আক্ষেপের মধ্যে আল্লা ও খোদার বাহুল্য শুনে মনে হল সে ব্যক্তি মুসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সামনের সেই অন্ধ ভিখারীও অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে, কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এপারে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে লোকটার কৃচ্ছ্রসাধনা দেখছি আর মনে মনে গবেষণা করছি, আল্লা ওরফে খোদা হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগল। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হয়ে পড়ল। বৃষ্টি-ধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চেপে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলসমাধিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া শ্রেয়ঃ এই রকম একটা সঙ্কল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার কানের কাছে করুণ কণ্ঠে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হল—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে চেয়ে দেখি একটি মেয়ে! বয়স তার বাইশ-তেইশ বছর হবে, রংটি ফিকে মেঘের মত ময়লা। একখানা ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। শাড়িখানা ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গিয়েছে, তার ছিন্ন

অবকাশ দিয়ে উত্তমাঙ্গের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিণীর মত কৃশ নয়, বেশ সুপুষ্ট—বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমেই তা ধরা পড়ে। সমস্ত দেহে এমন কমনীয়তা ও লাবণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিণী আবার বললে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা।

দেখলুম সে থর-থর করে কাঁপছে।

বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছি এমন সময় আবার সে বলে উঠল—একটি পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখে চোখ পড়ল। চোখ দুটি এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু কি অদ্ভুত চাহনি চোখে। এমন করুণ দৃষ্টি আমি খুব কমই দেখেছি। হতশ্রী মালঞ্চের এক কোণে জঙ্গল পরিবেষ্টিত নির্জন স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ধরণীর যে মর্মব্যথা সেই কালো জলের বুকে ফুটে উঠতে দেখা যায়, তার দৃষ্টিতে যেন সেই ব্যথা স্থির হয়ে আছে। কোন প্রশ্ন না করে একটা পয়সা পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিলুম।

ওপারে সেই অন্ধ বৃদ্ধ তখনো তারস্বরে খোদাকে আবেদন জানাচ্ছে, বৃষ্টিধারা সমানে চলেছে। মেঘমণ্ডিত স্তিমিত সূর্যালোক আমার চারিদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অন্ধ বৃদ্ধের হাতে পয়সাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। মনে হতে লাগল, ঐ মেয়েটা বোধ হয় ঐ বুড়োরই কেউ হবে, চারিদিক থেকে ভিক্ষে করে নিয়ে এসে বুড়োর কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়িটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে ঢুকেছে—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃষ্টি সমানে চলেছে। ওরই মধ্যে কখনো চেপে আসে, কখনো বা প্রায় থেমে যায়। সন্ধ্যে হয়ে এলেও মেঘ কেটে যাওয়ায় তখনো একটু আলো আছে। বৃদ্ধ ভিখারীর চিৎকার একটু মন্দা পড়েছে, বোধ হয় সারাদিন

চেঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম, একটি স্ত্রীলোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজার ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বসল। চামচিকের মতন কালো আর রোগা, ধপধপে সাদা একখানা চওড়াপাড় শাড়ি পরা—চুল বাঁধার বাহার দেখেই বুঝতে পারলুম কে সে—কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বসল। আমি যে বাড়িটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, দেখলুম সেখানকার দরজাতেও দু' চারজন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছে। অন্ধকার ঘোর হবার আগেই তারা বেসাতি খুলে বসল। দেখলুম ওপারের সেই অন্ধ বৃদ্ধও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই দেখলুম, আমার সেই দয়াময়ী ভিখারিনী পরিষ্কার কাপড় পরে দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বৃষ্টিও একেবারে থ মেরে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যারা চোখ চেয়ে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতিসাধারণ হয়ে ওঠে, তবুও এই ভিখারিনীর ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আমি স্থির করলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খুলে নিংড়ে কাঁধে ফেলেছিলুম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হয়ে ভিখারিনীর কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে একেবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাব ও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দেব না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অন্যত্র পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

—আদরিণী, আৎরী বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিট্‌মারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রশ্ন শুনেই আৎরী হাসতে আরম্ভ করে দিলে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে—আহা কত চংই জান! আজ কি নেশা করা হয়েছে শুনি?

এই বলেই সে ভিজে জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বললে—দাঁড়াও। উনুনের ধারে এটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আসি—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কি জানি বেপোট জায়গায় এসে আজ জামাটাই বুঝি আক্কেলসেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখুনি সে ফিরে এসে বললে—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

তারপরে আমার ধুতিটাতে হাত দিয়ে বললে—এঃ ধুতিও যে ভিজে গিয়েছে। একখানা শাড়ি পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ি নিয়ে এসে বললে—নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ধুতিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বললুম—ও এখুনি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হয়ে বসো তো, তোমায় গোটা-কতক কথা জিজ্ঞাসা করি।

শাড়িখানা ছুঁড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না?

—তুমি তো মোড়ের ঐ বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে দু'তিনবার এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম—ছেলে-বেলা থেকে বাঁশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি। গোটাকতক কথার ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোন মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দেব ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমায় ঠেসে গা ঘেঁষে বসেছিল, বেশ বুঝতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি কি পুলিসের লোক? বাবা আমি কোন দোষ করি

নি, আমার ওপর কোন অত্যাচার করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষে করুন।

এই বলে সে আমার পা ছুটো চেপে ধরলে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কেন যে আদরিণী অতখানি বাড়াবাড়ি করলে, তা বুঝতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—আমি মোটেই পুলিসের লোক নই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড ভাল মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচয় পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি—তোমার কোন ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে। বললে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—বাবার বয়েস কত ?—

তেইশ বছর।

আদরিণী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—বেশ হল, বাপ আর মেয়ে একই বয়সী। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে ঝঙ্কার দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মস্করা হচ্ছে। কে এয়েছে ?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে উঠল—তোর বর এয়েছে। রাস্তা থেকে তোর বর নিয়ে এযেছি—আয় না ভেতরে।

দরজা ধাক্কা দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে হল দীনবন্ধু মিত্তিরের 'জগদম্বা' বুঝি নাটক থেকে উঠে এল।

আদরিণী বললে—দেখ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে এনেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয় ?

—মুখ্যে আগুন! দিনে দিনে কত রঙ্গই হচ্ছে। নে নে আদিখ্যেতা রেখে শীগগির কর। আবার লোক আসবে—

এই বলে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আদরিণী হাসতে হাসতে বললে—কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে আমার মাকে ?

জিজ্ঞাসা করলুম—উটি কি তোমার মা নাকি ?

আদরিণী অন্তদিকে মুখ করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল। দেখলুম আমার ধপধপে সাদা সিল্ক টুইলের সার্ট ধোঁয়ায় প্রায় কালো হয়ে গিয়েছে আর তা থেকে মাছের ঝোল আর ধোঁয়া মিলিয়ে এমন একটা বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে যে, গায়ে দেওয়া দূরের কথা, সেটাকে কাছে রাখলে বমি ঠেলে আসে।

জামাটাকে গুটিয়ে পাশে রেখে বললুম—রসিকতা তো খুব হল, এবার আমার কথার জবাব দাও দিকিনি।

—কি বল ?

আমার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ঐ যে অন্ধ বুড়োটাকে দিলে, ও তোমার কে হয় ?

আদরিণী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—ও তুমিই বুঝি ঐখানে দাঁড়িয়েছিলে! এতক্ষণে বুঝেছি।

—কে হয় ও বুড়োটা তোমার ?

—কে আবার হবে! ও তো মোচলমান।

—তবে ?

আদরিণী কোন কথা বললে না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

বললুম—তোমার তো অভাব কিছুই দেখছি না, তবে তুমি ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন ? আর কার জন্যেই বা কর ?

আদরিণী চট করে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে কি দেখে ফিরে এসে বললে—বাবা, আজ তুমি বাড়ি যাও, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে—বলব—তোমাকে আমার সব কথা বলব, কিন্তু আজ নয়—কবে আসবে বল ?

—আবার আসতে হবে ?

নিশ্চয় আসতে হবে। ভুলো না, আমি তোমার মেয়ে।

আদরিণী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কি জাত ?

—জাত-টাত আমি মানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

—কি গোত্তর ?

—ভরদ্বাজ।

—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল—পরশু এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামে তাদের বাড়ি ছিল। কলকাতায় রসুইয়ে বামুনের কাজ করে সে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করত। পরিবার থাকত দেশে, কিন্তু আদরিণীর যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুললে। বছরখানেক যেতে না যেতে তার এক ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সঙ্গে আগে থাকতেই বাড়িউলির প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলাখুলিভাবেই ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে ঘর করতে লাগল। আট বছরের আদরিণী তার মা-মরা ভাইটিকে মানুষ করতে লাগল।

ভাইটি তার কাছেই থাকে, সেই তাকে খাওযায় দাওযায়, ঘুম পাড়ায়। তার ওপরে নতুন মার সঙ্গে খাটে, সংসারের কাজে যোগান দেয়, বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে আনে। দোষ করলে বাপও ঠেঙায়, নতুন মাও ঠেঙায় —গালাগালিগুলো ধতব্যের মধ্যেই নয়।

এমনি করে দিন চলছিল। যখন তার দশ এগারো বছর বযেস, সেই সময় তার বাপ মারা গেল। বাপ মারা যেতে নতুন মা তাকে এক বাবুদের বাড়ি বাসনমাজার কাজে লাগিয়ে দিলে। সকালবেলা উঠে সে তার ভাই নন্দকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি চলে যেত কাজ করতে, আর বাড়ি ফিরত রাত্রি দশটা এগারোটার সময়—সেখানেই দু বেলা খেতে পেত। দু টাকা তার মাইনে ছিল বটে কিন্তু সে টাকা সে পেত না। তার নতুন মা ঠিক সময়ে বাবুদের কাছে গিয়ে তার মাইনেটা নিযে আসত—ছেলেমানুষ হারিয়ে ফেলতে পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বালিকামনের অভিমান। নন্দর জামাকাপড কোন কিছুর খরচই নতুন মা দেয় না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝে বাবুদের বাড়ি থেকে নন্দকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষে করতে। দু'চার পয়সা যা পায়, তাই জমিয়ে ভাইকে জামাকাপড কিনে দেয়। মধ্যে মধ্যে বাবুদের বাড়ি ছোট ছেলেদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসে সংসার পাতবে, দিদির দুঃখ ঘোচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সুখ। এই

লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করে। আরও কষ্ট সহ্য করছে রাজী।

নন্দর ছ বছর বয়স হল। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইস্কুলে পাঠাবে। তার জামাকাপড়, ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছুই দিতে চায় না। নন্দকে ইস্কুলে পাঠাবার জন্য বেশি জেদা-জেদি আরম্ভ করায় নতুন মা বললে—আমি এত পয়সা কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার পয়সা রোজগার করে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দর সঙ্গে তারও বয়েস বেড়েছে—বিনা সুপারিশে সে নিজেই পয়সা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মত ক'রে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশ্যা-বৃত্তি তো দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজেগুজে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়, আর তারই খরচ যোগাবার জন্য আদরিণী সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে রাস্তায় দাড়ায়। প্রতি রাত্রে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে—তোদের মানুষ করার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা উঠে গেলে তোর পয়সা তুই রাখিস—তার আগে একটি পয়সাও পাবিনে।

আদরিণীর কোন দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে করে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোন কষ্টই কষ্ট নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কাটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেলে নন্দ আর ইস্কুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধি বিড়ি খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়-- ইস্কুলের মাইনে তাতেই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেললে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন করিসনি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে আমার দুঃখ ঘুচবে।

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মাও তার সঙ্গে সায় দিলে। বললে—এতগুলো করে টাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—যদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায়দায়, হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমাঝে রাত্তে বাড়ি আসে না। বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ি আসে—চুল উস্কোখুস্কো, চোখ রাঙা।

নতুন মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোকে আর খেতে দিতে পারব না—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

আদরিণী তাকে বোঝায়। নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সন্ধান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা করে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কি নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন মা তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিলে। আদরিণী তাকে কত মানা করলে। বললে, যাস্নি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কি রইল। দু'দিন থাক, দেনাটা শেষ হয়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব।

নন্দ শুনলে না, চলে গেলে।

আদরিণীর সংসার শূন্য হয়ে গেল। ভাইকে মানুষ করে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে করে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল। এইজন্য তেরো বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালো মেঘ এসে তার মানসউদ্যান ছেয়ে ফেললে, তার জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচেছিল, সে-ই অতি রূঢ় আঘাত দিয়ে তার সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুক্ষ চুল, মনে হয় কতদিন নাওয়াখাওয়া হয়নি। সে পয়সা চায়। কিন্তু আদরিণী পয়সা কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেরুতে লাগল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু'তিন ঘুরে বেশ রোজগার হতে লাগল। ভিক্ষার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার মনে রঙিন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে—তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময় আদরিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিন নয়, তার ঘরে চোদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু কিছু দেখে শুনে একটু একটু করে জানতে পারলুম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়দায় কাজকর্ম করে, অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাইরের সংসারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

চলছে। যাকে বৈজ্ঞানিকগণ নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানসজীবন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোন সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরুচি ও কল্পনা দিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি করে সেখানে বাস করে। হয়ত বাস্তবজীবনে সে রাস্তার মুটে, মানসজীবনে সে বিশ্বের রাজা। এই কর্মজীবনের সঙ্গে মানসজীবনের যে যত বেশি আপোষ করতে পারে, সেই তত বেশি কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না, তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তবজীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী হলেও আমি দেখতে পেতুম মানসজীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী সে। সেখানে স্বামী, পুত্র, পরিজন ও আশ্রিতজনে ভরা তার গৃহ। বাস্তবজীবনে সে নিঃস্ব, কিন্তু মানসজীবনে তার দানধ্যানের অন্ত নাই—দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরমকারুণিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি দেহ বিক্রয় করা তার উপজীবিকা, কিন্তু মনে সে সাবিত্রীসমা। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বললে—বাবা, আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। যে ভাইকে মানুষ কববার জন্য স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি বরণ করেছিলুম, সে তো বদমায়েস হয়ে গেল। আর কেন। তুমি আমায় নিয়ে চল তোমার বাড়িতে।

বললুম—আমার বাড়ীতে গিয়ে কি করবে?

সে বললে—তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করব। আমার মাইনে দিতে হবে না—দু'বেলা দুটি খেতে দেবে।

সমানবয়সী মেয়ে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হ'লে আমার পিতৃদেব যে কেউ বিশ্বাস করবে না, সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সঙ্কোচ হল। বললুম—আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞেস করে দেখবো।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠোনে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে, আর সে তার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোঁড়াটা চলে গেল। দেখলুম, আদরিণীর ডান দিকের ভুরুর পাশে রগটা একটু ফোলা আর তার চারদিকে অনেকখানি জায়গা কালশিরে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে, কি করে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বললে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা করে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিনদশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকায় দুপুরবেলা ভিক্ষায় বেরুতে পারেনি। নন্দ সে কথা মানলে না। শেষকালে রেগে গিয়ে সে তাকে মেরে অজ্ঞান করে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, —একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলব না তো আর কি বলব!

সেদিন সে আশ্চর্য রকমের গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার কি হল, একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশঙ্কা করছিলুম এবার বোধ হয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বললে—বাবা, তোমাকে একটা কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

—খুব ভাল। কি করবে?

—আমি বিয়ে করে চলে যাব এখান থেকে।

—সে তো ভাল কথা। কাকে বিয়ে করবে?

—হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বললুম—সম্প্রদান করতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

—ঐ যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

—ও কাদের ছেলে?

—হাড়ীদের!!!

আদরিণীদের বস্তির একটু দূরেই একটা বড় মাঠ পড়ে ছিল। বড় মানে শহরের হিসাবে বড়। এই মাঠের একদিকে কয়েকঘর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড় বড় চেটাই-পেতে টিকে দিত, এইজন্য এই মাঠকে ও-অঞ্চলের লোকেরা 'টিকেপাড়া'র মাঠ বলত। সে সময় কলকাতার অনেক জায়গায় এই রকম টিকেপাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকেপাড়ার মাঠের

আর এককোণে ছিল ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শুয়োর পুষত আর সেই শুয়োরের দল মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চেটাইয়ের আধশুকনো টিকে চটকে দিত বলে টিকেওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত।

হাড়ীদের মধ্যেও বড়লোক, মেজোলোক ও ছোটলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়লোকের মেয়েরা মেথরানীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেঁড়া জামাকাপড়ের বদলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুজোপার্বণে লোকের বাড়িতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চ্যাচারি দিয়ে ঝুড়ি, চেটাই, দর্মা ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড় বড় পুতুল তৈরি করত। মেজোলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ি মেথরানীর কাজ করত আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটলোকদের স্ত্রীপুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে। তাদের বাড়ির কেউ মেথর মেথরানীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাস করত। এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হত। এই মেয়েগুলি তাকে নিস্তার-মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলুম—ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়িতে কতকগুলো খালি ঘর ছিল। সেগুলোকে সে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে বলা হত খোঞে। আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন মিলনকুঞ্জ। বাইরের যে কোন স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টায় দু'আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোঞের কথা তখনকার দিনে গুণীলোক মাত্রেরই জানা ছিল।

হাড়ীপাড়ার মেয়েদের দেহসৌষ্ঠবের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দু-পট্টির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেককেই ফাদার নিস্তারের খোঞেতে দেখা যেত। মাঝেমাঝে সেখানে শাশুরী-বৌয়ে, মায়ে-ঝিয়ে ঠোকাঠুকি হয়ে গিয়ে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হত। এইখানকারই এক বয়স্কা হাড়ীগিন্নীর সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোঞেতে আসত, মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোক খোঞেতে আসত, তার বেশ

প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে দুদিকে ঘোঁট বাধিয়ে তুললে। এই ঘোঁট যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলুম।

সত্যি কথা বলতে কি, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভাল লাগল না। বিয়েতে কিছু আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগল।

আদরিণী আমায় বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা তুমি কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে করে কি তার চেয়ে ভাল থাকবে?

আদরিণী বললে—এখন আমি কিছুই ভাল নেই, বিয়ে করলে হয়ত এর চেয়ে ভাল থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলুম, নইলে লোকের বাড়ী গতর খেটে আমার ভাতকাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়ত একটা ভাল লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুম সে হ'লো একটা অমানুষ—আমার দুঃখ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বললুম—আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত করে দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোন একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভদ্রলোককে বিয়ে করবে—না হয় এরনিই ভদ্রভাবে থাকবে—এমন তো অনেক মেয়ে আছে।

আমার কথা শুনে আদরিণীর মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। সে বললে—আমার লেখাপড়া হবে বাবা? বয়েস যে অনেক হয়ে গিয়েছে তোমার মেয়ের!

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি? মন দিলে সব বয়েসে লেখাপড়া শেখা যায়।

—সেই ভাল বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর—বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতেন। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের টাকাকড়ি কিছু ছিল না, চারদিক থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে

আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরুব্বী ছিলেন। আশ্রমে অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে কয়েকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হত। আমি সাহস করে একদিন আশ্রমের কর্ত্রী ঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বললুম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চেপে গিয়েছিলুম। তার সম্বন্ধে সত্যমিথ্যায় মিশিয়ে বেশ একটি করুণ কাহিনী রচনা করে তাঁকে শোনালুম।

সব শুনে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? কোথায় আলাপ হল?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক জেরা করে তিনি আমায় বললেন—আপাততঃ তাঁদের ফণ্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ধারকামী যুবতী আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী—এই শুভ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়িতে জানিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সঙ্গে একই সরকারী দপ্তরে এক ভদ্রলোক চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বাবাও মাঝেমাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতেন। কলকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ বালক-বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কি করে একটা আশ্রম খোলা যায়, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ির কাছেই সস্তায় একখানা ভাঙা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড় একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি মুষ্টি ভিক্ষায় বেরতেন। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ আধমনটাক চাল ও কিছু তরকারি নিয়ে বাড়ি ফিরে রান্না চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল—দেশজোড়া তার নাম-ডাক হল, তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হল। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ

আছে। বৃদ্ধ বয়সে বদনামের পশরা মাথায় নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে হল।

সে কথা যাক্, আমি একদিন সন্ধ্যের সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে-যে দুঃখের কাহিনী আমি তৈরি করেছিলুম, তা শুনে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। কি করে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোন প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোন মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তুমি ছেলেমানুষ (তখন আমার চব্বিশ বছর বয়স), এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই বলে, ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠতেই তিনি বললেন—তাই তো হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? তুমি যে রকম বললে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভাল আশ্রয় না পায় তাহলে বিপথগামিনী হতে পারে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে! তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরেও এসেছে। তার ভালমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ তো হতে পারছি না। কি বল?

আমি আর কি বলব। চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বললেন—এক কাজ করা যাক্। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপাততঃ তাকে আমার ভাই কিংবা বোনের বাড়িতে রেখে দোব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ভগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বললুম—তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি। ভাল গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—খুব ভাল লোক তারা।

আদরিণী একেবারে লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায়

জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি আমার সত্যিকারের বাবা। গেল জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম ফাদার নিস্তার এ কয়দিন উঠতে-বসতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাকে সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে, কিন্তু হেমা কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বললে—আহা! আমি চলে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে—বড্ড ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড় গড় করে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। আমি বললুম—আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কি নেবার গুছিয়ে নাও—এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

আদরিণী বললে—এখানকার কোন জিনিস নেব না বাবা—এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকব না। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। এতদিন আমার জীবন যেভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়। এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই—কেউ কোনদিন ছিল না। আমি যেন এক্ষুণি জন্মেছি—যারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বললুম—তবুও একটা দুটো শাড়ি-গামছা ইত্যাদি নাও, কি জানি সেখানে গিয়ে তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজী হয়ে আদরিণী আলমারি থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে সে বললে—এবার বাবা আমি মন্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু—

বললুম—বেশ!

আদরিণী জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত তারা?

—কারা?

—যেখানে যাচ্ছি।

—তারা ক্রীশ্চান, জাত-টাত মানে না।

—এঁ্যা! ক্রীশ্চান। গরু খায়?

আদরিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পোঁটলাটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বললুম—ক্রীশ্চান হলেই কি গরু খেতে হবে নাকি? তারা বোধ হয় মাছ-মাংসও খায় না।

আদরিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কঠিন স্বরে বললে—না বাবা, জীবনভোর অনেক পাপ করেছি, আর ক্রীশ্চানের অন্ন খাব না। বরাতে যা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে আমি।

কথাগুলো শুনে আমার রাগ হল। প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের কাছে দেহ বিক্রী করে যে হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, ক্রীশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দুত্ব যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সেকথা মানতে রাজী হল না। শেষকালে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এরই মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি হল? দিনরাত অমন করে মরছ কেন?

আদরিণী কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগল। নিস্তারিণী আমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ গা, ভালমানুষের বাছা! ওর মাথায় এ সব কি বুদ্ধি দিচ্ছ? এতে কি তোমার ভাল হবে, না ওরই ভাল হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচানাচি শুরু করেছে—বলি কেন? কিসের জন্য শুনি?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?

—বলে চলে যাব, বিয়ে করব—লেখাপড়া শিখব। যা দিকিন্ তুই—

আদরিণী এবার গর্জে উঠল—আলবৎ যাব।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহবিক্রমে আদরিণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে আরম্ভ করলে। আদরিণী কোন বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগল—মার, মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে বুঝব।

ফাদার নিস্তারের চিৎকারে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদরিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটি ঘটি টেনে নিয়ে তাই দিয়ে আদরিণীর মাথা ও মুখ থেঁতলাতে আরম্ভ করে দিলে।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে ফেললুম। বাড়ির মধ্যে বাইরেও অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে জমা হয়েছিল, তারা সকলেই পাড়ার লোক, সকলেই আংরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত্র নিস্তারিণী গর্জে উঠল—ভাল হবে না বলছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়িউলি—আমায় চেনো না ?

আমার মাথায় তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলুম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বললুম—আমি একে পুলিসে দেব—তোমরা সবাই দেখেছ, এ আৎরীকে কি রকম মেরেছে।

পুলিসের নাম শুনেই ভিড়েব পুরুষ দর্শকরা একে একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদেব পাড়ার এক পাল স্ত্রী-পুরুষ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কে কাকে মেরে? আৎরী—আৎরী কোথায় ?

একবার চারিদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক করে দাওয়া উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আদরিণীকে দেখে বললে—ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে। কে মেরে ? বল কে মেরে ?

আদরিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটি ফাটি করছে, এমন সময় হেমা বললে—চ আৎরী আমাদের ঘরকে চ—কাল নগনসা আছে—

আদরিণী মাটি থেকে উঠে টলতে টলতে বললে—চ।

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপরের মতন ভোঁস্ ভোঁস্ করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম করে কিছু ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদরিণীকে অগ্রসর হতে দেখে সে গর্জে উঠে বললে—খবরদার আৎরী, বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ কি খুন করে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হতে না হতে আদরিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া টপকে একেবারে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাঁদি নৎ। দুই কানের ওপর থেকে ডিম অবধি সারি করে মাকড়ী—এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নৎ ও কানের দু'তিনটে মাকড়ী ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তধারা ছুটতে লাগল।

—ওরে বাবা, এত রক্ত—বলে নিস্তারিণী তো ঘুরে মাটিতে পড়ল

ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আদরিণীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে তারই ওপরে তার পেটে দমাদম লাথি মারতে আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ির অন্য মেয়েরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগল। আদরিণীকে গিয়ে ধরব না পলায়ন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিয়ে তাকে ধরে ফেললে।

আদরিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—চ হেমা।

আমি গুটিগুটি দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলুম। আদরিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বললে—বাবা বুঝি মেয়ের কীর্তি দেখে সরে পড়ছিলে?

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মাঠের কাছে পৌঁছে আমি বললুম—আচ্ছা এবার আমি চললুম।

আদরিণী বললে—চললে বাবা। আচ্ছা তাহলে কাল নিশ্চয় এস—কাল আমার বিয়ে।

বললুম—ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু' একদিনের মধ্যে আসব।

—না না, কাল আসতেই হবে।

তারপর একটু হেসে বললে—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল।

তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভরদ্বাজের দিব্যি রাখতে পারিনি। বোধ হয় সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেলে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলুম তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে করে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হতে লাগল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার আগেই খুশীতে ডগমগ হয়ে আদরিণী বললে—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমাদের দু-জনেরই রেলে চাকরি হয়েছে—মেথর ও মেথরানীর কাজ। ও পাস আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব—

॥ অনির্বাচিত গল্প ॥

বিপদ | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ি বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকালবেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠামশাই? একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?

বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি ষোল সতেরো বছরের মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম। এইবার চিনিলাম। রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ বছর পাঁচ ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোন খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েচে দেখচি। শ্বশুর-বাড়ি কোথায়?

—কাল্যোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হল?

—এই দু' বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও, বাড়ির মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইটি জ্যাঠামশাই। আপনি লোক রাখবেন?

—লোক? না, লোক তো আছে গয়লা বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন? থাকবে কে?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের দুটো খেতে দেবেন।

—কেন তোমার শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেখার দেরি হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউমাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যেভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউমাউ' কথাটি সুষ্ঠুভাবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটিই আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে ও এক টুকরা পেপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে বামুন-বাড়ি কলসী উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, দু'বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ির অবস্থাও অতি খারাপ। রামচরণ বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করিয়া দুটি অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন-পালন করে।

মেয়েটি মায়ের ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ এক বছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ির ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিগ্যেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ি থাকবে বলেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—খবরদার বাবু, ওকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর? কি রকম চোর?

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুজ্যেবাড়ি রাখেনি ওকে, যা তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি করে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই খাই—কেবল খাব। ওর পেটের খোরাক জোগাতে না পেরে মুখুজ্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন পথে পথে বেড়ায়।

—ওর মা ওকে দেখে না?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতে। ওকে বলেচে, আমি কোথায় পাব? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই দোরে দোরে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির উপর আমার দয়া হইল। যখনই বাড়ি আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারটে পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত খাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ি হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ির সামনে হাউহাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি, হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ির দিকেই আসিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম মধু চক্রবর্তী নাকি তাহাকে মারিয়াছে। আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটি ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতব্বর এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী, তখনই মধু চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ি হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ?

—হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত চোর একটি। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েচে গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড় ভরে পাকা কাঁচা ঝাল চুরি করেচে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের

উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না।

—না, খুব অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা ওসব কি? ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ, ফেরত দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়ি ভিক্ষে করিতে না যায়।

এই সময় আকাল শুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম, ছেলে কোলে গোয়ালাপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়। যেন মস্ত একটা সংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে খুঁজিতেছে।

—এই। আপনাদের বাড়িও যাব।

—বেশ। আমাদেব বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি?

হাজু খুব খুশী। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয জানি। কাঁটাল-তলার ছাযায় বোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওযা দেখিতে হয। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছটাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও··।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ?

—সে নানান্ কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সব বসবাব জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ? আর কিছু না?

—এই তো শুনেচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহলে কি আর ঘরের বৌকে কেউ তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারাও তেমনি!

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায়নি। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেচেন কাণ্ড ?

—কি ?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময় থাকিও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্য দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়!

বলিলাম—কে ?

—এই যে আমি—

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙিন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে ?

—বারে, চিনতে পারলেন না ? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু ?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বারে, ভুলে গেলেন ? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা

উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না।

—না, খুব অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা ওসব কি? ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ, ফেরত দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়ি ভিক্ষে করিতে না যায়।

এই সময় আকাল শুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম, ছেলে কোলে গোয়ালাপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়। যেন মস্ত একটা সংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে খুঁজিতেছে।

—এই। আপনাদের বাড়িও যাব।

—বেশ। আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি?

হাজু খুব খুশী। খাইতে পাইলে মেযেটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁটাল-তলার ছায়ায রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম —একটু মাছটাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও...।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ?

—সে নানান্ কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ? আর কিছু না?

—এই তো শুনেচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহলে কি আর ঘরের বৌকে কেউ তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারাও তেমনি!

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায়নি। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেচেন কাণ্ড?

—কি?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময় থাকিও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্য দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়!

বলিলাম—কে?

—এই যে আমি—

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙিন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে?

—বারে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বারে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা

লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুন তার কৃতিত্বের বহরখানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিল—আসুন না, দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারব না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন?

—বাড়ি যাব।

সে আবদারের সুরে বলিল—না। আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—

কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নিচু রোয়াক খড় ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারি ধরনের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোষের ওপর সাজানো গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোট জলচৌকির ওপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্-ঝক করিতেছে। মেজেতে একটা পুরনো মাদুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা এক জোড়া, একটা হুঁকো, টিকে-তামাকের মালসা, আরও কি কি।

হাজু গর্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো। কত ভাড়া দিতে হয়?

—সাড়ে সাত টাকা।

—বেশ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন? পা ধোয়ার এখন কোন দরকার দেখচিনে। আমি এখুনি চলে যাব।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাব না। সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি নে—কিছুতেই শুনব না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াব এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিস দেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশী ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশী দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরম-হিতৈষী সাধু হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।

সঙ্কল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়িতে।

কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশী হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশাই?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আস্বাদ। বলিলাম—কোথাকার চা?

—এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস ?

—হুঁ, দুটি বেলা চা না খেলে সকালে কোন কাজ করতে পারিনে জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু!...

ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ির বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাসুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউমাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না খাইলে নাকি কোন কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তা হলে এখন উঠি হাজু। সন্ধ্যে উৎরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাব।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা টাকা দেব, আপনি নিয়ে যাবেন? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড পাঠিয়ে দিলাম।

—কার হাত দিয়ে দিলি ?

—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তাব হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।

—তোর ছেলেটা কোথায় ?

—মার কাছেই আছে। ভাবচি, এখানে নিয়ে আসব। সেখানে-খেতে-পরতে পাচ্চে না। এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে তো অছেদ্দা হল। সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কখনো খাইনি। এই এত বড় বড এক একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন ? আমি গিয়ে আলুর দম আনব ? খেয়ে দেখবেন।

নাঃ, ইহার সরলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম—না, আমি এখন যাচ্চি। আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাব না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পার। অন্য লোকে দেবে কি না

দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েছে কিনা, তার ঠিক কি ?

হাজুর এ সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠা-মশাই, টাকাটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। মা পায় কি না পায় তা কি জানি।

—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েচ ?

—তা কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশি। আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই ? মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভালো লাগে ?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস ?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা। চলি—

—আবার আসবেন জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখে শুনে যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোন টাকা দিয়েছিল ?

হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই না। কে দেবে টাকা ?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানা-জানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার ?

॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

থিরেশা | শ্রীবাসব

কোহিমা অবরোধের যুদ্ধে জাপানী বিমানের সঙ্গে প্যাটেলের সংঘর্ষ বাধে। শূন্যে যুদ্ধ চলে বিমানে বিমানে। ফলে প্যাটেলের বিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মেঘারণ্যের স্তরে স্তরে।

জ্বলন্ত এক চূর্ণখণ্ডের সঙ্গে আহত ও অজ্ঞান প্যাটেল ছিটকে পড়ে, এক বিস্তৃত জলাভূমির মধ্যে।

তবু প্যাটেল বাঁচে।

তারপর ছ' মাস কেটে গেছে। একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই তাকে নিয়ে আসা হল দেরাদূনে। তার লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাকে আনা হল এই শৈলাবাসে।

মিঃ প্যাটেল আরোগ্যলাভ করেছে! জীবনের মত সব হারিয়ে সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। গুলিবিদ্ধ একখানা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এবং হাত থেকে সেইদিকের সর্বাঙ্গ অবশ ও পঙ্গু হয়ে গেছে। বেঁচে উঠেছে অথর্ব, অকর্মণ্য ও পরমুখাপেক্ষী পঙ্গু হয়ে। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে পূর্ণ যৌবনের বুকভরা আশা-আকাঙ্খা ও বাসনা নিয়ে তাকে জীবনের রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় নিতে হল। বঞ্চিত হল সংসারের সকল আনন্দরস হতে। নিষ্ঠুর নিয়তি! কী

প্রয়োজন ছিল তাকে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে এই আলোর মাঝে ফিরিয়ে আনবার? অন্ধকে আতসবাজী দেখানোর মতো এ নিষ্ঠুর পরিহাস। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সে বইবে কেমন করে নিজের এই নিরুপায় অক্ষমতার বোঝা?

মানুষ হিসেবে প্যাটেল অতিরিক্ত চাপা আর শক্ত। ভিতরে ঝড় বইলেও বাইরেটা তার স্থির। সে ঝড়ের মুখে ভেসে যায় না। নিজের অন্তরের আগুনে নিজেই পুড়তে থাকে। অপরের গায়ে তার আঁচ লাগতে দেয় না। কৃষ্ণার কাছে প্রকাশ করে না নিজের মনের কোন ক্ষোভ। লাভ কী? তাপ ও আলো দেবার শক্তি যার চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে তার চলতি জীবনের উৎসব থেকে একটু দূরে থাকাই সমীচীন।

কিন্তু কৃষ্ণা? নিজে না হয় পাশ কাটাবার চেষ্টা করল নিরুপায় হয়ে। নিজে না হয় মিথ্যে হয়েই রইল। কিন্তু কৃষ্ণা তো মিথ্যে নয়। ছায়া বা স্বপ্ন নয়। তার দেহের স্ফুরিত যৌবনের পরম ক্ষুধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পশরা নিয়ে তরী ভেড়াবে সে কোন্ ঘাটে? কোন্ সাগরের বেলাভূমে? ওর জীবনের পরিসমাপ্তি কোথায়? কোন্ দূর মরুপ্রান্তরে? ওর অতৃপ্তির নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যে পাষাণ ক্ষয় হয়ে যাবে। তাকে ধরে রাখবে সে কি দিয়ে?

তার ঐশ্বর্য অপরিমেয়। জাগতিক সুখের সব উপাদানই অজস্র। একটা নারীর পক্ষে অপর্যাপ্ত। অফুরন্ত। কিন্তু তার নারী জীবনের সেই তো সিদ্ধি নয়। বেঁচে থাকার পরমার্থ নয়। সেই সঙ্গতি নিয়েই কি ওর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে? সে যে ওর জীবনের অপমৃত্যু। যৌবনের অপঘাত। নারীত্বের ও মাতৃত্বের চিরনির্বাসন।

কেন যে এল? এর চেয়ে কৃষ্ণার আমরণ প্রতীক্ষা ছিল ভাল। প্রতীক্ষার আঘাতে আঘাতে যদি শুকিয়ে নির্জীব হয়ে ওর জীবন হত অবসান, সেও ছিল ভাল। প্রতি মুহূর্তে এই নৈরাশ্যের অপার শূন্যতা বুকে বয়ে ও বাঁচবে কেমন করে?

কৃষ্ণা তার তারুণ্যের সজীবতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সদ্যোস্নাতা শুচিশুভ্র রূপ। ফুলের মতো তাজা আর মসৃণ তার অনাবরিত দেহাংশ। পিঠের ওপর কালিন্দী নদীর মতো ঢেউ তোলা চুলগুলো ছড়ানো। পিঠ ঢেকে কোমর ছাপিয়ে উপচে পড়েছে শ্রোণীতটে। অনাড়ম্বর বেশ। মুখে

মৃদু হাসি। হাসিতে তারুণ্যের আবেদন। সর্বাঙ্গে আনন্দের অজস্র উপকরণ।

প্যাটেলের চোখ ভরে যায়।

অতৃপ্তির আকর্ষণ বড় প্রচণ্ড। আকাশ দেখা চলে, ধরা যায় না। তাই আকাশের পানে অনিমেষে চেয়ে থাকা। কৌতূহল আর আনন্দ মন থেকে ভেসে ওঠে চোখে। চোখ ফেরানো যায় না। প্যাটেলও পারে না কৃষ্ণার মুখের উপর হতে চোখ ফেরাতে। অন্তর্লোকের অকপট ভালবাসা যেন তার দৃষ্টির দোর খুলে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। মন তার দাক্ষিণ্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই অপরূপ লাবণ্যবতী মেয়েটি তার যৌবনের প্রথম প্রভাতে তার কানে প্রেমের জাগরিণী গেয়েছিল। মোহময় স্পর্শ দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল। কৌমার্যের সঙ্কোচভরা কামনা পূজোর ফুলের মতো তার কাছে নিবেদন করেছিল। সে স্মৃতি আজো তার মানস-পটে। সে অনুভূতি আজো তার অস্থিপঞ্জরে। তখন দুজনেরই ভরা যৌবন।

একজনকে দেখে আরেকজনের অকারণে হাসি। কটাক্ষের বিদ্যুৎ। শরীরের কণ্টক। দৃষ্টির সংঘর্ষে মর্মলোকের অদ্ভুত কাঁপন। এসব আজো প্যাটেলের মনে আছে বৈকি! সে যে তার জীবনের প্রথম নারী। তারুণ্যের প্রথম কামনা।

তারপর দুজনে আশ্চর্যভাবে এক হয়ে গেল। তাদের পৃথক সত্তা রইল না। মনের অধীরতা, দেহের মদিরতা, এরই মাঝে তাদের আনন্দোৎসবের ক'টি বছর প্যাটেলের জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। আজো তার মোহমুক্তি ঘটেনি। কৃষ্ণার পরশ আজো তার পঙ্গু দেহে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে। তার রক্তে আগুন ধরায়। নিজের নির্বিষ উত্তেজনা ও নিরুপায় ব্যর্থতার পাষাণভারে সে অর্ধচেতন অবস্থায় নির্জীব ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণার সতেজ রক্তের আদিম ক্ষুধাকে সে মেটাবে কেমন করে? বিষাক্ত ফণা তুলে এই মহাপ্রশ্ন তার বুকে ছোবল মারে। সে নিভৃত শয্যায় রাত্রির অন্ধকারে অন্তর্যামীর চরণে নিষ্ফল মনে অন্তর্বেদনা নিবেদন করে।

কৃষ্ণা তখন সেই ঘরের স্বতন্ত্র শয্যায় ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে, কিংবা স্বপ্ন দেখে।

একই ঘরে, দুটি প্রাণী অন্ধকারের অবচেতনায় নিষুপ্ত রাত্রির ভারগ্রস্ত প্রহর গণনা করে। শুধুই কি এরা? যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে দেশ-

দেশান্তরের এমনি কত অভাগা অভাগিনী যে হতাশায় বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কে তার হিসেব রাখবে ?

কাজের ফাঁকে কৃষ্ণা তার কাছে এসে বসে। নিজের প্রাণশক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত করে তাকে সজীব করে রাখবার চেষ্টা করে। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে প্যাটেলের সেবায়। ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ধারিত সময়ে তার স্নান ও খাবারের ব্যবস্থা করা। তাকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে বেড়াতে যাওয়া। কম্পাউণ্ডের মুক্ত বাতাসে বসে তার সঙ্গে গল্প করা।

অখণ্ড অবকাশ। সময় চিহ্নিত নয়। পুরনো জীবনের হাওয়া লাগে গায়ে। তবু ঝড় ওঠে না। ঝড় তুলতে তো আসে না কৃষ্ণা। ঘুম পাড়িয়ে দিতে আসে। জাগাতে নয়।

প্যাটেল বলে, যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনী। ক্যাম্পের প্রচলিত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ধারা। শুধু দায়-দায়িত্ব আর কর্তব্য। বোমারু বৈমানিকের রোমাঞ্চকর অভিযান। বিমান যুদ্ধের জ্বলন্ত বর্ণনা। কৃষ্ণা রুদ্ধশ্বাসে শোনে আর তার পৌরুষ ভরা কঠিন মুখের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। কৃষ্ণা যেন চোখের সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে। ভয়ে আঁতকে উঠে কখনো কখনো চোখ বোঁজে। তার মুখে সকরুণ ব্যর্থতার বেদনা আর বিষণ্ণ নম্রতা।

প্যাটেল বলে, যাবার সময় তুমি আমায় বাধা দিয়েছিলে। আমার পথ-রোধ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী সে তোমার দুর্জয় অভিমান। আজো ভুলতে পারিনি তোমার সেই সর্বহারা মুখের ভাব।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাটেল বলে, জানি তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে আমায় হারাবে।

কৃষ্ণা হেসে আবহাওয়াটাকে সহজ করতে চায়। বলে, কিন্তু তুমি তো—?

—আমি তো ফিরে এসেছি এবং বেঁচে উঠেছি ?

হাসি মুখে কৃষ্ণা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

প্যাটেল বলে—ইউ আর এ ফুল্। আমি ফিরে এসেছি বটে। কিন্তু—

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাটেল আর্তস্বরে বলে ওঠে, আই অ্যাম লষ্ট টু দি ওয়ার্লড। আই অ্যাম লষ্ট টু লাইফ। আই অ্যাম লষ্ট টু ইউ ফর্ এভার।

কৃষ্ণা বলে—প্লীজ, ওসব কথা এখন থাক।

সেদিন সকাল থেকেই মেঘ করেছিল। দুপুর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি নেমেছে। তাই আজ এই ঘরের ভিতর আসর জমেছে। আজ সন্ধ্যে নেমেছে অবেলায়। বেলা থাকতেই আঁধার নেমেছে। মেঘে মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে। ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া বইছে। এলোমেলো হাওয়ায় বৃষ্টির গুঁড়োগুলো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। সব যেন কুয়াশায় ঘোলা। বাইরের উঠোনের বড় বড় দেওদার, রাস্তা, পাহাড় সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। শুধু একটানা একটা ধ্বনি। বাতাসে বৃষ্টিতে গলা মিলিয়ে যেন গান ধরেছে।

প্যাটেল চোখ বুজে জোরে জোরে সিগারেট টানে। স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মতো তার মুখের ভাব। দুঃস্বপ্নমথিত ঘুমের ঘোরে যেন তার কালো চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলো নিথর হয়ে গেছে। তার ভেতরটা যেন শূন্য। চেতনা আছে। অথচ শূন্যতার চাপে সে যেন সচেতন হতে পারে না।

কৃষ্ণা কি বোঝে সেই জানে। আস্তে আস্তে প্যাটেলের পাশে এসে বসে। তার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। প্যাটেল তার স্নেহের স্পর্শ পেয়ে যেন ঘুম হতে জেগে উঠে তার মুখের পানে তাকায়।

কৃষ্ণা বলে, ভাল একটা গল্প বল। আসল যুদ্ধের গল্প। আমি খুব গরম কফি খাওয়াচ্ছি।

প্যাটেল কি ভেবে বললে, বেশ। তাই শোন। একটা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রেমের গল্প বলি।

—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেম? কৃষ্ণা হেসে উঠল।

প্যাটেল বললে, তবে কি? শুধুই কি সেখানে, বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়—খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়? তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্র প্রেমের মহাতীর্থ।

—কী রকম? কৃষ্ণা উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকাল।

কৃষ্ণার মুখের পানে চেয়ে প্যাটেল জিজ্ঞেস করলে, তুমি রাগ করবে না তো? এ গল্পের নায়ক আমি নিজে, তাই জিজ্ঞেস করছি।

কৃষ্ণা উত্তর দিল, সব কিন্তু বলতে হবে।

—আমি অবিকৃত সত্যই বলব। এ আমার স্বীকৃতি! রাগ বা দুঃখু করো না।

সিগ্রেট ধরিয়েই প্যাটেল বললে, ল'জেনের এরোড্রোম হতে আশপাশের

গ্রামগুলো প্রায় তিন চার মাইল দূরে। রসদ অবিশ্যি আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্তই পেতুম। তবুও টুকিটাকি অনেক কিছু সংগ্রহ করতে মাঝে মাঝে আমরা গ্রামে যেতুম। বিশেষ করে হাট বারে। গ্রামের মেয়েরাও অনেক কিছু বেচতে আসত আমাদের এরোড্রোমের আশেপাশে। বিশেষ করে ক্ষেতের তাজা ফল, শাকসব্জী। ঘরোয়া পনির, মাখন, চাট্‌নি, জ্যাম ও জেলি। অনেক সুন্দরী তরুণী দূর গ্রামান্তর হতে ফুল ও চকোলেট বেচবার অছিলায় এসে উপবাসী সৈনিকদের কামনা-বহ্নিতে আহুতি দিয়ে যেত। তারা আমাদের কাছে এমনি ভাব দেখাত, যেন আমাদের আতুর শরীর মনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য তারা আমাদের সেবার দাবি করছে। আমাদের অনিবার্য প্রয়োজন ও অভাব মেটাতে চাইছে। এটা যেন নিছক আমাদের উপর তাদের সহৃদয় অনুকম্পা আর সুগভীর মমত্ববোধ। আমাদের আনন্দ দিয়ে প্রীতি কুড়োনো ছাড়া আর কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য তাদের নেই। দুটো ভাল সিগারেট, ভাল বিস্কুট, রুটি বা সামান্য কিছু টাকা পেলেই তারা খুশি হত। কুণ্ঠা ছিল না। দ্বিধা ছিল না। দ্বিরুক্তি নয়। অনায়াসে অকাতরে তারা নারীদেহের ঐশ্বর্য আমাদের সেবায় ও ভোগে উৎসর্গ করে দিত। তাদের দেহ ঘিরে একটা তৃপ্তির আলো ঠিকরে পড়ত। পাখা মেলে পরমানন্দে তারা নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে যেত। আমি অবাক্ হয়ে তাদের এই সমর্পণের চেহারাটা দেখতুম।

তারা বলত, সৈনিকরা তাদের চোখে ঈশ্বর। দেবতার কাছে উৎসর্গ করার মতোই তারা একান্ত হয়ে নিজেদের নিবেদন করছে। সৈনিকদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, তাদের ক্লান্তিকর অবসরকে রোমাঞ্চিত করে তোলবার জন্য, তাদের চারিপাশে ইন্দ্রজাল রচনা করে মৃত্যুর বিভীষিকা ও অবসাদের ছায়া মুছে দেবার জন্য, তাদের প্রাণচঞ্চল করে তোলবার জন্যই, তারা অপরিচিত পুরুষের আলিঙ্গনে ধরা দেয়।

আমায় ভাবিয়ে তুলত। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এই অভাবনীয় নীতির কোন বনিয়াদ আছে কিনা আমি শুধু তাই ভাবতুম। তারা নিঃসন্দেহে জানত এবং বুঝত যে এই পরিচয় ক্ষণিকের। তাদের ধারণা ক্ষণিকের এই পুলক স্পন্দন সৈনিকদের প্রাণশক্তি বাড়িয়ে দেবে। তাদের সজীব করে তুলবে। সুরার বহ্নিস্রোতের মতো তাদের শিথিল স্নায়ুগুলোকে মজবুত ও ধারালো করে তুলবে।

তাদের অনেকের ঘরে গেছি। দরিদ্র হলেও পরিচ্ছন্ন পল্লী নিকেতন। স্বচ্ছন্দশ্রী আনন্দময় সংসার। প্রিয়জনের কলহাস্যে ও জীবনচাঞ্চল্যে মুখরিত। তাদের আতিথ্যে ও সেবাযত্নে মরণ সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে জীবনের নব সূর্যোদয় দেখেছি। এদের আমি কোনদিন ঘৃণা করতে পারিনি। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বীভৎসতা হতে ফিরে এসে এদের মাঝে জীবনের আলো দেখতুম। মনে হত বেঁচে আছি।··

রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগে ছেদ পড়ল। কফির ট্রে নিয়ে বয় এসে ঘরে ঢুকল। কৃষ্ণা উঠে দাঁড়িয়ে কফি পরিবেশন করলে।

কৃষ্ণা বললে, এতক্ষণ তো ভূমিকাই হল। আসল গল্প কৈ ?

প্যাটেল হাসতে হাসতে উত্তর দিল, এই তো আসল গল্প। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নীতির কথা বলছিলুম না ? এই হচ্ছে যুগের নীতি। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা আর বেঁচে থাকা এই হল চলতি যুগের ধর্ম। এই সদিচ্ছাকে স্পর্শ করতে পারে না কোন পাপ। কোন দুর্নীতি। যাক সে সব কথা।

নতুন সিগ্রেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে প্যাটেল বললে। এই যে-সব মেয়েরা আমাদের সেনানিবাসে আসত, অধিকাংশ সময়ই একদিনের পর আর তাদের দেখা মিলত না। তাদের দৃষ্টিভংগী ছিল আলাদা। প্রেম তাদের কাছে ভোগাসক্ত মনের দেহাশ্রয়ী কামনা। দেহ সম্ভোগের সংকীর্ণতার মাঝেই তাদেব প্রেমের পরিমণ্ডল। পুরুষই তাদের ভোগের উপকরণ। তাদের যৌবন প্রদীপ ধরবার পিলসুজ। তাদের যৌবন পিপাসার ফেনিল সুরা।

একটি মেয়ে কিন্তু কিছুদিন ধরে আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে রেখেছিল। মেয়েটির চোখের তারা কালো। বেশ বড় জলজলে চোখ। মেয়েটির প্রাণ চাঞ্চল্য যেন সেই চোখ দুটি দিয়ে উপচে পড়ত। তার নাম থিরেশা। থিরেশার সঙ্গে আমার আলাপ হয় এক রেস্তোরাঁয। হাটের পথে সেই ছোট রেস্তোরাঁ। সৈনিকরা কফি আর বিয়ার খেতে সেখানে উঠত। তার সঙ্গে আলাপের সেই দিনটি আমার বেশ মনে পড়ে। সেদিন ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমি হুইস্কির জন্যেই সেই রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংটার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় থিরেশা এল। গায়ে একটা কালো লম্বা ভেলোর কোট চাপা। রূপসজ্জা দিয়ে রূপকে উসকে তুলেছে। বুঝলাম অভিসারিকা কুয়াশা-ঘেরা ধূম ধূসর রাতে নিরুদ্দিষ্ট নায়কের সন্ধানে বের

হয়েছে। দীঘল তন্বু দেহ। মেদের আক্রমণ নেই। মদির নয়নে দীর্ঘ কালো পল্লব। শরীরময় একটা বন্য মাদকতা। দৃষ্টি ভরা যৌন আবেদন। লিপষ্টিক আঁকা ঠোঁটের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট। বলতে লজ্জা নেই সেই মুহূর্তেই আমি নিজেকে তার পাশে নায়ক ভেবে নিলাম।

রকমারি শখ এই থিরেশার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার জিপে ঘুরে বেড়াত। প্লেনে ওড়বার শখ তাকে এমনি পেয়ে বসল যে কিছুতেই সে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এরোড্রোমের ধারে আমার প্রতীক্ষা করত। তারপর গভীর রাত্রি অবধি আমাদের নকল প্রেমের আসর জমত নিভৃতে, নদীর ধারে, পুরনো একটা গাছের নিচে। কোন কোনদিন সেই রেস্তোরাঁর একটা নিরিবিলি কেবিনে।

কৃষ্ণা নিঃশব্দে বসে আছে।

প্যাটেল বলে, সৈনিকের কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মাঝে রোমান্সের ঠাঁই নেই। কাজেই থিরেশাব অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। তাকে নিয়ে প্লেনে বেড়ানোর সুযোগ সুবিধা ঘটল না। অথচ প্রতিদিন সে আসে আমারই কাছে। উন্মুখ হয়ে থাকে আমারই প্রতীক্ষায়। অন্য কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। আমার চেয়ে বেশি টাকার লোভ দেখালেও না।

যেদিন ঝাঁক ঝাঁক বোমারু বিমান নিয়ে আমরা বিমান আক্রমণের জন্য যাত্রা করি থিরেশা কেঁদে আকুল হয়। তারপর কী সে উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেগ আর রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। যদি না ফিরি—

প্যাটেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামল। ঘরের মাঝে স্তব্ধতা চমকালো যেন বিদ্যুৎ শিখার মতো।

প্যাটেল বললে, এমনি মেলামেশার অবশ্যম্ভাবী বিপদ ঘটল। একদিন থিরেশা খোলাখুলি ঘোষণা করল, নিজের ভালোবাসা। সে আমার জন্য উন্মাদ।

সে বললে, তার নিজের কথাটাই বলি—গড্ মেড্ দি সী বাট্ ম্যান্ মেড্ দি ল্যাণ্ড।

আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। তাকে বুঝিয়ে বললুম, আমি তো প্রতি মুহূর্ত

মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। কখন যে হাতছানি দিয়ে ডাকবে, কে জানে।

ভয়ার্ত থিরেশা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, সাধ্যি কী? আমার প্রেম তোমায় ফিরিয়ে আনবে।

আমি বললুম, তা ছাড়া কালই হয়ত আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি। হুকুম এলে আর এক মুহূর্ত থাকতে পারব না।

তার চোখদুটি ছলছলিয়ে এল। সে আকুল হয়ে বলে উঠ্‌ল, আমি অত ভাবতে পারি না। ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাব। ভাববার অবসর দিয়ে তো ভালোবাসা আসে না।

থিরেশা আমার বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে।

একমাসও কাটল না। হুকুম এল আমাকে এক হপ্তার মধ্যে প্যাসিফিক্ দ্বীপে যেতে হবে। খবর শুনে থিরেশা ভেঙে পড়ল। এবং যে সংবাদ সে আমায় কর্ণগোচর করলে, আমি চোখে অন্ধকার দেখলুম। আমার শরীরের প্রান্তগুলো হিম হয়ে এল।

কৃষ্ণা সমগ্র চেতনা দিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্যাটেলের মুখের পানে তাকাল।

প্যাটেল বললে, যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। থিরেশার গর্ভে আমার সন্তান এসেছে।

ঘরের মাঝে যেন বাজ পড়ল। কৃষ্ণা মাথা নীচু করে মুখ ঝুলিয়ে দিয়েছে। আতঙ্কে কি লজ্জায় বলা শক্ত।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ গর্জন করছে। বর্ষণ চলেছে। প্যাটেলের মনের আকাশেও বুঝি বিস্মৃতির অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। থিরেশা—বিদ্যুৎময়ী থিরেশা।

কৃষ্ণার মনে হল থিরেশা তাদের মাঝে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টির জলে ভিজে, হাওয়ায় ভেসে এসেছে। তার কাঁধের উপর হিমশীতল একখানা হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কে তার সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। কার উপস্থিতি যেন পাথরের ভারের মতো তার বুকের উপর চেপে বসল।

একটা ঝাঁকানি দিয়ে মাথা উঁচু করে প্যাটেল বললে, মনকে শক্ত করলুম। সৈনিকের জীবনে ও সমস্ত দুর্বলতার কোন অর্থ হয় না। যা অনিবার্য, যা

অবশ্যম্ভাবী তার গতিরোধ করবে কে? অপরাধ কী আমার একার? এর পরিণতি বোঝবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল থিরেশার। বহু যুদ্ধশিশুর তো জন্ম হচ্ছে। তার জন্যে দায়ি কে? মাঝের ক'টা দিন কাটাতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

একদিন সে আমায় বললে, তুমি আমায় বিয়ে কর। ইহজীবনে হয়ত আমাদের আর দেখা হবে না। শুধু আমার সন্তানকে তোমার পিতৃত্বের পরিচয় দিয়ে যাও। আর আমি কিছু চাইব না।

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম, সে অধিকারও আমার নেই। কারণ আমি বিবাহিত।

মনে হল, সে আমায় বুঝলে। আর কোন কথা তুললে না সে।

থিরেশার শখ মেটাবার জন্যে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে প্লেনে উড়লুম। তার আনন্দ ধরে না। একরাশ ফুল নিয়ে সে আমার পাশে এসে বসল। দুধের ফেনার মতো সাদা ধপধপে সিল্কের পোশাক তার গায়ে। ঠিক বিয়ের কনের মতো। চমৎকার তাকে মানিয়েছিল। কালো ড্যাবডেবে চোখে অপূর্ব চাউনি। মুখ তুলে চেয়ে সে আমার কাছ ঘেঁষে বসল।

আকাশে চাঁদ ছিল। জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে আমরা ভেসে চললুম।'

আমরা উঠছি। উঁচুতে উঠছি। জ্যোৎস্নার তরঙ্গ ঠেলে চাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছি। থিরেশা কখনো ওপরে চাঁদের পানে, কখনো নিচের দিকে সোৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে। নিচেব কিছু দেখা যায় না। আবছা ঘোলাটে হয়ে গেছে। শুধু মেঘের স্তর।

থিরেশা অনেকক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় উঠছ?

কৌতুক করে বললুম, চাঁদের দেশে। কেন ভয় করছে?

তার মুখে ফুটে উঠল হাসির মৃদুরেখা। বললে, তোমার কাছে আমার কোন ভয় নেই। আমায় নিয়ে চলো। নিয়ে চলো। আর ফিরিয়ে দিয়ে এসো না।

কিছুক্ষণ পরে আমি বললুম, নিচে চেয়ে দেখো থিরেশা। কী বল তো?

অনেকক্ষণ চেয়ে দেখে সে বললে, কী? সমুদ্দুর?

আমি হাসলুম। হাঁ। সমুদ্দুর। আমরা অনন্ত অতল সমুদ্রের উপর মহাশূন্যে ভাসছি। উপরে অনন্ত নীল আকাশ। নীচে জ্যোৎস্নাপ্লুত নীল মহাসমুদ্র। মাঝের জ্যোৎস্না সায়রে আমরা ভেসে চলেছি।

—হাউ স্পেলণ্ডিড! হাউ নাইস! সে চুপ করে নিচের পানে চেয়ে বসে রইল।

—আরো নামব থিরেশা? সমুদ্রের তরঙ্গ দেখবে?

সে হঠাৎ আমার গায়ে গা রেখে কম্পিত গলায় বললে, নামবে? কোথায় সমুদ্রের তলে?

আমার প্লেন বাজপাখির মতো ছোঁ মারার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে নীচে নামছে। শাঁ শাঁ করে ক্ষিপ্রগতিতে। থিরেশা আমার গায়ে হেলে পড়ে কাঁপছে। সে চোখ বুজেছে।

—ভয় করছে থিরেশা?

—না, না। খুব নিচুতে নেমেছ না? সমুদ্রের তলায়? তাই এত অন্ধকার।

আমি ধমকের স্বরে বললুম, কোথায় অন্ধকার? চেয়ে দেখ। আমাদের পায়ের নিচে অধীর সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গ। কল্লোল শুনতে পাচ্ছ না?

থিরেশা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে চাইল। নিচে এ কী বিরাট মহান্ রূপ। রক্তাক্ত ধরণীকে, মানুষের নৃশংসতার সব চিহ্নকে যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে এই মহাসমুদ্র। পৃথিবীর অবশেষ নেই। যা আছে তা এই অকূল বারিধি আর এই মহাশূন্য।

—এইবার আমরা ফিরে যাই চলো।

চমকে উঠল থিরেশা।

—কেন? ফিরবে কেন? ফিরব বলে তো আসিনি।

থিরেশা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলে, তোমায় বুঝি ফিরতেই হবে?

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

থিরেশা হঠাৎ আর্তস্বরে বলে উঠল, না, না। আমি ফিরব না। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেও না।

সে আমাকে গভীর আবেগে চুম্বন করে যেন নেতিয়ে পড়ল।

...হূহু-চ্ছ্বাসে বায়ুস্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে প্লেন উড়ে চলেছে দুর্জয় বিক্রমে।

গতির প্রাবল্যে আমার দেহের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ চেয়ে দেখি জানলা গলে থিরেশা শূন্যে ভেসে যাচ্ছে।

কৃষ্ণা চাপা আর্তনাদ করে উঠল।

প্যাটেল বললে, দূর হতে চেয়ে দেখলুম এক টুকরো সাদা কাগজের মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে অভাগিনী মেয়েটা সমুদ্রজলে মিশে গেল।

॥ একাকার ॥

মেলা | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনও পর্ব উপলক্ষে নয়, কোন্ এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহা-প্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ।

দোকানীরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা, দোকানের জিনিসও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাকের পয়সাও না।

সিউড়ীর ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগারশো টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মত মন্দা বাজারেও তাহার দুশো টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ীর দোকানের পাশেই লাভপুরের দুখানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের অপরখানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মনিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে। প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোশের

উপর প্লাটাস্তলের সিঁড়ি। তত্র একখানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফি যেন পাথরের জালি; মন্দির দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেতপাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই ডালায় মুড়িমুড়কী চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই-দশটা যাত্রী এদিকে যাওয়া আসা করিতেছিল। তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা-কিছু কাল থেকেই শুরু হবে, কি বল সিং?

রামদাস কহিল—সন্ধ্যে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জম্‌জমাট—দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশো চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুর। মেয়েগুলো দেখতে শুনতে ভাল হে। চটক আছে।

সিংও সায় দিল—হ্যাঁ, গোটা বিশ পঁচিশেক এরই মধ্যে বেশ। চার-পাঁচটা খুবই খপ্‌সুরৎ।

ঘনশ্যাম ঘাড নাড়িয়া কহিল—কম্‌লি আর পটুলি বলে যে দুজন আছে, বুঝেছ। ফেশান কি তাদের। টেরীবাগানো ছোকরাদের ভিড লেগে গেছে এরই মধ্যে। কি চাই গো তোমাদের?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে শুরু করিল।

সিং কহিল—ডাইস্‌ কত টাকায় ডাক হল জানো?

অন্যমনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—এঁ্যা? ডাইস্‌? দেড হাজার।

—কে ডাকলে?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ-এগার বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পিছনে একটি ছয়-সাত বছরের ফুট ফুটে মেয়ে। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কি?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলান নাগরদোলায় মেম-পুতুল তখনও দমের জোরে বন্‌বন্‌ শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া

দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এসো খুকী, এসো। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর্-ফর্ শব্দে ঘোরে, এরোপ্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা?

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কত দাম?

—কিসের? পুতুল না এরোপ্লেনের?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল। বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল—কোন্‌টা নেবেন বলুন?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কি ভাবিয়া লইল। পর মুহূর্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—আয় মণি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল—এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দুজনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নীর মত দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল—না মানিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্‌গুবাগুব্, খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—'রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হল না।'

পিছনে পিছনে—একদল সংকীর্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

ময়রারা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দু পাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসার লোভে সংকীর্তনের

পিছনে পিছনে ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী।

সংকীর্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল—না বাপু, আমাদের কাছে ছুটি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল—দেখ দেখ কড়াই দেখ। বড় বড় কড়াই আছে। আঃ যাও না ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন?

পিছনে তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল—এস ভাই দাদা চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং-এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল—চেখে দেখুন আগে, ভাল না হয় দাম দেবেন না আপনি!

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল—খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা খাবে না দাদা?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কি বলেন? বাসি? ফল কি কখনও বাসি হয় আজ্ঞে?

ছোকরাটা কহিল—চাখ্‌না মিষ্টির দাম দিয়ে যান মশায়। আপনি খারাপ বললেই খারাপ হবে নাকি?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকাবাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বললেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম, বাড়ি বলতে যেও না। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে তো। খবরদার।

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে · লাগিয়ে দিই।

জুতার পটির পথের দুপাশে মুচীর সারি বসিয়াছিল। অমরের জুতাটির অবস্থা দেখিয়া একজন ওই কথা বলিল।

অমর কথা কহিল না। গোড়ালী-ছাড়া জুতাটায় সত্য সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল কিন্তু সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সাহস হইতেছিল না। সে মণির হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছিল। মুচীর দল কিন্তু নাছোড়বান্দা।

অমর যত আগাইয়া চলে দুপাশ হইতে তত অনুরোধ আসে—আসুন না বাবু ? দিন না বাবু ! একদম নতুন বানিয়ে দেব বাবু।

মণি কহিল—কেন বাপু তোমরা বলছ ? আমাদের পয়সা নাই—না, আমরা যে বাড়ি থেকে—

অর্ধপথে মণি নীরব হইয়া গেল। দাদার কথাটা তাহার মনে পড়িল।

মুচীটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, হিলটা আমি ঠুকে দিই। পয়সা লাগবে না আপনার।

অমরের মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মণির গালে বসাইয়া দিল। মণি কাঁদিয়া উঠিল। মুচীটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মণিকে ধরিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইয়া কহিল—না না বাপু ছুঁয়ো না তুমি অবেলায় চান করতে পারব না।

হঠাৎ চড়টা মারিয়া অমর লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল না। বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আয় আয় মণি, চলে আয়।

মণি ক্রোধভরে কহিল—যাবে তাই ? কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে বলে দোব সেই কথা।

অমর এবার আগাইয়া আসিয়া মণির হাত ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। এস, আবার বাড়ি যেতে হবে।

—মারলে কেন তুমি ?

ওদিকে কোথায় ডুম ডুম শব্দে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। অমর তাড়াতাড়ি মণিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আয়, আয় বাজী দেখি গে আয়।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া কহিল—মখ্মলের চটি কেমন দেখ দাদা।

অমর কহিল—আয় আয়। ওর চেয়েও ভাল চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল—আর বছরে তো তুমি কলকাতায় পড়তে যাবে। আমাকে এনে দেবে, নয় দাদা ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ দোব।

অমর সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড় যেন ক্রমশ বাড়িতেছিল।

বড় বড় দোকানগুলির সম্মুখে পথের উপর ছোট ছোট দোকান বসিয়াছে। তাহারা হাঁকিতেছিল—

—শাঁক আলু, পালং শীষ!

—পয়সা-বাণ্ডিল বিড়ি বাবু।

—লাঙলের কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল—লাঙলের কাঠ কত করে ভাই?

—দশ আনা, বারো আনা। খাঁটি বাব্‌লা কাঠ।

লাঙলের দোকানের পাশেই ছোট একটি কাঁচের কেসে কেমিকেলের গয়না লইয়া একজন বসিয়াছিল। সে কয়জন নিম্ন শ্রেণীর দর্শককে ডাকিয়া কহিল—তিন পাথরের আংটি একটি করে নিয়ে যেতে হবে যে দাদা! বেশী নয় চার পয়সা করে।

লোক কয়জন চলিয়া গেল না। তাহারা আংটি দেখিতেই বসিল। দোকানদার বলিল—বসো দাদা, বসো।

লাঠির মাথায় কার, ফিতা, গেঁজে ঝুলাইয়া একটি লোক পথে হাঁকিয়া চলিয়াছিল—চার হাত কার দু'পয়সা, বড় বড় কার দু'পয়সা, রকম রকম দু'পয়সা—জামাই-বাঁধা কার দু'পয়সা। টানলে পরে ছিঁড়বে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না……দু-দু পয়সা, দু-দু পয়সা।

পটিটার মোড় ফিরিতেই নিবিড় জনতার স্রোত কলরোল করিতেছিল। অমর ও মণি সেই জনতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জনতার গতিবেগ দুইদিকে চলিয়াছিল। একদিকে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। সারিবন্দী তাঁবুগুলো দেখা যাইতেছিল। অমর মণির হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি বাজীর ঘর সব। মণি আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

কহিল—কই দাদা?

আরও পিছনের দিকে চলিয়াছিল জনতার আর একটা প্রবাহ। সন্ধ্যার আলো তখন জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। এই জনতা-প্রবাহের লক্ষ্যস্থানে সমচতুষ্কোণ করিয়া বড় চারিটি ডে-লাইট জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক কয়টির চারিপাশে সমচতুষ্কোণ করিয়া ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি, বেষ্টনীর

মধ্যের অঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য হইয়া আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইয়া অঙ্গনে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানটায় প্রবেশ করিতেই নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষের বুকটা কেমন করিয়া উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট, সস্তা এসেন্সের তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যে জনতার স্রোত আগের মানুষের ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া নিবিড়ভাবে ওই ঘরগুলির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙ্গালী, খোট্টা, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহার মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকার হইয়া গেছে।

এইটাই আনন্দ-বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটী।

প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক-একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহাদের লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্ততঃ পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতার মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

এইখানে তারপর ওই দরজায়, আবার আর একটা দরজায় মোট কথা বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালের চীৎকার, আস্ফালনে আকাশের বুকের নিস্পন্দ অন্ধকার পর্যন্ত যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল জুয়ার আড্ডায় উন্মত্ত উল্লাসরোল। অঙ্গনটির ঠিক মধ্যস্থলে আলোটির নীচে জুয়াখেলা চলিতেছে। কোন্ ঘরে নারীকণ্ঠে অশ্লীল গান আরম্ভ হইয়া গেছে। বাহিরের জনতা সে অশ্লীল গান শুনিয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মানুষের বুকের ভিতরকার পশুত্ব ও বর্বরতা পঙ্কিল জলস্রোতের ঘূর্ণীর মত মুহুর্মুহু পঙ্কিলতর হইয়া এখানে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

ওদিকে কোথায় শব্দ হইল—ওয়াক—ওয়াক!

একটি মেয়ে বমি করিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইয়াই দর্শকের দল কৌতুক দেখিতেছিল আর দেখিতেছিল অসম্বৃত-বাসা নারীর দেহ।

বমির উপর বসিয়াই মেয়েটা গান ধরিয়া দিল—

'মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব!'

জনতা হাসিয়া উঠিল—হো-হো-হো।

একজন পানওয়ালা হাঁকিতেছিল—মনমোহিনী খিলি বাবু, মনমোহিনী খিলি। যে যে-বয়সে খাবে সে সেই বয়সে থাকবে।

প্রজাপতির মত সুবেশা একটি সুশ্রী মেয়ে অঙ্গন দিয়া যাইতে যাইতে গান ধরিয়া দিল—'পান খেয়ে যাও হে বঁধু—'

একজন দর্শক সঙ্গীকে বলিল—দেখেছিস্?

অপরজন কহিল—এর চেয়ে ভাল আছে। তার নাম কম্‌লি। ফড়িং বললে আমায়।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল—কি নাম তোমার?

মেয়েটি বলিল—চেহারা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলরাণী। বলিয়া হেলিতে দুলিতে আপন ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

—শোন শোন। দক্ষিণে—

—সিকি আধুলিতে কমল-মালা গলায় পরা হয় না নাগর। গোটা গোটা।

একজন কহিল—মদ খাবে তো'

—খাওয়ায় কে? বলি বকে বকে মুখ তেত হয়ে গেল। পান খাওয়াও দেখি নাগর!—

একটা ঘরের সম্মুখে কলরোল উঠিয়াছিল।

কোন বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কম্‌লি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইযাছে। পুরুষটি মত্তকণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালবাসবি না তুই। তোর নামে আমি নালিশ করব। ডিফামেশন সুট!

মেয়েটি কহিল—যা যা যাঃ আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্নেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার

তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকে আমি জেলে দেব। ব্যারিষ্টার আনব আমি। কই যা দেখি তুই সন্নেসী হয়ে!

বাজীর ওখানে আসিয়াই মণি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখ দাদা, ওই দেখ।

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজী-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক-লম্বা মুখোস পরিয়া নাচিতেছে। পরনের পোশাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে এক জোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মণি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল—ভূত, দাদা ভূত। ঐ দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটায় কতকগুলো বড় বড় চামচিকার মত ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজী।"

অমর চুপি চুপি মণিকে কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা, দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সব চেয়ে ভাল বাজীটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রং-এর তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চীৎকার করিতেছে—এই ফুরিয়ে গেল। চলে এসো ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজীতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান…।' তারপর কি অমর তাহা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না—কি, ইউ ডাবল্ জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে শুরু করিয়াছে।

—ও দাদা, ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মত দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার ফোকলা মুখের সম্মুখে দুটি নড়বড়ে

দাঁত। নারদ মুনি সাহেবের পোশাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল—চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল। 'কাটা মুণ্ডু অফ বোম্বাই।' এক পাশে একটা কবন্ধ, ওপাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ডু অফ বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া ওই ব্যাণ্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরাজী বাজনা বাজছে। আয়, আয়। ওদিকে বড় বড় বাজী আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছিল। নিবিড় জনতার মধ্যে শিশু দুটি চলিতেছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্ধমগ্ন কুটার মত। বাজীর তাঁবুর সম্মুখে একটি পরিসর জায়গায় তাহারা আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিং-এর খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল—চলো, চলো, দো-দো পয়সা। দো-দো পয়সা।

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড় ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল—বাবু লো-ক।

—হাঁ—হাঁ। ছোট ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচেন কি?

—কি ভাবছেন মশা? ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোট ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোট ক্লাউন কহিল—যান ভিতরে যান। দেখুন খেলা শুরু হোয়ে গেল যে!

তাঁবুর সম্মুখের পর্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রং-চঙে স্টেজ দেখা গেল। দর্শক দল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমর আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

স্টেজের উপর তখন নর্তকী-বেশী দুটি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল—হরেক রকম, রকম রকম দেখবেন। ভিতর যান ভিতর যান।

ক'জন ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দুটি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার ক'জন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল—সরে যাও, হাতী—হাতী!

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা দোলাইয়া জমিদারের হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল—কাপড় ছাড় না হে ছোকরা।

অমর সবিস্ময়ে দেখিল—অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারি পাশে চাহিল। কিন্তু কোথায় মণি?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁস হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারি পাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝক্‌মক্ করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল। মণি! কোথায় মণি!

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় যে আসিয়া পড়িল কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচ গান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।

অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে দু'টাকা, দু'টাকায় চার টাকা!

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল—খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ? অমর দেখিল আঠারো-উনিশ বছরের একটি খদ্দর পরা ছেলে, মাথায় গান্ধী টুপী।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল—কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুনে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধর খোকা ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, দু'ঘুঁটিতে চার গুণ, তিনঘুঁটিতে ছ'গুণ পাবে, ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এসো আমার সঙ্গে এসো। কি, হয়েছে কি তোমার? পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল—চোরি নেহি, ডাকাতি নেহি। নসীব্‌কে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা। ধর ভাই ধর।

ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল—কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ি কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে।

সচকিত ভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড় সে? তোমার চেয়ে ছোট না বড়?

—আমার চেয়ে ছোট। ছ' বছর বয়েস তার।

—গায়ে তার গয়না-টয়না আছে না কি?

—হাতে দুগাছা বালা আছে শুধু।

—কি নাম তার?

—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনি বাঁধা আছে!

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কল-কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্তা দুই-চারিটা শুধু স্পষ্ট ভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়। তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায় সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিয়া চলিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বাজীকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল তাহার দাদা নাই। মণির বড় কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভারি ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই। থাক্ সে বাহিরে দাঁড়াইয়া! পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা—দাদা দেখিতে পাইবে না যে!

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল স্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের দুপায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। কুকুরে ডিগবাজী খায়, বাঁদরে ঘোড় চড়ে, টিয়াপাখীতে বন্দুক ছোড়ে। একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া স্টেজের উপর পর্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিল, দাদা তো নাই। কয়েক মুহূর্ত মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারি দুষ্টু তাহার দাদাটা।

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে।

পথে একটা দোকানে দোকানী হাঁকিতেছিল—চলে এসো ভাই, চলে এসো। কাবাব রুটি। গোস্ পরেটা। চিংড়ী কাঁকড়া—এই এই, ভিড় ছাড়ো, ভিড় ছাড়ো।

ভিড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল, এই বড়ো বাঘ।

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল—দাদা।

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল—এই সরো'ই বটে রে বাবা—গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে।

জনতা দুই পাশে বিভক্ত হইয়া জমাটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের মধ্যে যে কেমন করিয়া কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে

হাঁক ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দোকানের পর্দায় ঢাকা আলোকোজ্জল মেলাটা বিপুল কলরবে গম্ গম্ করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াসার মত জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মত হুইসিল বাঁশী বাজাইতেছে। মণি চীৎকার করিয়া উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইক' ঘরে, দাদা গেছে বৌ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাহাকে গালি দিল—মর, মর, মর তুমি। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকার পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। ওপাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল। রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল—কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে সে আবার বলিল—চোর, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহিরে আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশালাই জ্বালিয়া সে মণির মুখের সম্মুখে ধরিল, মণির ফুট্‌ফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখচোখ কোমল হইয়া আসিল। মণিরও ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড় সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন খুকী?

তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি? তুমি কেঁদ না। সকালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—রাত হয়ে গেছে যে।

—হোক্ না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে করিয়া মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ওদিকের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কে ডাকিতেছিল—কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরের লোক কই গো।

মণিকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল—বসো তো মা একবার।

তারপর রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল—কি? চেঁচাচ্ছ কেন?

কে এ জন কহিল—পুজো করব বলে।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেয়েটি দুয়ার টানিয়া দিল।

বাহির হইতে আবার কে কহিল—শুনচ। কমল।

কমল কহিল—অনেক নরকের দোর তো খোলা রয়েছে, যাও না। আমি পারব না।

—একবার শোনই না।

কম্‌লি কহিল—বেশী উপদ্রব করলে পুলিস ডাকব আমি।

মণি আবার ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল।

কম্‌লি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—কেঁদ না খুকী, কেঁদ না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম তো খুকী নয়, আমার নাম মণি—

—মণি। তা হ্যাঁ মা মণি, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

—হ্যাঁ।

ঘরের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরী-মিষ্টি বাহির করিয়া কমল মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি বলে ডাকব?

কম্‌লি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমার ঘরে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল—তোমায় আমি মাসী বলব, কেমন?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসী মা—মাসী মা—।

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসীমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়ো দাদুর কথা, ছোট বোনটির কথা পর্যন্ত বলিতে সে বাকী রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্ট দোকানীটার কথা পর্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগর-দোলা, পুতুল দুটি কত ভাল তাহাও সে বলিল। মখ্‌মলের চটিও কেমন তাও অপ্রকাশ রহিল না।

কম্‌লি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল—তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকত মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদ না যেন, বেশ!

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ড রূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কম্‌লি ফিরিয়া আসিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—মণি।

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল—উঁ।

কম্‌লি আঁচল হইতে কতকগুলা জিনিস বাহির করিয়া দিল। মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্তগুলো কাছে টানিয়া লইল। এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই! নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভাল। মখমলের চটিটা নতুন ধরনের।

কমল জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে মণি?

মণি ঘাড় নাড়িল। কমল সাগ্রহে কহিল— একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কম্‌লি কহিল—তোমার মা ভাল, না আমি ভাল?

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল—মাও ভাল, তুমিও ভাল।

কম্‌লি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী। মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল তুমি শোও।

হাসিয়া কম্‌লি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কম্‌লি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল—কমলি!

কম্‌লি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কম্‌লি কহিল—মাসী!

আগন্তুক মেয়েটি কহিল—হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস্ যে? কি হয়েছে তোর? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বললে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুনতে হবে।

কম্‌লি কোন উত্তর দিবার পূর্বেই আবার সে কহিল—ও কে লো? কার মেয়ে?

কম্‌লির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি? কোথায় পেলি?

—ঘরের পেছনে।

—কেউ জানে?

বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কম্‌লি জবাব দিল—না।

—বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভাল করে আগড়টা সরিয়ে দে।

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কম্‌লি আগড়টা আটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী ইঙ্গিতে যে কথার আভাস দিয়া গেল সে কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই একটা উচ্চ, জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজী, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গিয়াছে।

কম্‌লি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কম্‌লি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর এক মুহূর্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেলনাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

॥ গল্প সঞ্চয়ন ॥

দন্ত কৌমুদী | বনফুল

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ্ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ আমি ডাক্তার, রোগিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকসন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে

কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছর খানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তারপর বলিল, কলকাতাই চলে যাই তাহলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলিনি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড় ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটাতে?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল, ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

শ্রীচরণেষু,

শত সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি ভালো আছেন। আশা করি এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার, অন্তত সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। আমার যে কয়খানা গহনা ছিল তাহা বেচিয়া সোনা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লইলাম। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই কোন পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

সেবিকা

চাহনি

॥ অনুগামিনী ॥

পতিতার পত্র | শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুলোচনার নাম ভদ্রসমাজে পরিচিত হইবার কথা নয়। তবে ভদ্রসমাজে থাকিয়াও যাঁহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সন্দেহজনক গলিঘুঁজিতে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহার নাম জানেন। আর জানি আমি।

আমি ডাক্তার, সুলোচনার মৃত্যুকালে তাহার চিকিৎসক ছিলাম। কঠিন ব্যাধিতে কয়েক মাস ভুগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার বয়স আটত্রিশ কি উনচল্লিশ হইয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি পুরু খাম আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'ডাক্তারবাবু আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, আর বড় জোর দু চার দিন। এটা রাখুন, আমার মৃত্যুর পর খুলে পড়বেন।'

খামের মধ্যে একটি উইল ও একটি দীর্ঘ চিঠি ছিল। উইলে সুলোচনা আমাকে তাহার যথাসর্বস্ব, আন্দাজ ত্রিশ হাজার টাকা নিঃশর্তে দান করিয়াছে। চিঠিখানা তাহার আত্মকথা। এদেশে পতিতার আত্মকথা জাতীয় সে-সব লেখা বাহির হইয়াছে ইহা সে ধরনের নয়। মানুষের জীবনধারা কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয় এই কাহিনী তাহারই একটি উদাহরণ। নোংরামিও ইহাতে কিছু নাই। তাই নির্ভয়ে ছাপিতে দিলাম।

ডাক্তারবাবু,

জীবনে আমি অনেক পুরুষের সংসর্গে এসেছি। সবাই মন্দ লোক নয়, অনেকে দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ। দু-একজন সত্যিকার সজ্জন ব্যক্তিও দেখেছি। আপনি ডাক্তার, এতে আশ্চর্য হবেন না। কোনও মানুষই নিখুঁত নয়, সত্যিকার সাধু-সজ্জন ব্যক্তিরও দোষ-দুর্বলতা থাকে।

আপনি যেদিন প্রথম আমার চিকিৎসা করতে আসেন, সেদিন আপনাকে দেখে আশ্চর্য হযে গিযেছিলুম। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি কঠিন ব্যবহার। আপনি কী করে এতবড ডাক্তার হলেন ভেবে অবাক হলুম। এখন জানি, আপনার কঠিনতার আডালে একটি করুণ সদয হৃদয় আছে, আর আছে রোগ সারাবার অসামান্য ক্ষমতা। আমার রোগ আপনি সারাতে পারেননি, সে দোষ আপনার নয। প্রথম দিন আমাকে পরীক্ষা করে আপনার মুখে যে-ভাব ফুটে উঠেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম এ রোগ সারবার নয। আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি, বলেছিলেন, 'যন্ত্রণার উপশম করতে পারি। তার বেশী কিছু হবে না।'

আপনার কথা মেনে নিযেছিলুম। আপনি অন্য ডাক্তারকে দেখাতে বলেছিলেন আমি দেখাইনি। কেন দেখাইনি জানেন? আপনার স্পষ্টবাদিতা ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলুম যদি মরতেই হয় আপনার হাতেই মরব। আপনাকে ভাল লাগার আর একটা কারণ, আপনাকে দেখে আর একজনকে মনে পডে গিযেছিল, যিনি ছিলেন আপনার মতই কঠিন আর কঠোর। তাঁর হাতে একবার মরেছি, এবার শেষ মরা আপনার হাতে মরব।

আমার ঘরের দেযালে পাশাপাশি দুটি ছবি টাঙানো আছে। দুটি যুবাপুরুষ। বিশ বছর আগে ওঁরা যুবাপুরুষই ছিলেন, একজনের মুখ ফুলের মত নরম, অন্যজনের মুখ পাথরের মত শক্ত। অপরিচিত নগণ্য মানুষ নয়, দেশ-জোড়া ওঁদের নাম। দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব; স্বাধীনতার যুদ্ধে পাশাপাশি দাঁডিয়ে ওঁরা লডেছিলেন।

যেদিন প্রথম আপনার দৃষ্টি ওই ছবি দুটির ওপর পডল সেদিন আপনি ভুরু তুলে আমার পানে চেযেছিলেন। আপনার ভুরুতোলা প্রশ্নের জবাব তখন দিইনি। আজ এই চিঠিতে জবাব দিচ্ছি। চিঠি পডলেই বুঝতে পারবেন আমার এই পাপজীবনের সঙ্গে ওই দুটি মহাপ্রাণ দেশনেতার কী সম্বন্ধ।

মরবার আগে আমি আমার জীবনের কাহিনী একজন কাউকে শুনিয়ে

যেতে চাই। অন্য কাউকে শোনাতে গেলে সে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে, হয়তো ওঁদের দুজনের নামে মিথ্যে রটনা করবে। কিন্তু আপনি তা করবেন না, আপনি বুঝবেন। ওই বোঝাটুকুই আমার দরকার।

আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়। বাবা ছিলেন বাংলা দেশের পশ্চিম সীমানায় এক শহরের উকিল। শুধু উকিল নয়, একজন স্থানীয় জননায়ক। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। ওকালতি করার সময় পেতেন না, তাই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সুনাম ছিল দেশ-জোড়া। বাবা অনেক দিন হল মারা গেছেন, কিন্তু জেলার লোক তাঁর নাম এখনও ভোলেনি।

আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলেজে পড়িনি। বাড়িতে সৎমা ছিলেন। তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না বলেই বোধ হয় আমার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। বাবা আমাকে স্নেহ করতেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, তিনি সর্বদা রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকতেন।

ষোল বছর বয়সে আমার বিয়ে হল। সৎমা পাত্র যোগাড় করেছিলেন। বাবা একটু খুঁতখুঁত করলেন; কিন্তু নিজে ভাল পাত্র খুঁজে বার করার সময় নেই তাঁর। তিনি খুঁত-খুঁত করতে করতে রাজী হয়ে গেলেন।

বিয়ের মাস তিন-চার পরে স্বামী মারা গেলেন। তাঁর চালচুলো ছিল না, ছিল গুপ্ত ক্যান্সার রোগ; বিয়ের পর ধরা পড়ল। সৎমা নিশ্চয় রোগের কথা জানতেন না, জানলে যত আক্রোশই থাক, বিয়ে দিতেন না। আমাকে বিদেয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু চার মাস পরে বিধবা হয়ে আমি আবার বাপের বাড়ি ফিরে এলুম। সংসারের হাওয়া বিষিয়ে উঠল।

সংসারের বিষাক্ত হাওয়া থেকে পালাবার একটা রাস্তা ছিল আমার। রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে শহরে প্রায়ই সভা-সমিতি হত। ছেলেবেলা থেকেই আমি সভা-সমিতির অধিবেশনে গান গাইতুম। আমার গলা ভাল ছিল, সবাই প্রশংসা করতেন। বিধবা হবার পরও আমার সভায় গান গাওয়া বন্ধ হল না। থান পরে যেতুম, গান গাইতুম। বাবা বলতেন, 'দেশের কাজে নিজের দুঃখ ভুলে যাও।' তিনি নিজে আমার অকালবৈধব্যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই আমাকে এবং নিজেকে ভোলবার চেষ্টা করতেন।

আমার তখন ভরা যৌবন; যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সাধ মেটেনি।

বাবার উপদেশ আমার কানে যেত, কিন্তু মন পর্যন্ত পৌঁছুত না। রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক যুবাপুরুষ ছিলেন। তাঁদের দেখতাম, মনটা উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু আমি বিধবা, তাঁরা আমার পানে উৎসুক চোখে তাকালেও কেউ এগিয়ে আসতেন না।

এইভাবে বছর দেড়েক কাটল। তার পর দুজন যুবাপুরুষ এলেন আমাদের শহরে। তরুণ বয়স, কিন্তু দেশজোড়া নাম। দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাঁদের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শোনবার জন্যে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে; তাঁরা হাত পাতলে মেয়েরা হাজার হাজার টাকার গয়না গা থেকে খুলে দেয়। তাঁরা দুজন যেন জোড়ের পাখি, একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে কাজ করেন; অনেকবার একসঙ্গে জেল খেটেছেন। লোকে বলত, মাণিক-জোড়। কেউ বলত, রাম-লক্ষ্মণ। কেউ বলত, কানাই-বলাই।

আমি তাঁদের রাম-লক্ষ্মণ বলব। দুজনের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। রাম ছিলেন নরম সরম, নবজলধর, কান্তি, ভারি মিষ্টি চেহারা। আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন, টকটকে রঙ, লম্বা চওড়া কঠিন দেহ, মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য।

আমি দুজনকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। একথা সাধারণ লোক হয়ত বুঝবে না, কিন্তু আপনি বুঝবেন। আমার মনের কৌমার্য তখনও নষ্ট হয়নি, হৃদয় ভালবাসার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। তাই এরা দুজন যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন বাছ বিচার করতে পারলুম না, দুজনের পায়ের কাছেই আমার হৃদয়-মন ঢেলে দিলাম। যিনি আমাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নেবেন আমি তাঁরই।

সেবার আমাদের শহরে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। চার পাঁচ দিন ধরে অধিবেশন চলবে, দেশের গণ্যমান্য সব নেতাই এসেছেন। স্থানীয় দেশ-সেবকদের বাড়িতে নেতাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, কারুর বাড়িতে দুজন, কারুর বাড়িতে তিনজন। আমাদের বাড়িতে উঠেছেন রাম আর লক্ষ্মণ। বাইরের একটা ঘর ওদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছি। সারাক্ষণ তাঁদের সেবা করছি। আমার সংমা ছিলেন গোঁড়াপ্রকৃতির মানুষ, পর্দার আড়াল ছাড়েননি, স্বাধীনতা আন্দোলনেও বেশী সহানুভূতি ছিল না। তাই আমিই অষ্টপ্রহর অন্দর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করতুম। যতক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ বাড়িতে থাকতেন আমি তাঁদের

আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতুম। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা, স্নানের আয়োজন, মাথার তেল, আয়না, চিরুনি, বিছানা পাতা, বিছানা তোলা—সব আমি করতুম। শরীরে ক্লান্তি আসত না, মনে হত ধন্য হয়ে গেলুম।

রাম-লক্ষ্মণ কেবল আমার সেবা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। আমার সভায় যাবার অবকাশ ছিল না, তাই তাঁরা আমায় সভার গল্প করতেন। লক্ষ্মণ ভারি গম্ভীর মানুষ, তিনি বেশী কথা বলতেন না, কিন্তু রাম বলতেন। ভারি মজার কথা বলতেন তিনি, মনটা ছিল রঙ্গরসে ভরপুর। সভায় কে কত গরম বক্তৃতা দিলে, কার ওপর পুলিসের নজর বেশী, এই সব কথা বেশ রঙ চড়িয়ে বলতেন। আমার সঙ্গেও রঙ্গরসিকতা করতেন। বলতেন, সুলোচনা, তুমি আমাদের খাইয়ে দাইয়ে যে-রকম তাজা করে রেখেছ তোমাকেই আগে পুলিসে ধরবে, ক্যাক করে ধরে হাজতে পুরবে।

লক্ষ্মণ ঠাট্টা-তামাসা করতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ম চোখ দুটি সর্বদা আমাকে লক্ষ্য করত, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করত। আমার বুক গুরগুর করতে থাকত। কাকে যে বেশী ভাল লাগে, বুঝে উঠতে পারতুম না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা রাম হঠাৎ সভা থেকে ফিরে এলেন। আমি তখন ওদের ঘরেই ছিলাম, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা করছিলুম; তাঁকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি ক্লান্তভাবে বিছানায় বসে বললেন, 'সুলোচনা, আজ ঝাড়া দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারবে?'

আমি ছুটে গিয়ে চা তৈরি করে আনলুম। তিনি শুয়ে পড়েছিলেন, উঠে চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এক চুমুকে চা খেয়ে করুণ চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনের সদর-মহলে পঁয়ত্রিশটা বছর গেল। অন্দর-মহলের খবর নেওয়া হল না।'

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তিনি আবার বললেন, 'অন্দর-মহলে যে এর মিষ্টি জিনিস আছে তা আগে জানলে হয়ত সদর-মহলে আসাই হত না।

এই সময় আমার সৎমা দরজার বাইরে থেকে খাটো গলায় ডাকলেন, 'সুলোচনা, এদিকে শুনে যাও।'

বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কোনও রকমে ঘরের বাইরে এলুম। সৎমা আমাকে আমার শোবার ঘরে

নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন, 'ভুলে যেও না তুমি বিধবা।'

এইটুকু বলে তিনি চলে গেলেন ; আমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম আমি বিধবা।

শুয়ে শুয়ে মন বিদ্রোহ করল। বিধবা তো কী? আমার রূপ, আমার যৌবন, আমার ভালবাসা, কিছুই মূল্য নেই এ সবের? আমি কি কাগজের ফুল, চীনে মাটির পুতুল? না, আমি চীনেমাটির পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা চাই, সম্ভ্রম চাই—

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়াল করিনি। সৎমার গলা শুনতে পেলাম—'বিছানায় শুয়ে থাকলে সংসার চলে না। তোমার বাপ সভা থেকে ফিরে এসেছেন, আরও সবাই এসেছেন। তাঁদের চা-জলখাবার দিতে হবে।'

বাইরের ঘরে আট-দশ জন দেশনেতা জমা হয়েছেন। বেশীর ভাগই প্রবীণ, রাম লক্ষ্মণও আছেন। রাজনীতির তীব্র আলোচনা হচ্ছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সকলকে চা-জলখাবার দিলুম। আমাকে কেউ লক্ষ্য করলেন না, এমন কি রামও না। কেবল লক্ষ্মণের ধারাল চোখ দুটি আমাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগল।

অনেক রাত্রে বৈঠক ভাঙল। সে-রাত্রে আমি কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ভাল ঘুম হল না। আমার জীবনে যেন একটা প্রবল বন্যা আসছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিছু জানি না। ভয় ভয় করছে, আবার উত্তেজনায় মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠছে। রাম আর লক্ষ্মণ দুজনেই কি আমাকে চান? বুঝতে পারছি না। আমি ওঁদের মধ্যে কাকে চাই? তাও বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে ওরা সভায় চলে গেলেন। সভার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আজ আর কাল দু দিনবাকী। তার পর সবাই চলে যাবেন। আর আমি—?

দুপুরবেলা রাম ফিরে এলেন। আমাকে দেখে ক্লান্ত হেসে বললেন, 'আজ আর কোনও কাজ হল না, শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি। বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।'

তিনি নিজেই বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে রইলেন। আমি কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'চা আনব?'

তিনি চোখ খুলে একটু হাসলেন: 'না, দরকার নেই। তুমি বরং আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।'

ডাক্তারবাবু, মানুষের দেহ-মনের সব খবরই আপনি জানেন, তাই আমার তখনকার দেহ-মনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে আপনার ধৈর্যের উপর জুলুম করব না। পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ সম্বন্ধে হিন্দু মেয়ের মনে তীক্ষ্নসচেতনতা আছে আপনি জানেন। আমি খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। ঘন কোঁকড়া চুল, সিঁথি নেই, কেবল কপাল থেকে পিছন দিকে ব্রুশ করা।

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার পানে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে কতকটা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'আমাদের সমাজে বিধবার এত অমর্যাদা কেন? কী অপরাধ বিধবার? স্বামী মরে গেলেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যাবে কেন? তার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই? আমাদের সমাজ নিষ্ঠুর, স্ত্রীজাতির প্রতি দয়ামায়া নেই, একটু ছুতো পেলেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। অন্য সভ্য সমাজে কিন্তু এ-রকম নেই, বিধবা হবার দোষে কোনও মেয়ের জাত যায় না—'

আমি সমস্ত শরীর শক্ত করে শুনছি, এমন সময় লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মুখ অন্ধকার, চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রামেশ পানে একবার তাকালেন, তার পর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার জন্য এক পেয়ালা চা আনতে পারবে?'

আমি চোরের মত পালিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

পনরো মিনিট পরে দু পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এসে দেখলুম, ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে দুজনের চাপা গলার আওয়াজ আসছে। চাপা গলা হলেও আওয়াজ নরম নয়, করাতের শব্দের মত কর্কশ। ওঁদের মধ্যে চাপা গলায় বচসা হচ্ছে। কথা সব বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হল লক্ষ্মণ বলছেন, 'তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ—'

দোরে টোকা দিতে সাহস হল না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলুম। রান্নাঘরে একলা বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই কি দুই বন্ধুর মধ্যে—। তবে কি ওঁরা দুজনেই আমাকে চান?

সন্ধ্যার পর আজও বৈঠক বসল, খুব তর্কাতর্কি হল। রাম আর লক্ষ্মণ কিন্তু ঘরের দুই কোণে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন, আলোচনায় যোগ দিলেন না। কেবল আমি যখন সকলকে চা দেবার জন্যে ঘরে এলুম তাঁদের চোখ আমার পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত্রি নটা আন্দাজ বৈঠক ভাঙল, সকলে উঠলেন। বাবা আর রাম অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বাড়ির সদরে লক্ষ্মণ আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ লক্ষ্মণ আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি চমকে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলুম, কিন্তু তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ় স্বরে বললেন, 'সুলোচনা, তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। কিন্তু এখন নয়। কাল আমাদের সভার অধিবেশন শেষ হবে, তারপর বলব। তুমি তৈরী থেক। যাও, এখন ভেতরে যাও। কাউকে কিছু বলো না।'

আমার মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল; অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়ির মধ্যে গেলুম।

সারা রাত জেগে শুধু ভাবলুম, কী কথা বলবেন আমাকে? কিসের জন্যে তৈরী থাকব?

পরদিন সকাল থেকে হৈ-হৈ লেগে গেল। আজ সভার শেষ অধিবেশন, এলোমেলো নানা কাজ হবে। তার ওপর গুজব রটে গেছে যে, কয়েকজন নেতাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে। ভোর থেকে বাড়িতে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। বাবা চা খেয়েই রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে সভায় চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, 'তুমিও এস। সভায় বন্দেমাতরম্ গাইবে।'

সেদিন বন্দেমাতরম্ গাওয়া কিন্তু আমার হল না। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, চারিদিকে পুলিস গিসগিস করছে; জনতা মুহুর্মুহু চীৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বন্দেমাতরম্!

তিন-চার জন বড় বড় নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন; তার মধ্যে রাম একজন। লক্ষ্মণ গ্রেপ্তার হননি। আমি যখন উপস্থিত হলুম তখন পুলিস বন্দীদের নিয়ে মোটরে তোলবার উপক্রম করছে। বন্দীদের সকলের মুখে উদ্দীপ্ত হাসি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রাম ফিরে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে চারিদিকে চোখ ফেরালেন, যেন কাউকে খুঁজছেন। তারপর তাঁর চোখ পড়ল আমার উপর। তিনি একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলেন, মুখের উদ্দীপ্ত হাসি

মিলিয়ে গেল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি শিগগিরই ফিরে আসব। ইংরেজের জেল আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

বন্দীদের নিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। তারপর সভায় কী হল আমি জানি না, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এলুম। সভায় আরও অনেক মেয়ে ছিল, তারা সবাই সেদিন কেঁদেছিল, আমার চোখের জল কেউ লক্ষ্য করেনি। আমার চোখের জলের উৎস যে আরও গভীর তা কেউ জানতে পারল না। কেবল বাড়ি ফিরে আসবার পর, সৎমা আমাকে কাঁদতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না।'

ইচ্ছে হল, বাড়ি ছেড়ে ছুটে কোথাও চলে যাই। বিধাতা যে অলক্ষ্য সেই ব্যবস্থাই করছেন তা তো তখন জানতুম না।

দুপুরবেলা লক্ষ্মণ বাড়ি এলেন। মুখ বিষণ্ণ কঠিন। আমার পানে খানিক তাকিয়ে রইলেন, মুখ একটু নরম হল। আবার বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ বোঝা যায় না। আমি কেবল সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'আমাদের জীবনে জেলখানা ঘরবাড়ি, ওতে বিচলিত হলে চলে না। আমাকেও হয়ত আজ নয় কাল যেতে হবে। কিন্তু তার আগে অনেক কাজ সেরে নেওয়া চাই—স্থলোচনা।'

ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, মুখ তুলে তাঁর মুখের পানে চাইলুম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন: 'তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?'

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বললাম, 'যাব।'

'স্বেচ্ছায় যাবে? আমি জোর করছি না।'

'যাব।'

'হয়ত যা আশা করছ তা পাবে না। তবু যাবে?'

'যাব।'

তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন, চোখ দুটি যেন করুণায় ভরে উঠল। তারপর আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইভাবে দাঁড়িয়েই বললেন, 'বেশ।

এখন আমি যাচ্ছি। রাত্রে আবার ফিরে আসব। বারোটার পর। গাড়ি নিয়ে আসব। তুমি তৈরি থেক।'

'আচ্ছা।'

তিনি চলে গেলেন।

সেদিনের কথা এখন ভাবলে মনে হয়, কেন তাঁর কথার মানে বুঝিনি। তিনি তো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর অটল হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্যে টলে গিয়েছিল। সেদিন যদি আমি 'না' বলতুম! যদি বলতুম—যাব না তোমার সঙ্গে, যিনি জেলে গেছেন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করব, তা হলে আমার জীবনটাই অন্য পথে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। আমি যে ওদের দুজনকেই সমান ভাবে চেয়েছিলুম। সৎমা যে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পালান ছাড়া আমার গতি ছিল না।

দুপুর রাত্রে তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন। আমি তৈরি ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার নিরুদ্দেশের পথে অভিসার শুরু হল।

প্রথমে রেলের স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কাশী। ডাক্তারবাবু, শেষ কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। সব কথা খুঁটিয়ে লিখতে ক্লান্তি আসছে।

লক্ষ্মণ আমাকে কাশীর একটা সরু গলিতে অন্ধকার একটা বাড়িতে তুললেন। আধবয়সী একজন স্ত্রীলোক এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, একটা সাজানো ঘরে বসাল। লক্ষ্মণ ঠিকে গাড়ির ভাড়া মেটাবার জন্যে পিছিয়ে ছিলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু তিনি এলেন না। আধবয়সী স্ত্রীলোকটাকে প্রশ্ন করলুম, সে বলল, 'আসবেন, বাছা আসবেন। কত বাবুভায়েরা আসবেন। নাও, এই শরবতটুকু খেয়ে ফেল। তেষ্টার সময়, শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

সেই রাত্রে আমার জীবনে বেঁচে থাকার পালা শেষ হল, প্রেতজীবন আরম্ভ হল। ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম, পতিতা হলুম।

পরদিন সকালবেলা লক্ষ্মণ এলেন। তাঁকে দেখে আমি কেঁদে উঠলুম: 'আপনি আমার এই সর্বনাশ করলেন!'

তিনি নীরস নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার যে-সর্বনাশ করেছি তার জন্য ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু আমার বন্ধুকে বাঁচাবার অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

'কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছিলুম ?'

'অপরাধ কেউ করেনি। তুমি আমার বন্ধুকে চেন না, আমি তাকে চিনি। তার মন তোমার দিকে ঝুঁকেছিল, আমি যদি তোমাকে চিরদিনের জন্যে তার সামনে থেকে সরিয়ে না দিতাম, সে হয়ত তোমাকে বিয়ে করত।'

'তাতে কি এতই ক্ষতি হত ?'

'ক্ষতি হত। তার সর্বনাশ হত, দেশের সর্বনাশ হত। আমি তাকে জানি। তার মন একবার যেদিকে ঝুঁকবে সেদিক থেকে আর তাকে নড়ানো যাবে না। তার মনে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাঁচ ভাগ করে পাঁচ দিকে চালাবার ক্ষমতা তার নেই। সে যদি তোমাকে বিয়ে করত, তাহলে দেশের কাজ আর করত না, তোমাকে নিয়েই মেতে থাকত।

'কিন্তু আমার কী হবে ?'

'দেশের জন্যে অনেকে আত্মবলি দিয়েছে, যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি আজ এই মহাপাতক করলাম। কীসের কী ফল হবে জানি না, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু যখন জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে খুঁজতে আসবে তখন তোমাকে পাবে না। পরে যদি তোমাকে খুঁজে পায়ও তোমার কাছে আসতে পারবে না। এই ভরসায় এত বড় পাপ করেছি।—চললাম। আর দেখা হবে না।'

তিনি চলে গেলেন।

তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেদিন আমার যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। আমার ঘরের দেয়ালে যে-দুটি ছবি দেখে আপনি ভুরু তুলেছিলেন তার মানে বোধ হয় এখন বুঝতে পারছেন। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, ওরা দুজন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। ওঁদের নাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। ওদের আমি আর দেখিনি, কেবল ছবি টাঙিয়ে রেখেছি নিজের ঘরে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার কথা কি ওঁদের মনে পড়ে ? দেশের কল্যাণে যিনি আমাকে নরকের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন আমার কথা মনে পড়লে তাঁর মন কি বেদনায় টনটন করে ওঠে ?

কিন্তু আমার কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। সবই আমার ভাগ্য, আমার জন্মান্তরের কর্মফল তবু মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সর্বনাশ না হলে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না ?—

এবার শেষ করি। ডাক্তারবাবু, আমার পাপ-জীবনের সঞ্চয় মৃত্যুর পর

যা অবশিষ্ট থাকবে তা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আপনার নিজের টাকার দরকার নেই জানি। কিন্তু আমার টাকাকে আপনি ঘৃণা করবেন না। টাকা কখনও নোংরা হয় না ডাক্তারবাবু। যত নোংরা স্থান থেকেই আসুক, টাকায় কলঙ্ক লাগে না। আপনি আমার টাকা নিজের বিবেচনামত সৎকার্যে ব্যয় করবেন।

আপনি আমার অন্তিম প্রণাম নেবেন।

ইতি—

সুলোচনা

ডাক্তারের ফুটনোট :—সুলোচনার টাকা আমার হাতে আসিলে আমি তাহা লক্ষ্মণের নামে বেনামী চাঁদারূপে পাঠাইয়া দিয়াছি। 'লক্ষ্মণ' কেন্দ্রীয় শাসনমণ্ডলের উচ্চস্থ ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় এই টাকার সদগতি করিতে পারিবেন।

। এমন দিনে ।

রাতবিরেতে | যুবনাশ্ব

শীতের শেষরাত।

বড় রাস্তার ওপর মস্ত তেতলা বাড়ি। অনেক জায়গা জমি চারিধারে, প্রকাণ্ড ফটক। লতাপাতার ঝোপঝাড়ে দেয়াল ঢাকা।

বাড়িব বেশির ভাগটাই অন্ধকাব। বারান্দায় দু' একটা আলো জ্বলচে। তেতলার একটা জানালা থেকে খানিকটা আলো বেরিয়ে এসে জমাট কুয়াসার জালে আটকা পড়ে থেমে গেচে।

ওপবেব বারান্দা দিয়ে বার দুই একটা নার্স হেঁটে গেল। মাঝে মাঝে রোগাতুব কণ্ঠের দু' একটা কাতবানি আর মেথব জমাদারের ফিস্‌-ফাস ছাড়া কোন সাড়াশব্দ নেই।

রাস্তা নির্জন, নিস্তব্ধ। দূবের একটা বাড়ি হতে থেকে থেকে ঘুমন্ত ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্চে।

বড় বাড়িটার পাশেই ছোট্ট একটা গলি। গলির মুখটা বড় রাস্তার গ্যাস বাত্তির আলোয় আলোকিত, ভেতরটা বেজায় অন্ধকার। তেতলার বাড়িটার জানলা দেওয়ালের মধ্যে ছোট্ট একটা দরজা গলির ওপর। লতাপাতাগুলো এমন ঝুলে পড়েচে যে চট্ করে নজরে পড়ে না। দরজা

খুলে আপাদমস্তক কালো চাদরে মুড়ি-দেয়া আয়াশ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। সন্তর্পণে এদিক ওদিক চেয়ে ডাকল, ঝুমন—

অন্ধকার গলির সবচেয়ে আঁধার কোণ থেকে সাড়া এল, কে, সুখিয়া—

সাড়া পেয়ে সুখিয়া রাস্তায় নামল।

দুজনে মিলে গলির ভেতরে খানিকটা এগিয়ে গেল।

সুখিয়া বলল, তোর আসতে এত দেরি হল যে আজ? আমি দু'বার এসে ঘুরে গেচি আগে।

ঝুমন একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, পতে এক শালা পুলিসের পাল্লায় পড়ে গেছনু। শালা কি সহজে ছাড়ে? অনেক ভজিয়ে-টজিয়ে ঠাণ্ডা করে আসতে দেরি হয়ে গেল।—বাপ। যা শীত পড়েচে আজ।

ছেঁড়া কাঁথাখানা দিয়ে বেশ করে কান মাথা ঢেকে নিয়ে বলল, নে, মাল বার কর।

সুখিয়া চাদরের ভেতর থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করল। ঝুমন হাত পেতে ধরতেই সেটা নড়ে উঠল। ভেতর থেকে একটা অস্ফুট শব্দ হল, ও-ঞা-ওঞা--

ঝুমন সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে বলল, কদ্দিনের?

—একটা দিন ষোল, আর একটা এক মাস।

—মেয়ে, না ছেলে?

—দুটোই মেয়ে।

ঝুমনের বীভৎস কুৎসিত মুখখানা সেই অন্ধকারের মধ্যে সুখের হাসিতে ভরে উঠল।

সুখিয়া বলল, দুখানা লোটের কমে এ জোড়া ছাড়চিনে।

—থাম মাগী। দুখানা লোট। আমার ছ-ছ'টা করকরে টাকা লোকসান। এ জোড়াস বারোখানা টাকা পাবি—যাদি ব'লে বলচি, মন্দা হলে অদ্দেক দিয়েও পুছতুম না।

—মরে গেল, সে কি আমার কসুর? কুড়িদিনের অতবড় ছ্যানা, তু বাঁচাতে পারলি নে, তা আমি কি করব? এর আগে তো কখনো মরেনি আর! সেগুলোতে কত রোজগার করেচিস ভাব দিকি?—না, না, এ জোড়া নিতে হলে বিশ রূপেয়া ফ্যাল, তা'পর নে যা।'

একটা শেষটান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে ঝুমন বলল, বিশ রূপেয়া কিছুতেই পারব না। আচ্ছা, বারোতে না ছাড়িস, সাত সাত চোদ্দ—

বলে সে গ্যাঁজে হাত দিল।

সুখিয়া অসন্তুষ্টভাবে বলল, তাহলে পনেরটা দে। সিদটারকে আবার পাঁচ টাকা দিতে হবে এর থেকে, আমার থাকল ছাই!

জবরদস্তি করে একটা টাকা বেশী নিবি?—নে! কিন্তু আগাম হপ্তায় ভাল মাল চাই—মেয়ে। ছোঁড়া অনেকগুলো হয়ে গেচে, ও আর চাইনে। মেয়ে দিবি। আর বেশ পুরুষ্টু হয় যেন।

—খালি মেয়ে হলে আগাম হপ্তায় হবে না—পরের হপ্তায়।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই। কিন্তু মদ্দা বাচ্চা আর চাইনে।

—সে মেয়েগুলো পার করেচিস?

—কোন্‌গুলো? ওঃ—হ্যাঁ। কুসমি নিয়েচে। বেটি চিপ্পুসের হাড়। বরাবর ওকে তাজা মাল জোগাচ্চি, কিন্তু বেটি শকুনি! এই তো সেদিন পটলীকে পার করলুম, ন' বছরের অমন ডবকা মেয়ে—বেটি দিতে চায় কিনা চল্লিশ টাকা! বললুম, মাসী, পথ ছ্যাক্। ওকে ক্যান্তর কাছে ছাড়ব, ষাট টাকায় লুপে নেবে। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বায়ান্ন টাকায় রফা হল।

—এত পাস, আর আমাদের সাতেই যত ছোট মান্‌সী?

ছোট মান্‌সী! তোদের বেশি দাম দোব কোন্ সাহসে? যদি মরে যায়? আর আমার তো নে গিয়ে পুষবার খরচ আচে। পাঁচ ছ'দিনের ছা নিয়ে গে ন'দশ বছরেরটি করতে হলে খাওয়াতে পরাতে কি কম খরচটা হয়? তার ওপর সব ক'টা কিছু দেখতে ভালো হয় না। খারাপ হলে দামও কমে যায়। কতকগুলোকে আবার ধরে বসিয়েই হিল্লে করতে হয়। এসব খরচ পুইয়ে শেষ-মেষ আমার তো থাকে কচু! আর ছোঁড়াগুলো তো বাজে খরচ! খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করি—চোক ফুটলেই নিজের পত ছ্যাকে—

—তার মানে? গোড়ায়ই খাম করে দিস্ না সেগুলোকে?

—সবগুলোকে নয়। যেগুলোকে দিই, তাদের কাচ থেকে অবিশ্যি কিছু আদায় হয়। সেই লালচুলো বাচ্চাটার কতা মনে আছে তোর? সেটাকে হাত মুচড়ে কোমরের সাথে বেধে দিইছিনু। দিব্যি নুলো হয়ে গেচে এখন, পথে বসে, রোজগারও মন্দ হয় না।

—সে সায়েবের ছা'টার কি করেচিস?

—সেটার জিব কেটে দিইছিনু—কি জানি ব্যাটাছেলে বড় হয়ে যদি সায়েবি বুলি ঝাড়তে শুরু করে! এখন সেটা খুব রোজগেরে হয়েচে, তবে আমায় বড় একটা মানতে চায় না।

—তা হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়? সবাই যে তোর বশ হবে এমন ধরা-বাঁধা কতা কিছু নেই!

কথা বলতে বলতে দুজনে ছোট দরজার কাছে এগিয়ে এল।

সুখিয়া বলল, বিড়ি দে একটা—

—এই ধর। ঝুমন সুখিয়ার হাতে বিড়িটা দিয়ে শিশু দুটিকে বেশ করে ছেঁড়া কাঁথায় ঢেকে নিল।

একখানা ফিটন এসে থামল গলির মুখে। আরোহী দুটি ফিরিঙ্গি যুবক। একজন চিৎ হয়ে পড়ে মত্তকণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজছিল।

ফিটন দেখেই সুখিয়া দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল।

ঝুমন বলল, গেলি না যে বড?

সুখিয়া তার মুখে হাত দিয়ে বলল, চুপ্।

ঝুলেপড়া লতাপাতাগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে একজন নার্স এসে গলিতে নামল। দু'একবার শঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হন হন করে গাডির দিকে চলল।

ঝুমন কি বলতে যাচ্ছিল, সুখিয়া তার হাত টিপল।

নার্স গাডির পা দানে পা দিতেই একজন যুবক তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

মাতালটা গাড়োয়ানকে বলল, এই-য়ো—চালাও।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে দু'একটা চুম্বনের আওয়াজ ভেসে এল।

গাড়ি চলে গেল।

সুখিয়া বলল, সিস্টারকে নিয়ে দিনকতক দেদার মজা লুটচে ছোঁড়া দুটো।

ঝুমন জবাব দিল না। কাঁথাখানা আর একবার ভাল করে জড়িয়ে সে বলল, আজ চললুম সুখিয়া—

—আয়।

গলি থেকে বেরিয়ে ঝুমন বড় রাস্তা ধরে কিছুদূর চলল। সামনে একটা কনস্টেবল দেখে সে পাশে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-গলি সে-গলি করে সে শহরের এক প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। সেখান দিয়ে একটা খাল চলে গেছে। সে সন্তর্পণে খালটা পার হয়ে আরো কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি একটা সরু জমির ফালির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘোর অন্ধকার। দু'ধার দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট মেটে কুঁড়ে। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। শীতকালেও সে জায়গাটা কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে।

খানিকটা গিয়ে মোড় ঘুরতেই, সে দেখল, একজন ভদ্রগোছের মানুষ র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চোরের মতো চলেছে।

সে দাঁড়াল, ডাকল, কি চান বাবু হেতায় ?

ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল।

সামনের কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। বলল, কে ও ? সর্দার। যেতে দাও, বাবু ময়নার কাছে এয়েছিল।

—বিড়ি আচে ঘরে ? দে তো একটা, বলে সে দুয়োরে পা দিতেই স্ত্রীলোকটি বলল, ঘরে ঢুকো না সর্দার, মানুষ আচে।

ঝুমন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে স্ত্রীলোকটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাসল। বলল, ভুঁদির ঘরে।

ঝুমন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আস্তানার মধ্যে হঠাৎ এত বাবুর আমদানী করলি কোত্থেকে খেঁদি ?

খেঁদি বলল, বাবুর আবার অভাব। ঘণ্টা দু'তিন আগে ওই হোতা বড় রাস্তার মোড়ে বাবু দুটি আস্তানার দিকে তাকিয়ে ঘোরা ফেরা করছিল। ভুঁদি গিয়ে কত্তা কোয়ে নিয়ে এয়েচে।

—এটা যে পাড়া নয়, তা জানে তো ?

—তা আর জানে না ! কত জিজ্ঞেসবাদ করলে। কে কে থাকে হেতা, দিনের বেলা কি করে, এই সব। আমি বলি কি সর্দার, বাড়িউলি মাসীদের কাচে ছুঁড়িগুলো না বেচে, এখেনেই কেন ব্যবসা নাগিয়ে দাও না ! আমি বলচি তোমায়, বাবুর অভাব হবে না।

—না, না, তু পাগল হলি না কি ? আর ত্থাক, একটু সাবধানে কাজ করিস। এখন শোন, ইদিকে আয়।

ঝুমন খেঁদিকে সাথে করে নিজের কুঁড়েয় নিয়ে গেল।

ঝাঁপ খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, এই দ্যাখ, আজকের সওদা!

শিশু দুটি দেখে খেঁদি বলল, কত নিলে?

—পনের।

—ঠকায়নি। বেঁচে বর্তে থাকলে চার কুড়ি টাকায় এক-একটা বিকোবে!

ঝুমন শিশু দুটিকে ঢেকে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শোয়াল।

তু একটু খবরদারী করিস। আমি আসচি।—বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

ভুঁদির ঘরে শব্দ শুনে তাকাতেই, সে দেখতে পেল, দিব্যি ফিটফাট এক যুবক কুঁড়ে থেকে বেরুল। সেদিকে আর না চেয়ে সে নিজের পথ ধরল।

চারিদিক একটু একটু করে ফরসা হয়ে আসচে। ঝন্ ঝন্ শব্দ করতে করতে ময়লা-ফেলা একাগুলো বড় রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেচে।

পেছনের ঝুঁড়েটা থেকে ছোট্ট ছেলের কান্না শোনা যাচ্চে—ওঞা—ওঞা!

। পটল ভাঙা'র পাঁচালী ॥

ইতি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠি ছিল না, তাই মুখের নিবন্ত চুরুটটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য গোটা চার পাঁচ টান দিয়ে রমেশ শুধোল, 'এখন কি উপায়, কৃতার্থ ?'

কৃতার্থ ঠোঁট উল্টে বললে, 'উপায় একটা হবেই—'

রমেশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু গোঁফ-কামানো ছেলে আমি নামাতে পারব না বলে রাখছি।'

কৃতার্থ বললে, 'তা আমি যোগাড় করে দেবই। এ-জায়গাটায় বহু বছর আগে একবার এসেছিলাম। সামনের ঐ বাবলা গাছটার ধার দিয়ে যে-পথটা খালের দিকে এগিয়ে গেছে—ঐ পথটা ভারি চেনা-চেনা। আপনি ঘাবড়াবেন না।'

চুরুটের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রমেশ বললে, 'না ঘাবড়েই বা কি করি! যোগাড় করে আনো একটি। এ বিষয়ে তো তোমার হাত আছে। কিন্তু খালি জোটালেই তো চলবে না, টালও সামলাতে হবে—'

'আচ্ছা দেখি।' বলে কৃতার্থময় চাদরটা কাঁধে ফেলেই তক্ষুনি বেরিয়ে গেল।

একটি অখ্যাত ছোট শহর—আশেপাশে দু-দশখানি গ্রাম—ম্যালেরিয়ায় ঠাসা।

বড়দিনের ছুটিতে বড় শহর থেকে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে—বিনা নিমন্ত্রণেই। দুরাত্রি থিয়েটার হবে বলে আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল—'মালতী : শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।'—মানে, মেয়ের পার্টে যিনি নামবেন তিনি মেয়েই।

এ-খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছল—স্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষ বইয়ের কথা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাবে—এ আশেপাশের গাঁয়ের লোকের কাছে একেবারে অবাক কাণ্ড; কিন্তু শহরের যাঁরা মাথা, মানে যাঁরা টাক ও টিকি, তাঁদের কেউ-কেউ এ নিয়ে মহা গোল পাকিয়ে তুলছেন—বলছেন, 'ছেলেরা যাবে বিগড়ে, মেয়েদের মন যাবে বিষিয়ে। বন্ধ করে দাও।'

রমেশবাবু বললে, 'আপনিই হয় তো বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের যা দেশ, মশায়ই মশগুল। আসতে-আসতেই আমাদের চমৎকারিণী দাসীর জ্বর-চমৎকার হয়েছে। আমরা নিজেরাই পাল গুটোব।'

শহরের উকিল বগলাবাবু বললেন, 'তাই গুটোন মশায—হাওয়া উত্তুরে। মেয়েমানুষ নাবালে এক পযসাও মিলবে না আপনাদের, চমৎকারিণীর ওষুধের খরচটি পর্যন্ত নয়। আমাদের এখানে বনের মশা আছে থাক—বিলাসের মশাল চাইনে। অভিনয় আমরা চাই বটে, কিন্তু অবিনয় নয।'

বগলাবাবুর আর যাই থাক, গলা আছে বটে—দেখতে ও শুনতে।

বগলাবাবু যেতে না-যেতেই একখানা ছ্যাকড়াগাড়ি এসে দাঁড়াল। দোর খুলে কৃতার্থ নামছে। পেছনে একটি মেয়ে।

কৃতার্থ ঘরে ঢুকেই বললে, 'এনেছি মশাই, দেখুন বাজিয়ে এবার।'

মেয়েটি ভারি ভীরু, ঘোমটাটি একটু টেনে দেয়ালের সঙ্গে মিশে রইল। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটি কোমলতা আছে। প্লে-তে মালতীকে এমনি একবার দাঁড়াতে হবে—রমেশবাবুর পছন্দই হল হয়তো।

বললে, 'তুমি যে আমাকে কৃতার্থ করলে হে। ব্যাপার?'

বুক চাপড়ে কৃতার্থ বললে, 'খালের পারে যে এমন কলি ফোটে কলিকালের পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য, রমেশবাবু। বাৎচিৎ করে হাল-চাল সমঝে নিন। চলবে? র' এক পেগ পেটে যাওয়ার মতো একটু ঘোর-ঘোর লাগছে না?'

মেয়েটি ততই যেন মীইয়ে যেতে থাকে।

রমেশ শুধোল, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি ঘোমটার ফাঁক থেকে জবাব দিল, 'সরলা।'

স্বরটা একটু ভীতু বটে, একটু জোলো—কিন্তু ভারি স্পষ্ট।

কৃতার্থ বললে, 'ঘোমটাটা একটু কমিয়েই আন না, দিনের আলোয় এত ভয় কিসের?'

নিবিড় অন্ধকারের মতোই কালো দুটি চোখ—সরলা ঘোমটা একেবারে মাথার ওপর তুলে আনলে—কিন্তু দুটি চোখেই যেন অন্ধকারের অগাধ স্নেহমাখা। সমস্ত মুখে একটি ভারি মিষ্টি কমনীয়তা আছে, পাতলা ঠোঁট দুটি পরস্পরের সঙ্গে ভারি আলগোছে ছোঁয়াছুঁয়ি করে আছে, একটুখানি কপাল—রমেশের মনে হচ্ছিল মাপলে হয়তো দুআঙ্গুলের বেশি হবে না, চিবুকটি একটু চ্যাপটা হয়ে গালের দুদিকে ছড়িয়ে পড়াতেই মুখখানিতে এমন একটি পেলবতা এসেছে।

মেয়েটি একটি লাবণ্যের নদী। খুব স্রোত নেই, যেন বিকেলের আলোয় টলটল করছে।

নাটকের নায়িকার সঙ্গে কল্পনায় যতবার রমেশের সম্ভাষণ হয়েছে—অমনি তার মুখের ডৌলটি, ভাসা-ভাসা দুটি চোখে অমনি একটি সস্নেহ কুণ্ঠা, শুধু দাঁড়ানোটিতেই অমনি একটি সুষমা। মেয়েটি বেশ।

রমেশ ঢোক গিলে বললে, 'তুমি পড়তে জানো তো?'

সরলা বললে, 'জানি একটু-একটু। তবে কয়েকবার শুনলেই মনে করে রাখতে পারি।'

রমেশ হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস রে, নিমাই? দে ঐ চেয়ারখানা সরলাকে এগিয়ে।'

তিন-চারখানা হাত বেরিয়ে এল একসঙ্গে।

চেয়ারের দরকার হল না। সরলা মাটিতেই বসল।

রমেশ জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে প্লে করবে? প্লে মানে খেলা নয়, নাটক।'

কৃতার্থ ভুরু কুঁচকে বললে, 'ও, তা খেলা-ই। কি বলো হে—'

ঠোঁটে হাসি ফুটতে না দিয়েই সরলা বিজ্ঞের মতো বললে, 'সংসারটাই তো খেলা শুনেছি।'

কৃতার্থ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'কেয়াবাৎ। সরলা শুধু আমাদের দর্শন দেনই না, শেখানও।'

রমেশ বললে, 'পারবে করতে ?'

সরলা বললে, 'শিখিয়ে দিলে কেন পারব না ? আমাদের শুধু পাখা নেই, নইলে তো আমরা পাখিই।'

কৃতার্থ ফের ভুরু কোঁচকাল। বললে, 'পাখা নেই, কিন্তু উড়তে জানো খুব। তোমরা পোকাও।'

সরলা বললে, 'আগুন দেখলেই উড়ে পড়ি। তাতে আগুন নেভে না, পাখাই পোড়ে।'

মেয়েটি দেখতে ভীতু, কিন্তু কথায় জিলিপি।

রমেশ বললে, 'ছোট্ট একটুখানি পার্ট, কিন্তু ভারি শক্ত। দু-তিন দিনে তৈরি করে দিতে হবে। আমরা আসচে শনিবারেই নামিয়ে দিতে চাই, আজ মঙ্গলবার।—পারবে তো ? মোটে তিনটি সিন।'

সরলা ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিলে।

'আজ দুপুরেই তাহলে তোমাকে নিয়ে আসব। যার এই পার্ট করবার কথা ছিল, সে পড়েছে অসুখে—তাই মুশকিল যেমন মারাত্মক, তাড়াও তেমনি। কেননা আসচে হপ্তায় বগুড়ায় একটা বায়না আছে, আগাম টাকা নিয়ে বসে আছি। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে আসবে তো ? বাড়ির ভিড় এ দুদিন একটু সরিয়ে দাও—এই নাও।'

বলে রমেশ মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট সরলার দিকে প্রসারিত করে দিল। সরলা আঁচলের খুঁটে নোটটি বেঁধে কোমরে ভালো করে গুঁজে নিলে। ওর দুই চোখ খুশীতে উছলে উঠেছে।

রমেশ বললে, 'গাড়ি করে ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো, কৃতার্থ।'

সরলা বললে, 'গাড়ি কি হবে ? কতটুকুই বা পথ—দুকদম। হেঁটেই যাচ্ছি।'

রমেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে যা নিমাই, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

নিমাই পা বাড়াচ্ছিল, সরলা পেছন না চেয়েই বললে, 'দিনের বেলা লোক লাগবে কেন ? একলাই তো যাওয়া-আসা করি—আমি খুব যেতে পারব। আসব দুপুরে।'

সরলার চলাটিও বেশ—এক মুঠো ঝিরঝিরে বাতাসের মতো, বেশ জিরিয়ে জিরিয়ে চলে। বাবলা গাছের গোড়া থেকেই পথটা বাঁক নিয়েছে। আর দেখা যায় না।

কিসের গাড়ি—কিসের লোক !

সরলার সঙ্গে পৃথিবীর আজ নতুন করে শুভদৃষ্টি—মগ-ডালের লাজুক হলদে ফুলটির পর্যন্ত। খালে জেলেরা জাল ফেলেছে নৌকোর গলুই-এ দাঁড়িয়ে, পায়ে কারা বেত চাঁচছে, রৌদ্রে খোলা পিঠ পেতে কাদের বাড়ির বৌ কলার পাতায় তেল মেখে বড়ি দিচ্ছে—সরলার ইচ্ছা করে সবাইর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়। ওদের ছায়া মাড়ালে স্নান করে—ঐ যে পুরুতঠাকুর আসছেন, তাঁকে দূর থেকে একটা সাষ্টাঙ্গ করে বসে; কাউকে খামোকা জিজ্ঞেস করে, 'বাবুইহাটির এ-রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর বেরিয়ে গেলে কত দূরে ঐ সবুজ মেঘটাকে মুঠির মধ্যে ধরা যায়—'

সরলা ট্যাঁকে-গোঁজা নোটটা বারে-বারে অনুভব করতে-করতে বাড়ি চলে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই সরলা ডাক ছাড়ে, 'ওলো ও ভুতি,কি করছিস ? দেখে যা শিগগির—আমি থেটার করব। খোদ ফরিদপুর থেকে থেটারের দল এসেছে—আমাকে পার্ট দিয়েছে। আমি রাণী সাজব—মাথায় মুকুট, গলায় মটরমালা, পায়ে সেই জুতো -ঐ যে ঘোড়ায় চড়ে ছোটলাট এসেছিল, তার বিবির সেই খর-তোলা জুতো দেখেছিলি, তেমনি। রাজা আমার পায়ের কাছে পড়ে কত কাঁদবে, কপাল কুটবে—আমি ঘাডটা এমনি করে থাকব—'

সরলা ঘাডটা তেমনি করে দেখাল।

ভুতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরলার এ অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে একেবারে থ হয়ে গেছল। বললে, 'কি লো, ঘোড়দৌড় দেখে এলি নাকি ?'

সরলা বলতে থাকে, 'এই ছাখ বায়না দিয়েছে দশ টাকা। দশ পয়সার বেপারি—দেখেছিস এমনি কাগজ—সবুজ নীল কালো কালি—পড়তে পারিস ? দশ রুপেয়া ' ক'আনা জানিস ? এক টাকায় ষোল আনা —দশ টাকায় ?'

এবার সত্যিই ভুতির চোখ চড়ক-গাছ। দম নিয়ে বললে, 'সত্যি বলছিস, সরি ? পথে কুড়িয়ে পেলি নাকি লো ? এত ভাগ্যি তোর ?'

'পথে আমার জন্যে সব মুক্তো ঢেলে রেখেছে, তোদের জন্যে তেঁতুল-বিচি ! পাঁচ মুখে পাঁচ হাটে আমার নাম বিকোয়—কে জানত আগে ? কোথা সে ফরিদপুর, সেখান থেকে আমার নাম শুনে এসেছে এই শহরে ! আমাকে তাদের দলে ভর্তি করে নেবে। ভারি শক্ত প্লে নিয়ে নেমেছে রে ভুতি—সবচেয়ে

শক্ত পার্ট পড়েছে আমার হাতে। কে আর করবে বল্? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটাকে—মুখ দিয়ে একটা রা বেরুল না—আর আমাকে যেই বলা, দিলাম বলে গড়গড় করে : প্রাণনাথ, রাখো তব পদতলে! বাবুদের সে কী তারিফ! বললে—সরলা, তোমার ছাড়া কারু আর সাধ্যি নয়।—বারে-বারে হাঁটু গেড়ে বসতে-বসতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে।'

কি যে বলবে সরলা ঠিক ঠহার করতে পারে না। বলে, 'আসছে শনিবার সন্ধ্যায় হবে। তোদের দেখিয়ে দেব মাগনা—পাস পাওয়া যাবে ঢের। দেখবি রাণীর পোশাকে কী মানায় আমাকে! রাজা—সে সেজেছে নবিগঞ্জের জমিদারের ছেলে—আমার পায়ের কাছে মুক্তো ঢালবে, মাথার মুকুট খুলে রাখবে, রুমাল মুখে পুরে কত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে—আমি ঠায় সিংহাসনে বসে থাকব, মাথা উঁচু করে রাখব।'

বলে সরলা মাথাটা কড়িকাঠের দিকে উঁচু করে ধরে।

ভুতি বলে, 'মাগনা দেখাবি তো সত্যি? ছাপানো কাগজ বিলি হবে না?'

'হবে লো, সব হবে।'

বলে সরলা বারান্দার ওপাশে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ল : 'ও বাড়িউলি-দিদি! বড়ো যে সেদিন ঘরভাডার পাওনা টাকা নিয়ে তম্বি করছিলে, নাও তোমার টাকা—সাড়ে পাঁচটাকা ফিরিয়ে দাও দিকিন।'

বাড়িউলি নোটটা হাতে পুরে বললে, 'সাড়ে পাঁচ টাকা কি? সেদিন যে তোর অটলবাবু দুপাঁইট মদ খেয়ে গেল—তার দাম কে দেবে?'

সরলা বললে, 'তা আমি কি জানি? যে গিলেছে তার থেকে নাও গে—'

'তা তো বটেই লো, ছুঁড়ি। কে সে যে তাকে আমি শখ করে মদ দিতে যাব? তোরই পীরিতি পোড়ে বলে না আমি—সে আমি বুঝছিনে বাছা, হাতের কাছে করকরে টাকা পেয়ে আমি ছাড়ছিনে, নিতে হলে তুমি আদায় করে নিয়ো—'

সরলার মোটেই ঝগড়া করবার মন ও অবসর ছিল না; বললে, 'নাও, নাও, ঝামেলা রাখো, যা নেবার নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দাও শিগগির; হিসেব-ফিসেব পরে হবে'খন। আমার ঢের কাজ।'

খুচরো টাকা ক'টা নিয়ে যেতে-যেতে সরলা বললে, 'অমন বাবুর মুখে ঝাড়ু!'

বাড়িউলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, 'কার মুখে ঝাড়ু লো, ছুঁড়ি? লজ্জা করে না বলতে? সেদিন তো ঐ বাবুই জুতোর

গোড়ালিটা দিয়ে বোঁচা নাকটা থেঁৎলে দিয়েছিল। ঐ থেঁৎলানো নাক নিয়েই তো সেই বমি-মুখো বাবুর সামনে পিকদানি তুলে ধরেছিলি।'

পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'অত ছুটোছুটি ভালো নয় সরি, বাবুর কানে তুলব কিন্তু—'

সরলা বললে, 'তুলো না। সরি এবারে সরে পড়ছে—বাবুর তোয়াক্কা আর সে রাখে না। পায়ের কড়ে আঙুলের ডগায় বেঁধে রাখতে পারি—'

বাড়িউলি চাপা গলায় শুধু বললে, 'আচ্ছা।'

সরলা ঝিকে পাকড়ালে। বললে, 'তোমাকে এক্ষুনি সাজো-ধোপার বাড়ি যেতে হবে, মাসি। পয়সা না পেলে কাপড় দেবে না বলে শাসিয়েছে—এই ছ'টা পয়সা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দিয়ে এসো তো। বলো—এবার থেকে ছ'টাকা দিয়ে বিলেত থেকে কাপড় কাচিয়ে আনব। ও ভয় দেখায় কি? এক্ষুনি যাও, মাসি—গঙ্গাজলিটা পরে আমায় এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে। আর শোনো, এখন আর বাঁধবার সময় হবে না দু'পয়সার ফুলুরি নিয়ে এসো—আর, আর দু'পাতা আলতাও কিনে এনো—কতটুকুনই বা হাঁটতে হবে—যাও লক্ষ্মী। মোটমাট দশ পয়সা দিলাম—কিছু ফিরলে আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, তোমার ছেলে হরির নামে নিয়ো—'

ঝি বলতে-বলতে যাচ্ছিল, 'ফিরবে তোমার মাথা—'

সরলা আর একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'নাও তবে আরেকটা।'

সরলার চোখে নিজের ঘরটাই শুধু আজ বিশ্রী লাগছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘরের সমস্ত কদর্যতা যেন বের করে ফেলেছে। নোংরা বিছানা, ছেঁড়া বালিশ, আ-মাজা বাসন-কোসন, দেয়ালে ঝোলানো মাংসের ও মদের দাগ-লাগা অটলবাবুর চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবিটা। দিনের আলোয় ঘরটাকে যে এত বিরস, এত বেমানান লাগে সরলার তা কোনোদিন চোখে পড়েনি।

সরলা জানলাটা বন্ধ করে খালের পারে এসে দাঁড়াল। রোদ কতটা চড়া হলে ওখানে যাবার মতো দুপুর হবে মনে-মনে ও তারই হিসেব করছিল। ছাই গাড়ি। ওর পা বেতো ঘোড়ার চেয়ে আগে যাবে।

ঝি এসে হিসেব দিলে। মোট এগারো পয়সাই লেগেছে।

বললে, 'দুপয়সার ফুলুরিতে কি লোকের পেট ভরে?'

সরলা বললে, 'তুমি কি বোকা, মাসি। আমি কি পেট ভরে খাবার জন্যে তোমাকে বাজারে পাঠিয়েছি নাকি। আমার যে আজ নেমন্তন্ন থেটার-

পার্টিতে। আমি রাণী সাজছি—সেখানে কত খাবার দেবে'খন। ক'টা না ক'টায় খাওয়া হয়, সেজন্যে ক্ষিদেটাকে একটু মেরে রাখবার জন্য দুটো চিবিয়ে যাওয়া। ও আর আমি ছোঁব না মাসি, ও তোমার হরিকে নিবেদন করে দাও গে। আর শোনো—আমি তোমাদের মাগনা থেটার দেখিয়ে দেব'খন। তুমি যেয়ো হরিকে নিয়ে—বাপের বয়সে তোমরা তা কখনো দেখোনি।'

সরলা তাড়াতাড়ি চান করে নিলে। আয়নার কাছে বসে-বসে অনেক কসরত করবার সময় নেই মনে করে তাড়াতাড়ি চুলটা জড়িয়ে নিয়ে, ধোয়া শাড়ি সেমিজ পরে পায়ে টাটকা আলতা আর কপালে কাঁচপোকার টিপ লাগিয়ে না-খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। বড় রাস্তার উকিলবাবুর বৈঠকখানার ঘড়িটা দেখবার জন্য একটিবার নিচু হয়ে চোখ পেল না। যা হোক গে, একটু আগে যাওয়াই ভালো।

এখন কোচোয়ানরা সব খেতে গেছে, আড়গাড়ায় গাড়ি মেলাই ভার হবে। থেটারের বাবুদের শুধু-শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কি। সরলা এমন কি নবাবের বেটি!

পথ যেন সরলার এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে গেল। পায়ের কাঁচা আলতার দাগ তখনো শুকোয়নি, কাঁচা মাটির রাস্তায় ছোট-ছোট দাগ লেগেছে।

শহরের এ-বাড়িটা রমেশবাবুরই, এতদিন পড়ে ছিল।

পাশের মাঠে সকাল থেকেই স্টেজ খাটানো চলেছে—এ পাড়ার সমস্ত ঘরামিই লেগে গেছে—হোগলা তেরপল বাঁশ দড়ি পাটাতন বেঞ্চিতে ঠাসা। ময়মনসিং থেকে সিন এসে পৌঁচেছে। কে একজন সিনগুলিকে তদারক করছে, একটু-একটু মেরামত করছে—ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের ভিড়—একজন ধমকে উঠলেই সবাই ছিটকে পড়ে—আবার গুটি-গুটি এসে জড়ো হয়—কোলাহলে বাতাস যেন টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে!

সরলা এসে দাঁড়াল।

রমেশবাবু তখন ভেতরে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। শহরের কয়েকটি বয়স্ক ছেলে রমেশকে অভয় দিচ্ছিল, 'বগলাবাবুর গলাবাজিতে ভড়কাবেন না, মশায়। আর যাই হোক, গেঁজেল ছোঁড়াদের হেঁড়ে গলায় 'প্রাণনাথ' ডাক শুনতে কক্ষনো পারব না আমরা—আত্মারাম খাঁচাছাড়া আর কি! চোখ বুজে কানে আঙুল ঢুকিয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যাবে?'

রমেশ হেসে বললে, 'সে-ভয় আমার নেই—ঢের ঢের বগলাবাবু দেখেছি।'

ছেলেদের থেকে একজন বললে, 'নিচু ক্লাসের টিকিট চার আনাই করবেন মশাই—তাই জোটাতে আমাদের প্রাণান্ত।'

রমেশ বললে, 'যতই কেন না উনি বগল বাজান, আমাদের চমৎকারিণীকে দেখে ও তার য়্যাকৃটিং শুনে উনি যদি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে না যান, তো কি বলেছি।'

এমনি সময় নিমাই উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরলা এসেছে।'

রমেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ছেলেগুলিকে বিদায় দেবার চেষ্টায় বললে, 'আচ্ছা, তাই কথা রইল। একদিন না-হয় স্টুডেন্টদের হাফ করে দেব।'

বেশ, বেশ, চমৎকার।' বলে ছেলেরা হাসিমুখে বিদায় নিল।

তেমনি কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন টেনে সরলা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোমটার তলা দিয়ে ভিজা চুলগুলি পিঠের দু'দিকে ঝেঁপে পড়েছে,—ফিনফিনে শাড়িটি পরাতে সরলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—সরলার কটিটি যেন মুঠির মধ্যে ধরে নেওয়া যায়—এমনি—হালকা। সমস্ত মুখে বিষাদের একটি স্তিমিত অপূর্ব শ্রী।

রমেশ খুশী হয়ে বললে, 'তুমি এসেছ, সরলা? বেশ, বেশ। খেয়ে এসেছ তো?'

সরলা ঘোমটাটা আলগোছে একটু কমিয়ে আনলে, বললে, 'খেয়েই এসেছি।

—'তবে তুমি ওখানে একটু বোসো, আমি চান করে খেয়ে নিই, পরে মহড়া শুরু হবে। ও নিমাই, সরলাকে একখানা বই এনে দে তো। তুমি তো পড়তে পার একটু-একটু—এখন একটু চোখ বুলিয়ে নাও—পরে হাত পা নাড়া সব আমি শিখিয়ে দেব। মোটে তিনটি সিন তোমার, —লাস্ট সিনটার সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে—তুমি বেঁকলেই সমস্ত বই বেফাঁস। ঐটেই বেশ ভালো করে করতে হবে। পার্টে তোমার নাম মালতীমালা—জালন্ধরের রাজার একমাত্র মেয়ে। তুমি রাজকুমারী।'

সরলা অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল—গলা যেন শুকিয়ে আসছে। জেগে-জেগে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে চেয়ে ও স্বপ্ন দেখছে। ওর সমস্ত জীবনের সঙ্গে বেখাপ্পা এই মুহূর্ত ক'টি যেন সুমধুর মদিরায় ভিজে গেছে। ও রাজকুমারী।

রমেশ একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

সরলা চেয়ারে না বসে ঘরের একটি কোণে মাটির ওপর তেমনি বসেছে—দেয়ালে পিঠ রেখে। নিমাই বই নিয়ে এল। পাতাগুলি উল্টোতে উল্টোতে

কাছে এসে বললে, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোমার প্রথম আবির্ভাব—স্টেজে তুমি আর আমি। দুজনে প্রগাঢ় প্রেম হচ্ছে। মাঝের দৃশ্যটাতে তুমি আমার প্রেমে সন্দিহান হবে—শেষ দৃশ্যে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে ছুরি নিয়ে মারতে আসবে—কিন্তু -'

ও-ঘর থেকে রমেশ হেঁকে উঠল, 'নিমাই।'

নিমাই বললে, 'যাই ··কিন্তু আমাকে, আমাকে কি করে মারবে তুমি? কে আমার নাগাল পায়? তোমাকে পেয়ে সরলা, সত্যিই আমার র‍্যাক্টিং খুলে যাবে, পিপের মতো মোটা চমৎকারিণীর সঙ্গে স্টেজে প্রেম করাও একটা প্রকাণ্ড দুর্ভোগ। ওর দু'পল্লা গলার চামড়া দেখলে ভয়েই আমার গলা কাঠ হয়ে আসে—প্রেমের বুলি বেরুবে কি ছাই। তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। এমনি একটি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম—দুটি চোখে এমনি একটা লজ্জা—তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে সমস্তগুলি সিন যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠবে—গানের মতো, ছবির মতো।'

সরলার দু চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে এসেছে—নিমাইর প্রতি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধায় ও স্নেহে ওর মুখের সমস্ত রেখাগুলি কোমল কমনীয় হয়ে এল। কিছুই বলতে পারল না, খালি একটি সপ্রেম কুণ্ঠায় নিমাইর মুখের দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

ও ঘর থেকে রমেশবাবুর আরেকটা বিকট আওয়াজ আসতেই নিমাই তাড়াতাড়ি বইখানা সরলার কোলের ওপর ফেলে পিঠ দেখাল।

চমৎকার ছেলে এই নিমাই। উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। ছিপছিপে পাতলা চেহারাটা, টানা-টানা চোখ, কথায় যেন মধু ঢালা। এর সঙ্গে প্রেম করবার সময় স্টেজে দাঁড়িয়ে কি-কি কইতে হবে জানবার জন্য সরলা তাড়াতাড়ি বইয়ের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য খুলে বসল। একটু কষ্ট করে-করে পড়তে লাগল—চমৎকার।

প্রথমেই মালতী অর্থাৎ সরলা বলবে: 'কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে—জোৎস্নায় আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে। পিকগণ কলরব করছে—ফুলের গন্ধে, আকাশের নীলিমায় এত মধু! চলো উদ্যানে যাই।'

তারপর হিরণকুমার ওরফে নিমাই বলবে: 'উদ্যান? ছার উদ্যান—এ গৃহই আমার আকাশ, আমার স্বর্গ, মালতী! তোমার মুখখানি আমার চাঁদ,

তোমার কণ্ঠস্বরে লক্ষ পিকের কুহরণ, তোমার দুটি পরিপূর্ণ অধরের রঙিন পেয়ালায় রঙিন মদিরা !...'

সরলা আর পড়তে পারে না, আবেশে সমস্ত গা অবশ হয়ে আসে। কে যেন ওর দিকে দুটি সকম্প সাগ্রহ বাহু বিস্তার করে দিয়েছে—কার কণ্ঠস্বরে যেন স্নেহপূর্ণ কাতর কাকুতি। শুধু কথার মধ্যে যে এত মাদকতা থাকতে পারে সরলা কি তা জানত ? নিমাই—নিমাই ওকে এই সব বলবে ?

তার পরে—

খাওয়া-দাওয়ার পর রিহার্সেল শুরু হল।

দি ইয়ং ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল পার্টির প্রোপ্রাইটার, ম্যানেজার ও প্রধান অ্যাক্টর—সমস্তই রমেশবাবু। এমন কি জালন্ধর-পতন নাটকের লেখকও স্বয়ং উনিই। লোকটি চৌকস।

যাই হোক, শুরু হল রিহার্সেল। সবারই পার্ট তৈরি—দু বছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে জালন্ধর-পতনেরই অভিনয় চলেছে। তাই সমস্ত দিন-রাত্রি ভরে শুধু সরলার পার্টেরই মহড়া দিতে হবে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য : সরলা আর নিমাই। দূরে চাঁদ, কাছে নদী—দৃশ্যের পৃষ্ঠপট।

সমস্ত রাজ্যের লজ্জা এসে সরলাকে গ্রাস করেছে। দুবার তিনবার চেষ্টা করে সরলা যা বললে তার আর তুলনা হয় না। স্বাভাবিক লজ্জায় ওর কণ্ঠস্বরে একটি অস্ফুট কোমলতা এসেছে, তা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সমবেত অভিনেতার তারিফ শুনে সরলার মন গভীর আনন্দে স্নান করে উঠল—জীবনের এই আনন্দের আস্বাদ যিনি ওকে প্রথম দিলেন, ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে সেই কৃতার্থবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নেয়—রমেশবাবু, নিমাইবাবুরও।

আর নিমাই। এই দু বছরের মধ্যে নিমাই আর কখনো এত ভাল অভিনয় করেনি।

রমেশ সরলাকে মোশন দেখিয়ে দেয়, উচ্চারণের তারতম্য শেখায়, স্টেজে চলা-ফেরার ভঙ্গিতে সড়ুত করবার চেষ্টা করে। সরলা ঠিক-ঠিক শিখে নেয়—যেখানে যেটুকু ভুল করে সেই ভুলটুকুই যেন সবার চোখে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

কৃতার্থ বলে, 'কেয়াবাৎ! এই ঠিক।'

একেবারে একটি আনকোরা মেয়ের পক্ষে এমন স্টেজ-ফ্রি হয়ে অভিনয় করে যাওয়া—সবাই প্রশংসাসূচক বলাবলি করে। ততই সরলার মনে একটা আত্মবিশ্বাস আসে, তেজ আসে, নিমাই-এর প্রতি ওর সত্যিকার স্নেহ যেন ততই একটা প্রকাশ পাবার আশা করতে থাকে।

এই এক সিনেই সরলা দাঁড়িয়ে গেছে।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার সরলার অভ্যুদয়; এবারে অন্য প্রকার মনোভাব নিয়ে। মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর সঙ্গে হিরণকুমারের প্রেম হয়েছে মনে করে মালতীর ক্রূর সন্দেহ, আহত অভিমান।

মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর ভূমিকায় যে নেমেছে সে রোগা, চিমসে—তার দিকে তাকালে সরলার রাগের চেয়ে করুণাই বেশি হয়।

সে সিনটাও কোনো রকমে উৎরে গেল—চলনসই।

এবারে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। রমেশবাবু কলমের খোঁচা মেরে এই দৃশ্যটিকে একেবারে জমজমাট করে তুলেছেন—সব দৃশ্যকে টেক্কা মেরেছে এ।

কিন্তু এই সিনটিতে এসে সরলা হাঁপিয়ে পড়ল। কিছুতেই পারল না ফোটাতে।

এই সিন-এ মালতী হিরণকুমারকে হত্যা করবার জন্য হাতে বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ করবে—চোখে জ্বলবে দীপ্তি, অধরে কুটিল হিংসা, ক্রোধে সমস্ত দেহ যেন একটি লালায়িত বহ্নিশিখা। সরলা কিছুতেই মুখে-চোখে সেই দৃপ্তভাব আনতে পারেব না, মুখখানি তেমনি সুকোমল ও সুকুমারই থেকে যায়।

ছুরি তোলাটিও ঠিক হয় না।

কৃতার্থ অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বলে, 'না, হল না। আমাদের চমৎকারিণী এ-জায়গাটা কি চমৎকার করত!'

নিমাই প্রতিবাদ করে, 'প্রথম দিনে চমৎকারিণীর সাধ্যি ছিল না এমন উৎরোয়। দু পাঁচবার দেখিয়ে দিলে সরলা চমৎকারিণীর ওপর ডবল প্রমোশান পাবে।'

রমেশবাবু সরলাকে দেখিয়ে দেয়, গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে মুখে একটা বিকটতা আনে, কণ্ঠস্বরকে হেঁড়ে করে তোলে—সরলা অনুকরণ করে বটে, কিন্তু মুখে কিছুতেই সে দৃঢ়তা আসে না। ওর নিটোল চিবুকটিই ওর মুখের

এই কৃত্রিম অমানুষিক বস্তুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,—ওর দুটি চোখের সেই ব্রীড়ার কুয়াশা কিছুতেই কাটে না, কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয় বটে, কিন্তু তার মৃদুতা ঘোচে না। হাতে ছুরি নয়, যেন ফুলের মালা নিয়ে এসেছে।

কৃতার্থ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'হবে না। কিন্তু এ-সিনটাই সব—একে মার্ডার হতে দিলে প্লে-ই ফক্কা। এখানে চমৎকারিণীর কি আশ্চর্য রকম ডেলিভারি ছিল।'

রমেশও হাল ছেড়ে দেয়। সরলার মুখ এতটুকু হয়ে আসে।

সরলা ঢোঁক গিলে বলে, 'একদিনেই কি আর হয়? আভ্যাস তো নেই—কালকেই দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে।'

নিমাই সায় দিয়ে ওঠে, 'নিশ্চয়ই। একদিনে ওর পার্টসের যা প্রমাণ পাওয়া গেল, 'কোচিং' পেলে চমৎকারিণী তো ছার, প্রভা ওর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আচ্ছা, তার পরেরটুকু হোক।'

সরলা উৎসুক হয়ে প্রম্প্‌ট্‌ শুনতে লাগল—এর পরে কি আছে।

মালতীমালা প্রথমে তো ছুরি উঁচিয়ে হিরণকুমারকে খুন করতে এল—এসে খুব খানিকটা স্বগত উক্তি করে যেই সত্যি-সত্যি ঘুমন্ত হিরণকুমারকে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে যাবে, দেখবে—হিরণকুমার আগেভাগেই বিষ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তখন মালতীর কী সে অনুশোচনা।—ছুরি ফেলে দিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কী কান্না সে—হিরণকুমারের বুকের ওপর লুটিয়ে-লুটিয়ে।

সেই কান্নার মধ্যেই যবনিকা-পতন।

নিমাইর মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললে—চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিমাইর কোঁকড়ানো চুলগুলি নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল ক'টির কী সে আদর, যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো সমস্ত হৃদয় গলে পড়ছে।

নিমাই চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে সরলার কোলের কাছে মাথাটা রেখে মড়ার মতো পড়ে আছে। সরলার কান্না শুনে ওর নিজেরও চোখ ভিজে উঠেছে। খালি ওর সেই দিদির কথা মনে পড়ে, যিনি ওর অসুখের সময় প্রাণপণ সেবা করেছিলেন সেবার।

সরলার কান্না ও কাকুতি শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। একজন বললে, 'অডিয়েন্স-এর বুক ফেটে যাবে।'

খালি কৃতার্থই সর্বান্তঃকরণে মানতে চায় না। বলে, 'বুক তো ফাটবে,

কিন্তু এর খানিক আগে যে ছুরি-হাতে দেখে হেসেই বুক ফেটে গেছে। ফাটা বুক আবার ফাটে কি করে ?'

সেই লোকটা বললে, 'তবে ফাটা বুক জোড়া লাগবে, কৃতার্থবাবু।'

প্রম্পট্ করতে করতে রমেশ এতক্ষণ ভাবছিল—জালন্ধর-রাজের পার্ট ছেড়ে হিরণকুমারের পার্টেই নেমে যাবে কি না! বললে, 'কিন্তু এই দেখো চমৎকার মানিয়ে যাবে, কৃতার্থ!'

'তা মানিয়ে নিতেই হবে এক রকম করে। কিন্তু চমৎকারিণী কি সুন্দর করে যে কনট্রাষ্টটা ফুটিয়ে তুলত। পড়ল জ্বরে—'

রমেশ তাড়াতাড়ি বললে 'ওকে ওষুধ-পথ্য দিয়েছিস তো রে নেমা! সন্ধ্যে হয়ে গেছে যে।'

নিমাই ওষুধ-পথ্য নিয়ে ও-ঘরে গেল। চমৎকারিণী বিছানায় শুয়ে ধুঁকছে। জ্বরটা একটু কমেছে বিকেলের দিকে। উঠে বসে কান খাড়া করে সরলার রিহার্সেল শুনছিল।

বললে, 'কে নিয়েছে মালতীর পার্ট?'

নিমাই উদাসীনের মতো বললে, 'চিনি না।'

চমৎকারিণী বললে, 'পারছে না বুঝি। বোকার মতো হাপুস-হুপুস কি রকম কাঁদছিল, একলা হাসতে-হাসতে আমার কোমরে ব্যথা ধরে গেছে—'

নিমাই চটে উঠে বললে, 'তোমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো করে। ওকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছি—'

'বটে? হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছ? খাব না আমি ওষুধ, ডাকো রমেশবাবুকে।'

'ডাকছি।' বলে নিমাই সরে পড়ল।

রাত বাড়ছে।

এক থালা খাবার ও এক-পেয়ালা চা দু হাতে করে নিমাই সরলার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, খেয়ে নাও খানিকটা।'

সরলা অল্প একটু হেসে বললে, 'আপনার মুখও তো শুকনো, আপনিও খান।'

'আমি খাব'খন।'

'আপনি না খেলে আমি খাব না।'

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুজনে খাবারের থালাটা শেষ করল।

রমেশ ডাকলে, 'নিমাই!'

নিমাই তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা সরলার হাতে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'যাই।'

রমেশ সরলার হাতে আবার একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে। বললে, 'গাড়ি ডেকে দি?'

সরলা বললে, 'দরকার হবে না।'

'কালকে ঘুম থেকে উঠেই এসো। এখানেই খাবে-দাবে। বুঝলে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সরলা একা পথে বেরিয়ে পড়ল।

বাবলা গাছটার বাঁক ঘুরতেই সরলা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিমাই। বললে, 'গাড়িতে উঠে এসো, সরলা।'

সরলা আপত্তি করল না। গাড়ি খালের দিকে গড়ালো।

দুজনে মুখোমুখি বসেছে। নিমাই বললে, 'তোমার দিকে টেনেছিলাম বলে চমৎকারিণী ফণা তুলে আছে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি সরলা, তুমি না থাকলে আমি কক্ষনোই এবারে প্লে করব না, ডাঙার কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারব ওদের।'

সরলা যেন সমুদ্রের কূল দেখে, গর্বে, সুখে ওর বুক ডগমগ করে ওঠে।

নিমাই পকেট থেকে সিগারেট বার করে বলে, 'খাবে?'

সরলা সিগারেটটাই খায়, তবু বলে, 'না।' নিমাইর সামনে ওর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে না।

নিমাইও খায় না। বলে, 'ঐ সিনটাতে খুন করতে আসাটাই বড় নয়, ভালোবাসার লোককে মরে গেছে দেখে ছুরি ফেলে আর্তনাদ করাটাই বড় কথা। কার্টেন্ পড়বার সময় লোকের মনে খালি তোমার ঐ কান্নাই ঘুরে বেড়াবে—চোখের জলে ভেজা তোমার মুখখানিই তাদের চোখের তারায় আঁকা থাকবে।'

সরলা বলে, 'আপনি, পৃথিবীতে আর নেই, এ-কথা মিথ্যি-মিথ্যি করে ভাবলেও আমার কান্না পায়।'

কিন্তু কথাটা শেষ করতে না করতেই সরলার ভারি লজ্জা পেল।

নিমাই ভাবে—সরলার ঐ আঙুল কটি আবার নিজের চুলের মধ্যে রাখে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরবার পর্যন্ত সাহস হয় না। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

থালের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সরলা নিজেই কবাট খুলে নেমে পড়ে। বলে, 'আসবেন ?' কিন্তু বলেই মনে মনে পীড়িত হয়ে ওঠে।

নিমাই বলে, 'কৃতার্থবাবু ওরা তোমাকে অপমান করেছে, কিন্তু তার শোধ আমি নেব। আচ্ছা, যাই—'

নিমাই গাড়োয়ানকে বললে, 'শহরটার খানিক এদিক-ওদিক ঘোরো। ডবল ভাড়া পাবে।'

এবারে সিগারেট ধরায়।

সরলা ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে,—গাড়িটা যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার পর্যন্ত হুঁশ নেই।

ভেতরের দাওয়ায় পা দিতেই বাড়িউলি খ্যা খ্যা করে উঠল, 'বলি, সরি এসেছিস ? তুই কেমনতরো মানুষ লো, ছুঁড়ি ! সারা দুপুর-সন্ধে টো টো করে বেড়াবি, আর এখেনে যত রাজ্যের লোক এসে মুখ-খারাপ করে যাবে ?'

সরলা যেন গাড়ি থেকে এবারেই সত্যি নেমে আসে। ওর গতানুগতিক কদর্য বিরস জীবন ওর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। ফুলশয্যার ওপর কে যেন এক বোতল মদ ঢেলে দেয়,—ওর গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

বলে, 'কি হল বাড়িউলি দিদি ?'

'কি হল ? সেই অপূর্ব ছোঁড়া বিকেলের দিকে এসেছিল কতকগুলো চেলা জুটিয়ে। তোকে ঘরে না-দেখে কি কেলেঙ্কারিটাই না করে গেল ! আমার থেকে তিন-চার পাঁইট করে দিশি-বিলিতী চেয়ে নিয়ে গেলে বমি করে গালাগালি দিয়ে জিনিসপত্র ছত্রকট করে নষ্ট দিলে—একটি পয়সা দিয়ে গেল না। বললে, সরি দেবে।'

সরলা ক্ষেপে ওঠে, 'হ্যাঁ, সরিই ত দেবে। কেন ? সরি কি ওর জুতোর সুখতলা নাকি ? খালি-বোতলগুলো ওর মুখের ওপর ছুড়ে মারতে পারলে না ? এবারে আসুক না, ঝ্যাঁটাপেটা করে যদি না তাড়াই ত আমি বামুনের মেয়ে নই।'

বাড়িউলি বলে, 'বামুনের মেয়ে বলে আর দেমাক করিসনি ছুঁড়ি। কেন বাড়ি থাকবিনে শুনি ? বাঁধা লোকের টাকা খেয়ে আবার তার ওপরে চালবাজি ! কেন সে গালাগাল করবে না ?'

সরলা বলে, 'রেখে দাও, অমন লোক বাজারে কাণা-কড়িতে বিকোয়। ও রকম বাবু আমার চাইনে। আমি কালই এ বাড়ি থেকে সরে পড়ব।'

'থেটার-ফেটারের কথা সব তার কানে উঠেছে। বলেছে,—থেটারে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর তোর মুণ্ডুটা আস্ত রাখবে না।'

'তার হয়ে তুমি লড়তে এসো না, বাড়িউলি-দিদি। আসুক সে, দেখি তার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা! তার মুখে যদি নোড়াটা আমি না ঘষি ত কি বলেছি। কত টাকার মদ খেয়েছে সে? কত টাকা পেলে তুমি গলা থামাবে?' বলে সরলা আঁচলের খুঁট থেকে নোটটা বাড়িউলির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

সব ঘর নোংরা, জিনিসপত্র এলোমেলো, কাচের জাগ গ্লাস ভাঙা, ট্রে-টা উল্টানো, কোথা থেকে একটা উৎকট গন্ধ আসছে। সরলা অন্ধকারে থমকে রইলো—দেশলাই জ্বালাবার পর্যন্ত যেন সামর্থ্য নেই।

বুকের মধ্যে সরলা যে গানের সুরটি নিয়ে এসেছিল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ও যেন আবার নবককুণ্ডে এসে পড়েছে, যেখানে সেই অটল আর সরলা, যেখানে না আছে মালতী, না বা হিরণকুমার।

সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে খালের পারে এসে দাড়ালো।

পরে কি ভেবে আবার ঘরে গেল, ল্যাম্প জ্বালাল—কোমরে কাপড় জড়িয়ে বালতি করে জল এনে ঘর সাফ করতে বসল।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নিমাইর মাথাটি কোলে নিয়ে যে-হাত দিয়ে ওর কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে, সেই হাতে ঘৃণ্য অটলের বমি নিকোতে হচ্ছে ভেবে ওর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগলো। ও সত্যিই আর এখানে থাকবে না, থিয়েটারে ভিড়ে যাবে—যে থিয়েটারে হিরণকুমার আছে, যে-থিয়েটারে মৃত বন্ধুর উদ্দেশে কৃত্রিম শোক করতে গিয়ে সত্যি-সত্যিই কান্না পায়।

ভূতি ঘরে এল। বললে, 'আজ কি হল রে, সরলা?'

সরলা বললে 'কত। কত বড়ো শক্ত পার্ট যে হাতে নিয়েছি, সে দেখবি গিয়ে। স্টেজে খুন করতে হবে—'

ভূতি ভয়ে আঁতকে ওঠে, সরলাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বলিস কি লো?'

সরলা হেসে অভয় দিয়ে বলে 'সত্যি-সত্যিই কি আর খুন করব নাকি বোকা মেয়ে! পুলিশ নেই? খুন করতে যাব খাঁড়া উঁচিয়ে, এম্‌নি করে—চেয়ে ছাখ, এমনি দাঁত খিঁচিয়ে—ছাখ ত ঠিকমতো হচ্ছে কি না—'

ভূতি অত-শত বোঝে না, বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে—তার পর কি হবে?'

রসবোধের চেয়ে ভূতির কৌতূহল বেশি।

'তার পর যেই খাঁড়া চালাতে যাব, দেখব হিরণকুমার আগেই বিষ খেয়ে ভবলীলা ঘুচিয়েছে। তারপরে অস্তর ফেলে দিয়ে তার মাথাটা কোলে নিয়ে কাঁদব।' বলতে-বলতে সরলার চোখে ব্যথার কুয়াশা ঘনিয়ে আসে।

সরলা ভূতিকে ফের অভয় দেয়, 'সেই হিরণকুমার সত্যিই বিষ খাবেনা রে, পরে পর্দা পড়ে গেলে জেগে উঠবে।...আমাকে খাবার খাইয়ে দিলে, গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলে,—ভারি সুন্দর ছেলেটি, ভাই। মনের মতো। দেখিস এখন।'

দোর-গোড়ায় কে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়ালো,—ঝি-মাসির ছেলে, হরি। হরি বললে, 'আমাকে আর মাকে সত্যি-সত্যি মাগনা থেটার দেখাবে, সরলা-দি?'

সরলা হাসিমুখে বললে, 'দেখাবো। যাস তোরা।'

হরি খুশিতে উছলে পড়ে বললে, 'তোমাদের হয়ে গেলে দেখো আমরাও একটা থেটার করব বাবুতলার মাঠে। কাগজ দিয়ে সব ভীমের গদা বানিয়েছি, বাঁশের ধনুক। সেদিন তোমাদের নিয়ে যাবো। দেখবে—'

ছুটতে-ছুটতে চলে গেল।

ঐ সামান্য দু'টি মিষ্টি খেয়েই সরলার পেট ভরে আছে। ঝিকে বিদায় করে দিল।

পাড়াটা নিরিবিলি হয়ে এসেছে। সরলা দোর বন্ধ করে দিয়ে ওর ছোট্ট আয়নাখানি বেড়ার গায়ে মানানসই করে লাগিয়ে ছুরির অভাবে চিরুনিটাই ছুরির মতো বাগিয়ে নিজের মনে শেষ দৃশ্যের মহড়া দেয়। আয়নায় সমস্ত মুখের ছায়া পড়ে না দূর থেকে, যেটুকু পড়ে তাতেই ও ওর মুখের চেহারার আন্দাজ নিতে পারে। যতই ও ওর মুখ রুক্ষ কর্কশ বলদৃপ্ত করতে চায়, ততই ওর মুখের শীর্ণতা বীভৎসতর হয়ে উঠতে থাকে। গাম্ভীর্যের সঙ্গে হিংসার কাঠিন্য মেশাতে পারে না—তাই দেখায় কুৎসিত, হাস্যকর!

কি করে যে মানিয়ে নেবে ভেবে উঠতে পারে না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা ছেঁড়া বালিশ কোলে নিয়ে পার্টের বাকি অংশটুকুর মহড়া দেয়—বালিশকে ভাবে হিরণকুমার; তার জন্য রাত করে সরলা অনর্থক অশ্রুবর্ষণ করে।

এমন সুন্দর করে সরলার জীবনে ভোর হয়নি! ভোরবেলাটি ওর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন লাগছে।

ঘুম থেকে উঠে সরলা ভাবছে, কে যেন ওর কাছে আসবে আজ। নিমাইকে ত ও আসতে বলে দেয়নি। কিন্তু না বলে দিলে কি আসতে নেই? অটলকে তাড়িয়ে দিলেও ত সে আসে।

বেলা বেড়ে চলে, কিন্তু সরলার ভারি খালি-খালি লাগে। অদূরে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলেই ওর বুক আশায় দুলে ওঠে। কিন্তু পরে ভাবে,—ওর কাছে আসবার এই একটিই ত সদর রাস্তা নয়,—শুধু গাড়িই ত তার বাহন নয়,—সে এসেছে তার ঘুমের মধ্যে, অজানতে ঘুম ভাঙার মধ্যে, মনের গোপন খিড়কির দুয়ার দিয়ে।

যে আসবে না, তার জন্যে এমনি অনর্থক প্রতীক্ষা করে থাকবার মধ্যে যে দুঃসহ সুখ আছে, সরলা কোনোদিন তা জানত না।

রোদ উঠতে না উঠতেই সরলা বেরিয়ে পড়লো।

নিমাইকে কাছে পেয়ে সরলা শুধোল, 'ভেবেছিলাম সকালবেলা আসবেন।'

নিমাই বললে, 'ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে-করতেই সব গরমিল হয়ে যায়। আজ থেকেই স্টেজ-রিহার্সেল শুরু হবে। তোমার প্রবেশ-প্রস্থানগুলি ঠিক করে নিতে হবে। মুখস্থ হয়েছে?'

সরলা বললে, 'একটু-একটু হয়েছে।'

'ম্যানেজার বলেছিল, পার্টটা তোমাকে লিখে দিতে,—আমার হাতের লেখা ত আর বুঝবে না ছাই, তাই আমার বইখানাই তুমি নাও।'

বলে নিমাই পকেট থেকে ছেঁড়া জালন্ধর-পতন বইখানি সরলার হাতে গুঁজে দিল।

নিমাই বললে, 'দেখো, আজ আরো ভালো হবে। তোমার হাতের আদর পাবার জন্য আমার কপালটা নিসপিস করছে। তোমার কান্না শুনলে আমার মন কেমন করে ওঠে।'

সরলার ঠোঁট দুটি শুধু একটু কাঁপে।

স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে,—বেড়া ও টিন দিয়ে চারিদিকে ঘেরা, পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ফুটো করে উঁকি দিতে চায়, আর কে ওদের সব ভাগিয়ে

দিতে থাকে। ঐখানে গানের আর নাচের মহড়া চলেছে,—এ পারে য়্যাক্টিং—ঐখানে সিন পেন্টিং, সিন শিফটিং চলেছে।

সমস্ত বাড়িটা হৈ হৈ করছে, যেন একটা উৎসব!

সরলা সব ভুলে যায়—খালপারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হয়ে বসে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটলবাবুর বীভৎস মুখ। ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধি লাভ করে। আকাশকে আজ ওর খুব বড়ো লাগে,—সমস্ত অবকাশ পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়, ও সত্যিই রাজকুমারী। ওর ভাগ্য দোষে, প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে,—ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কি সুন্দর ব্যাখ্যা! সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘোচায়, ও নতুন করে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।

শুধু দুটি দিনের জন্যেই। তা হোক্।

আজ ভোরে চমৎকারিণীর জ্বর ছেড়েছে। শরীর দুর্বল বটে, কিন্তু অচল নয়—গড়াতে-গড়াতে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসে। অভিনয় সম্বন্ধে টিপ্পনীর তার আর শেষ নেই। কৃতার্থময় পেছনে দাঁড়িয়ে চমৎকারিণীর টিপ্পনীরই তারিফ করে।

রমেশ বলে, 'তুমিই আজ থেকে প্রম্পট করো হে, মধুসূদন। তোমারই ত কাজ।'

মধুসূদন বই হাতে করে।

আজকে একেবারে গোড়াগুড়ি থেকে। তৃতীয় অঙ্ক পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বারোটা বাজে।

শুরু হল তৃতীয় অঙ্ক। সরলা মাৎ করে দিল।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আসতেই সরলার আর হয়ে ওঠে না, মারবার সময় এমন একটা ভাব হয়, যেন খুব শক্ত একটা দড়ির গেরো খুলছে মাত্র—খুন করতে আসছে না। মুখ কিছুতেই কুঞ্চিত কর্কশরেখাসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে না। একটা বিশীর্ণ দৈন্য ফুটে ওঠে শুধু।

চমৎকারিণী মুখ টিপে-টিপে হাসে। কৃতার্থ তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাসির সুর সপ্তম গ্রামে তুলে দেয়। বলে, 'হবে না রমেশবাবু। লুডিক্রাস্!'

এমন সুন্দর করে সরলার জীবনে ভোর হয়নি! ভোরবেলাটি ওর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন লাগছে।

ঘুম থেকে উঠে সরলা ভাবছে, কে যেন ওর কাছে আসবে আজ। নিমাইকে ত ও আসতে বলে দেয়নি। কিন্তু না বলে দিলে কি আসতে নেই? অটলকে তাড়িয়ে দিলেও ত সে আসে।

বেলা বেড়ে চলে, কিন্তু সরলার ভারি খালি-খালি লাগে। অদূরে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলেই ওর বুক আশায় দুলে ওঠে। কিন্তু পরে ভাবে,—ওর কাছে আসবার এই একটিই ত সদর রাস্তা নয়,—শুধু গাড়িই ত তার বাহন নয়,—সে এসেছে তার ঘুমের মধ্যে, অজানতে ঘুম ভাঙার মধ্যে, মনের গোপন খিড়কির দুয়ার দিয়ে।

যে আসবে না, তার জন্যে এমনি অনর্থক প্রতীক্ষা করে থাকবার মধ্যে যে দুঃসহ সুখ আছে, সরলা কোনোদিন তা জানত না।

রোদ উঠতে না উঠতেই সরলা বেরিয়ে পড়লো।

নিমাইকে কাছে পেয়ে সরলা শুধোল, 'ভেবেছিলাম সকালবেলা আসবেন।'

নিমাই বললে, 'ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে-করতেই সব গরমিল হয়ে যায়। আজ থেকেই স্টেজ-রিহার্সেল শুরু হবে। তোমার প্রবেশ-প্রস্থানগুলি ঠিক করে নিতে হবে। মুখস্থ হয়েছে?'

সরলা বললে, 'একটু-একটু হয়েছে।'

'ম্যানেজার বলেছিল, পার্টটা তোমাকে লিখে দিতে,—আমার হাতের লেখা ত আর বুঝবে না ছাই, তাই আমার বইখানাই তুমি নাও।'

বলে নিমাই পকেট থেকে ছেঁড়া জালন্ধর-পতন বইখানি সরলার হাতে গুঁজে দিল।

নিমাই বললে, 'দেখো, আজ আরো ভালো হবে। তোমার হাতের আদর পাবার জন্য আমার কপালটা নিসপিস করছে। তোমার কান্না শুনলে আমার মন কেমন করে ওঠে।'

সরলার ঠোঁট দুটি শুধু একটু কাঁপে।

স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে,—বেড়া ও টিন দিয়ে চারিদিকে ঘেরা, পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ফুটো করে উঁকি দিতে চায়, আর কে ওদের সব তাড়িয়ে

দিতে থাকে। ঐখানে গানের আর নাচের মহড়া চলেছে,—এ পারে র‍্যাক্‌টিং—ঐখানে সিন পেন্টিং, সিন শিফটিং চলেছে।

সমস্ত বাড়িটা হৈ হৈ করছে, যেন একটা উৎসব!

সরলা সব ভুলে যায়—থালপারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হয়ে বসে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটলবাবুর বীভৎস মুখ। ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধি লাভ করে। আকাশকে আজ ওর খুব বড়ো লাগে,—সমস্ত অবকাশ পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়, ও সত্যিই রাজকুমারী। ওর ভালোবাসে, প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে,—ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কি সুন্দর ব্যাখ্যা! সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘোচায়, ও নতুন করে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।

শুধু দুটি দিনের জন্যেই। তা হোক্।

আজ ভোরে চমৎকারিণীর জ্বর ছেড়েছে। শরীর দুর্বল বটে, কিন্তু অচল নয়—গড়াতে-গড়াতে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসে। অভিনয় সম্বন্ধে টিপ্পনীর তার আর শেষ নেই। কৃতার্থময় পেছনে দাঁড়িয়ে চমৎকারিণীর টিপ্পনীরই তারিফ করে।

রমেশ বলে, 'তুমিই আজ থেকে প্রম্পট্ করো হে, মধুসূদন। তোমারই ত কাজ।'

মধুসূদন বই হাতে করে।

আজকে একেবারে গোড়াগুড়ি থেকে। তৃতীয় অঙ্ক পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বাজে।

শুরু হল তৃতীয় অঙ্ক। সরলা মাৎ করে দিল।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আসতেই সরলার আর হয়ে ওঠে না। মারবার সময় এমন একটা ভাব হয়, যেন খুব শক্ত একটা দড়ির গেরো খুলছে মাত্র—খুন করতে আসছে না। মুখ কিছুতেই কুঞ্চিত কর্কশরেখাসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে না। একটা বিশীর্ণ দৈন্য ফুটে ওঠে শুধু।

চমৎকারিণী মুখ টিপে-টিপে হাসে। কৃতার্থ তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাসির সুর সপ্তম গ্রামে তুলে দেয়। বলে, 'হবে না রমেশবাবু। লুডিক্রাস্!'

রমেশ বলে, 'হবে না বললেই ত হয় না। এ নিয়েই চালিয়ে দিতে হবে আপাতত।'

চমৎকারিণীর হাসি কিছুতেই থামে না। যেন মদের পিপের মুখ ছুটে গেছে, তার থেকে ফেনিল উচ্ছ্বাস উঠছে।

নিমাই একেবারে রুখে ওঠে; বলে, 'চোখের সামনে অমনি হাসলে কে পার্ট করতে পারে? রইল আপনার থিয়েটার। চলে এসো, সরলা!'

সরলা আয়ত চোখ মেলে নিমাইর দিকে তাকায়। ওর অপমানের বেদনা স্নেহে সুশীতল হয়ে ওঠে।

রমেশ হাঁকে, 'নিমাই! এ কি অন্যায় কথা তোর! পরের সমালোচনা কি করে বন্ধ করবি? এগিয়ে এসো সরলা, আবার চেষ্টা করো। অমন হাসাহাসি কোরো না, চমৎ! আমাদের এ-ই চালিয়ে নিতে হবে। জ্বরে পড়েই ত তুমি সব বিতিকিচ্ছি করে দিলে।'

'বিতিকিচ্ছি?' নিমাই ফের প্রতিবাদ করে: 'সরলার সমস্ত শরীরে প্রেমের যে একটি সহজ লীলা ও পেলবতা আছে তা চমৎকারিণীর কোথায়? ওর স্বরে আপনি-থেকে একটি স্নেহের সুর আছে,—কেমন চমৎকার মানায় ওকে! চমৎকারিণীকে খুনের পার্টেই বেশি খোলে, কিন্তু সরলা যেন মূর্তিমতী সরলা। আপনার বই থেকে ঐ খুনের অংশটুকু কাটা-প্রুফের মতো বাদ দিন।'

রমেশ এ-সব কথা কানেই তোলে না। আবার পার্ট চলে। সরলা আবার ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

পরেরটুকু আর আসে না। নিমাই বলে, 'ও যেমনি হচ্ছে হোক, বাকি-টুকুতে কেঁদে সরলা আগের সমস্ত ত্রুটি ধুয়ে নিয়ে যাবে। দেখেছেন, একদিনে কেমন মুখস্থ করে ফেলেছে? চমৎকারিণীর লেগেছিল পুরো একটি বছর।'

চমৎকারিণী চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাকে এমনি ধারা অপমান করলে আমি আজই চললাম কলকাতায় ফিরে।'

কৃতার্থ চেঁচিয়ে ওঠে, 'মুখ সামলে, নিমাই।'

ঝগড়ার সম্ভাবনাটা কাটিয়ে ওঠবার জন্য রিহার্সেলটা খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে।

রাত্রে সরলাকে গাড়ি করে এগিয়ে দিতে-দিতে নিমাই বললে, 'আমার যদি অনেকগুলি টাকা থাকত, তবে তোমাকে নিয়ে নতুন এক টা থিয়েটার খুলতাম। তোমাকে কো-য়্যাক্‌ট্রেস্ পেয়ে সত্যিই আমার ভেতরে একটা আবেগ

আসে,—কাউকে দিয়ে খুব মিষ্টি করে একটা প্রেমের গল্প লিখিয়ে নিতাম !'

সরলা হেসে বলে, 'আপনি নিজেই ত পারেন। পরকে খোশামোদের দরকার হয় না।'

একটুখানি মাত্র পথ—এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে যায়। সরলার ইচ্ছা করে নিমাইকে ঘরে নিয়ে যায়, নিজ হাতে রেঁধে ওকে কিছু খাওয়ায়, ফরসা চাদর বের করে ওর জন্য নিজ হাতে নতুন একটি বিছানা পেতে দেয়, ও ঘুমিয়ে পড়লে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতো ওর চুলগুলিতে আঙুল বুলিয়ে দিতে-দিতে দুটি-ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

সরলা মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে না।

ভাবে, এই বন্ধ গাড়ির মধ্যেই শুধু দুটি মুহূর্তের জন্য ওর ওই ছোট্ট ক্ষণিক সংসার—নিমাইর সঙ্গে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মালতী আর হিরণকুমার !

গাড়িটা থামলে সরলা নামে, নিমাই হঠাৎ ওর আলোয়ানটা সরলার গায়ে জড়িয়ে দেয়; বলে, 'তোমার শীত করবে না-হলে !'

সরলা আপত্তি করে না, আলোয়ানটি আরো নিবিড় করে জড়িয়ে পরিচিত ঘরে এসে ঢোকে। আজ আর কারু সঙ্গে কথা কয় না, ভূতির সঙ্গেও না। আলোয়ানটা গায়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সরলার জীবনে আরেকটি পরিচ্ছন্ন রাত্রি কাটে, ঘুম থেকে জেগে পবিত্র প্রভাতকে মনে-মনে অভিবাদন করে।

শুক্রবার। কাল প্লে। আজ ড্রেস-রিহার্সেল।

পার্ট সরলার মুখস্থ হয়ে গেছে। ওর একাগ্র মনোযোগের দরুনই তা সম্ভব হল। ছুরি-মারার ভঙ্গিটিও এক-রকম চলনসই করে এনেছে।

ও এর মধ্যে নিজের ত্রুটির ব্যাখ্যা পর্যন্ত বের করে ফেলেছে, বুঝিয়ে বলে, 'এই অবস্থায় মালতীর মুখে খুব একটা হিংস্রতা আসতেই পারে না, সেই হিংসা ও ক্রোধের সঙ্গে যে ওর একটি মমতা ও শোক মেশানো আছে—তাই তার মুখে কোমলতাটা স্বভাববিরুদ্ধ নয়।'

বলা বাহুল্য ভাষ্যকার স্বয়ং নিমাই।

সকালবেলা ছুটতে-ছুটতে হরি এসে হাজির, হাতে একখানা ছাপানো

কাগজ। সরলার দোর-গোড়ায় এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'গাড়িতে করে কাগজ বিলি হচ্ছে, সরলা-দি। আমাকে কি দেয়? বললাম—আমার সরলা-দি থেটার করবে, তখন দিলে। গাড়ির ছাতে বসে সানাই বাজাচ্ছে, আর কত লোক যে গাড়ির সঙ্গে ছুটছে, সরলা-দি! বামু ত চাকার তলায়ই পড়ে গেছল আরেকটু হলে।'

গর্বে আনন্দে সরলার বুক দুলে ওঠে। এত বড়ো একটা আনন্দব্যাপারে ওর কিছু অংশ আছে ভেবে ও ধন্য হয়ে যায়।

ভূতি কৌতূহলী হয়ে কাছে আসে। সরলা হরির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দেয়। মাঝখানে একটা ছবি আছে—তার অর্থ করে।

বলে, 'এই হিরণকুমার বিষ খেয়ে শুয়ে আছে, আর আমি এমনি ছুরি নিয়ে মারতে আসছি।'

সমস্ত নাটকের মধ্যে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে রোমহর্ষক বলে তারই ছবি ব্লক করে বিজ্ঞাপনে ছেপে দেওয়া হয়েছে।

ভূতি ও আর-সব মেয়েরা ঈর্ষায় জর্জর হয়ে সরলার পানে তাকায়। ভূতি বলে, 'কিন্তু এ ত তোর ছবি নয়—'

সরলা তা জানে। এ চমৎকারিণীর ছবি। যেন নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা, হিরণকুমারকে ও কোনোদিন ভালোবেসেছিল তার কোনো প্রমাণই তাতে পাওয়া যায় না—যেন বরাবরই ও একটা শাঁকচুন্নি। আর শুয়ে আছে নিমাই —রুখু চুল, চোখের পাতা বোজা, একখানি হাত মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে।

সরলা হেসে জবাব দেয়, 'আমার ছবি কোথায় আর পাবে বলো। এমনি একটা এঁকে দিয়েছে। আমার অমনি মোটা হলেই হয়েছিল আর কি। পার্ট থেকে নাকচ করে দিত।'

কিন্তু নিজের মনকে এই বলে বোঝায়,—অনেক দিন আগে থেকেই এগুলি ছাপা বলে মালতীর ভূমিকায় সরলার নামটা আর হয়ে ওঠেনি।

সরলা বলে, 'আজ সব পোশাক পরে রিহার্সেল হবে. এখুনি যেতে হবে।'

হরি মিনতি করে বলে, 'আমাকে টুপ্ করে কোনোখান দিয়ে আজ ঢুকিয়ে দিতে পারবে না, সরলা-দি? তোমাদের পোশাক-পরা নাটক দেখব।'

সরলা হেসে ওকে প্রবোধ দেয়, 'আজ কি, কালই ত দেখবি। খুব ভালো জায়গায় বসিয়ে দেবখন। মাকে নিয়ে যাস্।'

হরির যেন তর সয় না ; বলে, 'খুব ভালো জায়গা দেবে ? বাঃ, কেমন মজা। রামু ওরা ত জায়গাই পাবে না।'

হরি নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল।

সরলাকে এখুনিই বেরুতে হবে। ঘরে যেটুকু সময় থাকে—স্নান করা, একটু খাওয়া কি না-খাওয়া—সব সময়েই অস্ফুটস্বরে পার্ট আওড়ায়। ও এই নিয়েই আছে। ওর তিনদিন আগেকার অতীত জীবনের সঙ্গে যেন ওর কোনোই সম্পর্ক নেই —তাকে ও চেনেই না।

ড্রেস-রিহার্সেল শুরু। সবুজ রঙের শাড়ি পরে জালন্ধর-রাজকুমারী শ্রীমতী মালতীমালা ওরফে সরলাসুন্দরী যেন সবুজ মেঘের পরীর মতো পাখা মেলে এই শহরের মাটিতে নেমে এসেছে।

সরলার দিকে চেয়ে কে বলবে ও সত্যিই একগাছি মালতীর মালা নয়!

পিঠে কালো পরচুল মাটি ছোঁয়-ছোঁয়, শাড়ি-পরার ভঙ্গিটিতে কি আশ্চর্য সুষমা। হাতে আভরণ। গলায় পুষ্পহার।

আর সম্মুখে হিরণকুমার,—রাজপুত্রের বেশে। মাথায় সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা।

সমস্ত স্টেজ গমগম করে ওঠে,—ডে লাইটের সুতীব্র আলোতে পরস্পরের চোখে একটি বিহ্বল মুগ্ধতা আবিষ্কার করে দুজনে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। অভিনয় শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আবার তেমনি জোলো হয়ে আসে। কৃতার্থময় কিছুতেই সায় দেয় না, দুর্বল বলে উচ্চহাস্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চমৎকারিণী একটা বীভৎস কটু আওয়াজ করে।

নিমাই বলে, 'আর-আরদের অভিনয়ের প্যাচে কত যে গলদ থাকে তার কেউ খোঁজ করে না, এ-বেচারির ছুরি-ধরা ঠিকমতো হয় না বলেই যত হাট্টা। আপনারা ত ছাই সমঝদার, দেখবেন লোকে কি রকম নেয়।'

কৃতার্থ বলে, 'লোকে ত আর তোমার মতো গাড়োল নয়, তাদের রসবোধ বলে একটা জিনিস আছে।'

রমেশ মীমাংসার সুরে বলে, 'না না—এই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে। বেশ হবে, সরলা। তুমি একটুও ঘাবড়িয়ো না।'

রিহার্সেলের শেষে সরলা দামী পোশাক ছেড়ে তার আটপৌরে শাড়িখানি পরলে। সরলা যেন নিমাইর চোখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে!

নিমাই বললে, 'দেখবে কি রকম ভিড় হবে, হাততালিতে প্রত্যেকটি কথা ডুবে যাবে দেখো।'

সরলা মনে-মনে ছবি আঁকে,—বিপুল জনসমারোহের কূল-কিনারা করতে পারে না।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সরলা কারুর দেখা পায় না। গাড়ি নিয়ে কেউই বাবলা গাছের তলায় দাড়িয়ে নেই। সরলা ভাবে, হয়ত গাড়ি আনতে গিয়ে দেরি হচ্ছে; একটু অপেক্ষা করে, কেউ আবার পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারে না। অন্ধকারে গা ছম্‌ছম্‌ করে। এ কেমনতরো লোক, একটুও ভাবনা নেই? সরলা বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ভাবে, দোরের বন্ধ তালাটা খুলতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

নিমাইর র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে, হয়ত তক্ষুনিই নিমাই গাড়ি নিয়ে এসে ঘুরে গেছে।

রাতের মতো রাত একটা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা। ওর চোখের সমুখে রাশীকৃত লোক—সবাই হাততালি দিচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের ওর পোশাকের দিকে চেয়ে আছে। অটল যদি যায়, সেও হাঁ হয়ে যাবে, চিনতেই পারবে না। কেউ দিস্তা খানেক নোট নিয়েও আসতে পারে, ও তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে—ও হিরণকুমারের বাসনাবাসিনী প্রিয়া। তার জন্যেই ও গেরুয়া পরবে।

শনিবার। দিনের মতো দিন। পাঁজিতে এ-দিনটি যেন সরলার জন্য রিজার্ভড্‌ ছিল।

চোখ-মুখ ধুয়েই নিমাইর র‍্যাপারটি গায়ে জড়িয়ে সরলা রওনা হল থেটার-বাড়ি।

যাবার সময় ভূতিকে বলে গেল, 'দুপুরে একবার এসে পাস দিয়ে যাব তোদের।'

সরলার সুখের আজ অন্ত নেই। ওর মধ্যে এত বড়ো শক্তি প্রসুপ্ত ছিল, এত বড়ো কাজের যোগ্যতা ছিল জানতে পেরে ও গর্বে একেবারে ফুলে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করবার মতো অহঙ্কার বোধকরি আর কিছু নেই। ও এ'কদিন একটা মাতালেরো মুখ দেখেনি, ওর সমস্ত আচরণে একটি ভদ্রতা এসেছে—মনে একটি বিশ্রামের সঙ্গে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে! কত

ভালো লাগছে ওর—জীবনের বৃহৎ বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে ও ধন্য হয়েছে।

সত্যিই, আজ ও মালতীমালার মতো সন্ন্যাসিনী হয়েও যেতে পারে।

সরলা এসে পৌঁছুলো। সব ফিটফাট। সব সিজিল্-মিছিল্ হয়ে গেছে।

কিন্তু সবাই কেমন উদাসীন। সরলাকে দেখে কারু ঔৎসুক্য নেই। নিমাই কই?

রমেশবাবুকে বললে, 'আজ রিহার্সেল হবে না?'

রমেশ বললে, 'হ্যাঁ দুপুরের পরে একবার হবে—কয়েকটি সিন।'

সরলা কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

রমেশ আর যাই হোক মুখচোরা নয়, বুঝিয়ে দেয়। বলে, 'তোমাকে আর আমাদের প্লে-তে লাগবে না। চমৎকারিণী সেরে উঠেছে, সে-ই মালতীর পার্টে নামবে।'

সরলা বসে পড়লো। ওর তাসের ঘর দমকা হাওয়ায় ছত্রখান হয়ে গেল।

রমেশ আরো খুলে বললে, 'মাডারের সিনটা তোমাকে দিয়ে কিছুতেই হল না,—কৃতার্থ ওরা কিছুতেই রাজি হয় না। তা ছাড়া চমৎকারিণী ভালো হয়ে এই পার্টটা এখানে আবার করবার জন্য ভারি ঝুঁকে পড়েছে। জানই ত, ও আমাদের দলের সেরা য়্যাক্‌ট্রেস। ওকে ত আর চটাতে পারি না।'

সরলা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেমানুষের মতো। এক মুহূর্তে ও যেন একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

রমেশ বৃথা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে, 'তুমি কিছু মনে করো না সরলা। বিকেলে তুমি এসো থিয়েটার দেখতে। তোমাকে আর কয়েকটা টাকা দেবখন, থিয়েটারের পরে কিংবা কাল সকালে এসে নিয়ে যেয়ো।'

রমেশ চলে গেল।

সরলা কোথায় গিয়ে যে ওর এই কান্না লুকোবে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর কাছে পৃথিবী যেন আজ সমস্ত জায়গা খুইয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ এ-দিক ও-দিক নিমাইর খোঁজ করলে, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে পোশাকের ঘরে এল, সেখানেও নিমাই নেই। মধুসূদন বাক্স থেকে পোশাক আর চুল খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছে। কাল রাত্রে সরলা ঐ সবুজ শাড়িটা পরেছিল, আর নিমাই ঐ মুকুটটা।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে, 'নিমাইবাবু কোথায় বলতে পারেন?'

লোকটা কি কাজে ব্যস্ত ছিল ; বললে, 'জানি না।'

চট্‌ করে একটা কথা সরলার মনে পড়ে গেল,—বোধ হয় নিমাই পালিয়েছে। নিমাই ওকে বলেছিল, যদি সরলাকে শেষ পর্যন্ত না নামায়, তবে ও বেঁকে বসবে, পালিয়ে যাবে, পারের কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারবে।

ঠিক তাই। সরলাকে নামাবে না জেনে অভিমানে বেদনায় নিমাই বিবাগী হয়েছে।

সরলার মনে বল এল,—ধর্মের জয় আছেই। এই প্রবঞ্চকদের সমুচিত শাস্তি দরকার। বেশ হবে। নিমাই না থাকলে থিয়েটারই হতে পাবে না, হিরণকুমারের পার্টে আর কেউ তৈরি নেই।

নিমাইর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় সরলার মন ভরে ওঠে।

সরলা বিমর্ষ মুখে থিয়েটার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাবলা গাছটার তলায় বসে ও চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না। জীবনে ঢের কেঁদেছে, এর চেয়ে ঢের বড়ো বেদনায়, কিন্তু আজকের মতো নিজেকে কোনোদিন এমন ব্যর্থ মনে করেনি। ওর চোখের থেকে দিনের আলো যেন কে শুষে নিয়েছে।

কিন্তু নিমাইকে আজ ওর চাই—একান্ত করে চাই। এ সংসারে ও-ই সরলার একমাত্র বন্ধু, খালি ওকেই সরলার অপমান স্পর্শ করেছে। নিমাইকে আজ সরলা তার ছোট ঘরটিতে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নাগালের থেকে আড়াল করে রাখবে।

নিমাইকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে। বাজার, গাড়ির আড্ডা অলি-গলি কোথাও নিমাই নেই। নিমাই নেই। নিমাই দেশ-ছাড়া হয়নি ত।

হঠাৎ মনে হল, নিমাই হয়ত ওরই বাড়ি গিয়ে বসে আছে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। সরলার সমস্ত শরীর আনন্দে শিউরে উঠল।

সরলা তখুনি বাড়ি গেল। রোদ তখন বেশ চড়া হয়েছে। সরলার ঘরে কেউ আসেনি, কেউ ওর খোঁজও করেনি।

বাড়িউলি ঠাট্টা করে, 'আজ যে লোকের ওপর ভারি দরদ—'

ভুতি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সরলার চেহারা দেখে থমকে যায়। বলে, 'তোর কী হয়েছে, সরলা ? কাঁদছিস কেন ?'

সরলা বলে. 'এই মাত্র পার্ট করে আসছি। আমার যে কাঁদবারই পার্ট।'

মুখে ঠুনকো হাসি ফুটোবার চেষ্টা করে বলে. 'সেই তখন থেকেই কাঁদছি। নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাব,—তাই বড়ো শক্ত রে। হ্যাঁ রে ভূতি, আমার কাছে কেউ আসেনি,—ঢ্যাঙাপনা ফরসাপনা একটি ছেলে, গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি? আসেনি? কেউ না?'

সরলা ভগ্নোৎসাহ হয়ে বলে, 'তবে যাই ফেব থেটার-বাড়ি। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তার সঙ্গেই আমার পার্ট। তাকে কোথাও না—দেখে সবাই ভারি ভড়কে গেছে। কোথায় যে গেল!'

বলে সরলা ফের বেরিয়ে পড়ল থিয়েটার-বাড়ির দিকে।

ভূতি বললে, 'আমাদের পাস কই সরলা?'

সরলা বলতে-বলতে গেল, 'দরজায় গিয়ে আমার নাম করলেই ছেড়ে দেবে,—ভাবিসনে।'

সেখানে গিয়ে ফের নিমাইর খোঁজ নিলে,—কেউ কিছু জানে না। কিন্তু কারু মুখে লেশমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। স্বয়ং রমেশবাবুও হাসিমুখে গল্প-গুজব করতে-করতে তদারক করে বেডাচ্ছে,—সরলার দিকে চেয়েও দেখছে না।

ঠিক উচিত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হিরণকুমার মালতীব অপমান সইতে পাবেনি, তার দণ্ড দিয়ে গেছে।

একজন বললে, 'নিমাই শহরেব গণ্যমান্যদের বাড়িতে-বাড়িতে উঁচু ক্লাসের টিকিট বেচতে গেছে।'

টিকিট বেচতে গেছে? অসম্ভব।

অসম্ভবই বা কেন? হয়ত এই অন্যায় পবিবর্তনেব খবর এখনো নিমাইর কানে ওঠেনি। তাই সরলার অভিনয় সবাইকে দেখাবার জন্য টিকিট বেচতে নিমাইর এত আগ্রহ! নইলে নিজে গা করে টিকিট বেচবার মতো ছেলেই নয় সে।

সরলা যেন নিমাইর মনের সমস্ত গলি-ঘুঁজি চিনে ফেলেছে।

চলল ফের শহরের দিকে। যদি রাস্তায় দেখা হয়।

ক্ষুধায় শরীর টা টা করছে,—সরলার হুঁশ নেই। ও এই অবিচারের প্রতিবিধান চায়—যে তার প্রেমিক, যে তার সর্বস্ব—তার কাছে।

কোথাও নিমাইয়ের দেখা নেই। যদি গেলই, সরলাকে কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না?

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই হরি আর তার মা সরলাদের বাড়ি এসেছে।

হরি বললে, 'আমাদের জন্য পাস রেখে গেছে, ভুতি-দি?'

হরি নতুন জামা-কাপড় পরে এসেছে, হাতে একটা খেলনা রিস্ট-ওয়াচ বাঁধা, মাথায় দিব্যি টেড়ি বাগানো। হরির মা-ও কাপড় কেচে শুকিয়ে পরে এসেছে।

ভুতি বললে, 'পাস রেখে যায়নি। বলেছে, টিকিট নিতে দরজায় যে থাকবে তাকে সরলার নাম করলেই বসবার জায়গা করে দেবে।'

হরি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে আগে ভাগে চলো ভুতি দি, জায়গা পাওয়া যাবে না। বেজায় ভিড় হয়ে যাবে। আর কাপড় বাছতে হবে না, একখানা এমনি পরে চলো।'

ভুতি ধমক দিয়ে উঠল, 'এখনো আরম্ভ হতে দু ঘণ্টা বাকি—'

ভুতিও তার সাধ্যমতো সেজে নিল। তিনজনে বেরিয়ে পড়ল,—হরি আগে-আগে, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাত দুলিয়ে-দুলিয়ে। পথঘাট ওর নখদর্পণে।

দারুণ সোরগোল, লোকে গিসগিস করছে। বগলাবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক রূপেও সফল হয়নি। হরি বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে ভুতি-দি। জায়গা পেলে হয়। মেয়েমানুষগুলো চলতেই পারে না, কাপড় পরতেই তিন-ঘণ্টা।'

থিয়েটার আরম্ভ হতে এখনো কিছু দেরি আছে। হরি দরজার সামনের লোকটিকে গিয়ে গম্ভীরভাবে বেমালুম বললে, 'সরলা দিকে ডেকে দাও ত?'

লোকটা বললে, 'কে সরলা দি?'

হরি অবাক হবার ভান করে বললে, 'কে সরলা-দি? বাঃ—তুমি নতুন লোক বুঝি? সরলা-দি, যে য্যাক্টো করছে, কাগজে-কাগজে যার ছবি উঠেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সেই যে একটা মরা মানুষ খুন করতে ছুরি নিয়ে ছুটেছে—সেই সরলা-দি।'

ভুতি বুঝিয়ে বলে, 'এই নাটকে মালতীর পার্ট নিয়ে যে নামবে আজ।'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'সরলা-ফরলা বলে এখানে কেউ নেই। মালতীর পার্টে যে নামছে তার নাম চমৎকারিণী দাসী। সরলা আবার কে?'

'বাঃ, আমাদের বলেছে গেটে এসে তার নাম বললেই আমাদের ছেড়ে দেবে, ভেতরে জায়গা করে দেবে,—তার নাম সবাইর মুখে মুখে।'

লোকটি বললে, 'তোমাদের সরলা-দিটি ভারি শৌখিন দেখছি। যাও, জায়গা ছাড়ো, অন্য লোকদের পথ করে দাও।'

হরি বিমর্ষ হয়ে বললে, 'ঢুকতে দেবে না? দেখো না ভেতরে গিয়ে, সরলা-দি বসে আছে, হয়ত সাজছে। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ভদ্রলোক, আমদের ছেড়ে দাও।'

ভদ্রলোক কথা গ্রাহ্য করে না।

ওদিকে ঘণ্টা পড়ে, সিন ওঠে, য়্যাক্‌টিং শুরু হয়।

হরি এবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। হরির মা বলে, কি দারুণ মিথ্যুক এই ছুঁচো হারামজাদি,—কি ভীষণ চালবাজ। এ যে জাঁহাবাজ ডাকাত বাবা,—একে পুলিশে দিতে হয়।'

ভূতি ভুম ভুম করে পা ফেলতে ফেলতে বলে, 'ফিরুক ও বাড়ি। ওর দেমাক আমি ভাঙচি অটলবাবুকে দিয়ে।'

হরি কিছুতেই আসবে না, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে ও কি দেখছে, ও-ই জানে। মা যত টানে ও ততই বেড়া আঁকড়ে থাকে। শেষে মার হাতের চার-পাঁচটা কিল খেয়ে হরি হেরে যায়। হরির চীৎকারে বাইরের অন্ধকার বিদীর্ণ হতে থাকে।

সরলা আরেক প্রতিবেশিনীর ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, যখন ঘুম ভাঙে তখন থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় কাবার হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই এখনো নিমাই ফেরেনি—রমেশবাবুর উদ্বেগ অশান্তির সীমা নেই। চমৎকারিণী খুব জব্দ হয়েছে। কৃতার্থের ফুটুনি ঘুচেছে। খুব মজা। নিশ্চয়ই থিয়েটার আর হয়নি, লোকেরা খুব গালাগাল করছে, রমেশবাবুকে বাধ্য হয়ে পয়সা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

মজা দেখতেই হয়ত সরলা ও-দিকে পা চালালো। কিন্তু একটু কাছে আসতেই ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ভারি শীত করতে লাগল, এত শীতেও পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে এল। দূরে ডে-লাইট দেখা যাচ্ছে। থিয়েটার হচ্ছে বৈকি!

সরলা গেল এগিয়ে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ছুটে গিয়ে দরজার লোকটিকে বললে, 'নিমাইবাবু এসেছেন'

'সে কখন—'

'তাকে একটু ডেকে দিতে পারেন ?'

'বাঃ, এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে। উনি য়্যাক্ট করছেন যে—'

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য! সরলার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল। সমস্ত দৃশ্যটি সরলার মুখস্থ। সেই সব কথাগুলি নিমাইকে আবার চমৎকারিণী বলছে—সরলা যা বলেছিল আগে। কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ, স্পর্শে সেই উত্তাপ। তার মনের কথাগুলি যা বইয়ের আখরে সরলার অজানতে প্রকাশ পেয়েছিল, তা চমৎকারিণীর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।

তবু নিমাই বলেছিল—তোমাকে পেয়ে সরলা, আমার মনের ভাবের জোয়ার আসে; তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মারব।

ঈর্ষায় অভিমানে কেঁদে সরলা ধূলার সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

কানে কিছুই আসে না বটে, কিন্তু সরলা চোখের সামনে সমস্ত হাব-ভাব আঁকা দেখতে পায়। সেই মোটা বেঁটে চমৎকারিণী তার মৃত নিমাইকে কোলে নিয়ে আদর করবে ভেবে সরলা নিজে নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়, কপালে করাঘাত করে।

ইচ্ছা করে একটা ক্ষুধিত আর্তনাদের মতো স্টেজের ওপর গিয়ে ফেটে পড়ে। বিকট চীৎকার করে অভিনয়ের সমস্ত লজ্জা ঢেকে দেয়।

ক্ষুধায় সমস্ত গা অবশ,—নিমাইর খোঁজে হেঁটে-হেঁটে পা একেবারে ভেঙে পড়তে চাইছে।

আস্তে-আস্তে থিয়েটার ভেঙে যায়। কোলাহল করতে-করতে লোক সরে পড়তে থাকে। ততক্ষণ সরলা ব্যাপার মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সবাই চমৎকারিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যেকটি কথা সরলার কানে আসে।

'খুনের সিনটা কি রকম করলে। ওয়াণ্ডারফুল!'

'কি সুন্দর! অথচ কি ভীষণ। ভয় লাগে, ভালোও লাগে! পয়সা সার্থক, ভাই।'

সরলা আর বসে না, বাড়ি চলে। চলতে আর পারে না, কেঁদে-কেঁদে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

নিঃঝাম পাড়া, সবাই ঘুমিয়েছে। ভুতিও হয়ত। সদর খোলা ছিল।

ওর ঘরে এসে দেখে মিটমিট আলো জ্বলছে। ভেতরে অটল একা বসে মদ খাচ্ছে। সরলার সমস্ত শরীর কালিয়ে এল।

অটল তখনো বেহুঁশ হয়ে পড়েনি, সরলাকে দেখেই ওর রক্ত ফুটে উঠল। হাতের মুঠিতে ধরা ছিল মদের গ্লাসটা, তাই মারল ছুঁড়ে সরলার মাথা লক্ষ্য করে।

বললে, 'শালির আমার থেটার করা হচ্ছে। তিন দিন ধরে ঘুরে-ঘুরে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি—'

সরলা 'বাবা গো' বলে ঘুরে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

এতেও অটলের তৃপ্তি হয় না, জুতোটা দিয়ে সরলার পিঠের খাল ছিঁড়ে দেয়। বলে, 'বলে কিনা থেটারের দলে ভিড়ে যাব,...মদের দাম দেবে না, রাত্তির বেলা বাড়ি আসার নাম নেই...'

বলে আর লাথি-জুতো চলতে থাকে।

সরলা অটলের পায়ের নিচে পড়ে একেবারে ভেঙে গেছে। বাড়িউলি প্রথম মনে মনে মজা দেখে, পরে অটলকে থামাতে আসে। তৃপ্তিই মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দেয়।

ভোরবেলা সরলার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সারা গায়ে বিষম ব্যথা, জ্বর, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে—যেন সারা বছর ও কিছু খায়নি। পায়ের কাছের জানলা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে।

এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটেনি। ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে—মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা!

॥ স্বনির্বাচিত গল্প ॥

দু'কানকাটা | অন্নদাশঙ্কর রায়

এক

সেই সব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল! মাঝে মাঝে ভাবি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। গৌরবর্ণ সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পিছনে যেমন রাহু তেমনি চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূল হস্তাবলেপে সুকুর গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাকয়েক মিলে একটা দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাতে এমন মোচড় দিয়েছিল যে আর একটু হলে হাতটা যেত। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

কচিৎ তাকে একা পেতুম। পেলেই আমার বুকভরা মধু তার কানে ঢালতে ব্যগ্র হতুম, কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে

আমার প্রকৃত পরিচয় জানল না, এ কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে অসময়ে তাই তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতুম। ভিতরে ঢুকতে ভরসা হত না। কারণ সুকু একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিসনে খোকন।'

তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এত রূঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রূঢ়তা নয়। সুকুর বাবা মফঃস্বলে গেলে তার মা'র সঙ্গে তার ঠাকুরমা'র বচসা বাধত। খোঁপা আর এলোচুলের সেই বচসা শুনে পাড়ার লোক জুটত তামাশা দেখতে। এতে সুকুর মাথা কাটা যেত। তার বাবা যখন ফিরতেন, মা'র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুরমা'র কাহিনী বিশ্বাস করতেন। মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুকুর ভাইবোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে লুকিয়ে কাঁদত। প্রতিবার মা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, বাক্স বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতেন। রাজ্যের লোক জড়ো হত তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকর এসে বলত, 'মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।' তা শুনে ঝি বলত, 'আর একটা দিন থেকে যাও, মা।' সেদিনকার মতো মা যাওয়া মুলতুবি রাখতেন। প্রতি মাসেই এই ব্যাপার। দুজনেই সমান মুখরা, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে গাড়ির অভাবে পেছপাও হলেন না, দুনিয়ার লোকের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাইবোন লোকলজ্জায় তাঁর সাথী হল না, কিন্তু সব চেয়ে লাজুক যে সুকু সেই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। কাজটা সুকুর মা ভালো করলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হল। তিনি সেই হেঁট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মা'র কানে পড়ল তিনি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরবন্দী।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। শিবপুরহাটের তিন দিকে নদী। যে দিকে দু'চোখ যায় সে দিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। সুকু পা

ছড়িয়ে বলে, গা ঢেলে দেয়। কত নৌকো স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনোটাতে চালের বস্তা, কোনোটাতে নতুন হাঁড়িকলসী, কোনোটাতে ঝুনো নারকেল। ছইয়ের চার কোণে মাকাল ফল ঝুলছে, ছইয়ের ভিতর ডাবা হুঁকো ঝুলছে। নৌকোর গায়ে কত রকম নক্সা। নক্সার কত রকম রং। নৌকোও কত রকম। জেলেদের ডিঙি, বারোয়েলেদের নাও, গয়নার বোট, আরো কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকো, নৌকোর প্রাণ মাঝি, মাঝির প্রাণ গান। স্কু এক মনে গান শোনে, আর গুনগুন করে সুর সাধে। এতেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা লোক যাচ্ছিল মেলা দেখতে। রঘুনাথপুরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েৎ বৈষ্ণবরা নয়, নিমাইৎ বৈষ্ণবরাও আসে। নানা দিগ দেশ থেকে জমায়েত হয় আউল বাউল দরবেশরাও। এক দল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে স্কুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হল না, সে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না। তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়ে-ছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে স্কু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসব শা-ও আছে, আবার মন্থ শা-ও আছে। স্কু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সম্বন্ধে দু'বার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে বাড়ে খায় আর গান করে। স্কুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোর হবে।' এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত, এতদিনে স্বাদ ফিরল! স্কুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সায়র। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।'

মেলা ভাঙল। স্কুরও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে

তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনো সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুরহাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখু করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

দুই

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু থালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হল সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ। মামীমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেলে সবিনয়ে বলে, 'ছুঁয়ো না, ছুয়ো না, জাত যাবে।' তার দশা দেখে তার মা দু'বেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, 'মুসলমানের ভাত আরো কতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।'

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমা'র হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' স্ত্রীকে বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।'

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিন রাত আসর জমালুম! এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার সুকু। ও বলে, আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভর্তি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস স্বকু সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। কখন এক সময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘন বসতি, স্বকুর তাতে অরুচি। সে যায় আউল দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল। তার খোঁজ নিতে এক এক জন এক এক দিকে বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামী ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। স্বকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায় আমরা তো বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাহাবাজ চোরনী গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তার পরে একদিন নিশীথ রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

স্বকুকে আমরা সাবধান করে দিই যে কোন দিন চোর বলে সন্দেহ করে পুলিস তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, 'সন্দেহ মিটলে খুলেও দেবে।' আমরা বলি, 'কিন্তু কলঙ্ক তো ঘুচবে না। মুখ দেখাবি কী করে?' সে বলে, 'ওরা যেমন করে দেখায়।' ওরা মানে বাউল বোষ্টমরা।

স্বকুর জন্যে আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। ওর সঙ্গে মিশতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হল। প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এল, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টার মশাই ছিলেন স্বকুর বাবার বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোর্ডিং-এ রাখতে। ওর বাবা একদিন ওকে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। ওর তাতে আপত্তি নেই, বরং ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোর্ডিং-এর পাশেই হেডমাস্টার মশায়ের কোয়ার্টার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যে স্বকুর কাছে যাওয়া আসা করব সে সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেডমাস্টার মশাই একদিন স্বকর্ণে শুনলেন দুটি বালখিল্য বালক ফূর্তিসে গান করছে—

'যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব দড়ি।
দুঃখ রে যৌবন প্রাণের বৈরী।'

মশাই তো দুই হাতে দুজনের কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান ঐ দুটি প্রাণী অবিলম্বে কবুল করল যে সুকুই ওদের ও গান শিখিয়েছে। তখন তিনি সুকুকে তলব করলেন। সুকু বলল, 'সব সত্যি। দোষ ওদের নয়, আমার।'

মশাই বললেন 'গোল্লায় যদি যেতে হয় তবে সদলবলে কেন? তুমি একা যাও।' এই বলে একটা গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল আমরাও বাঁচলুম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। যাদের কাছে পাঠ নেয় তারা মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিদ্যালয়ে পৌছে দিয়ে এলেন, সেখানে তার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সে অঙ্কের খাতায় ইতিহাস ও ইতিহাসের খাতায় সংস্কৃত লিখে শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলল। এটা যে তার ইচ্ছাকৃত তা নয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। আসলে তার মন ছিল না পাঠে।

সুকুর মা তার বাবাকে বললেন, 'জানি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তারা এরকম স্থলে গিন্নীদের উপদেশ নিতেন।'

'শুনি তোমার উপদেশটা কী।'

'আমার ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সুকুর বয়স পনেরো হলেও ওর যেমন বাড়ন্ত গড়ন—'

সুকুর বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তিন

ম্যাট্রিকে সুকু ফেল করল। আমি পাশ। বাধ্য হয়ে আমাকে বড় শহরে যেতে হল, ভর্তি হলুম কলেজে। চিঠি লিখে সুকুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হত ছুটিতে।

দিন দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি 'তুই', সুকু বলে 'তুমি'। আমার কষ্ট হয়। ডাকলে আসে, না ডাকলে খোঁজ করে না। গেলে দেখা দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলে কথা কয় না। একদিন আমি কুণ্ঠিতভাবে

বলেছিলুম, 'সুকু, আমি কি তোর পর?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'তা নয়। আমি হলুম ফেল করা ছেলে। আর তুমি—'

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলুম, 'তোর জন্তে আমার সব সময় দুঃখ হয়।'

'কিন্তু আমি তো মনে করি আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।'

বাউল ফকির দরবেশদের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দলে টানত। রতনে রতন চেনে। আমাদের চোখে সুকু একটা ফেল করা ছেলে, ওর পরকালটি ঝরঝরে। ওদের চোখে সুকু একজন ভক্ত। গুরুর কৃপা হলে একদিন পরমার্থ পাবে। আমাদের হিতৈষীপনার চেয়ে ওদের হিতৈষিতাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরনো বন্ধু। বোধহয় তার চেয়েও বেশী। সুকু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকে তত নয়। তাকে দিয়ে কথা বলানো একটা তপস্যা। গান করতে বললে দেরি করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশবার ঘোরায়।

সুকু নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী বলে দাবি করলেও আমার অগোচর ছিল না যে ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাক্ হচ্ছে। কাকে যে ভালোবেসেছে, কে যে সেই ভাগ্যবতী তা আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অনুমান করতুম কিন্তু পরে বুঝেছিলুম সে সব অনুমান ভুল।

নায়িকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। সুকু নিয়েছিল ওই সাধনা। প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাশক্তি সুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তি যখন জাগবে তখন প্রতি নারীই রাধা। যে কোন নারীকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বে পৌঁছনো যায়। কিন্তু সে নারীর সম্মতি পাওয়া চাই। সুকু একজনের সম্মতি পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এই জন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোকদের সঙ্গে খায় দায়, গায় বাজায়, শোয়া বসা করে। ওকে নৌকো বাইতে, গোরুর গাড়ি চালাতে, ঘর ছাইতে দেখা গেছে। ওর বাবা সম্মানী ব্যক্তি। তাঁর মাথা হেঁট। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে ইতিমধ্যে তাঁর ছোটবৌ মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়বৌ আবার বাপের বাড়ি যান তবে আর একবার টোপর

পরোয়া মতো বল, বয়স নেই। মুখে বলেন, 'ওটাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে দেখছি।' কিন্তু ভালো করেই জানেন যে সুকু তাঁর সম্পত্তির জন্যে লালায়িত নয়। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মজনু ফকির ওর গুরু। গুরুর উক্তি ও সুকুর প্রত্যুক্তি কতকটা এই রকম—

'বাবা, কাঁদতে জনম গেল। যদি সুখের পিত্যেশ পুষে থাক তবে আমার লগে আইসো না। আমি তোমায় সুখের নাগাল দিতে নারব।'

'আমি চোখের জলে মানুষ হয়েছি। কাঁদতে কি ডরাই?'

'সারা জনম কাঁদতে রাজী আছ?'

'আছি।'

'আমায় দুষবে না?'

'না, হুজুর।'

'তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই 'না' বোলো না। তার ছলকলার অন্ত নেই। তেঁই তোমায় বলি, কাঁদতে জনম গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল।'

সুকু সেই যে ফেল করল তার পরে আর পরীক্ষা দিল না। তার পড়াশুনা সেইখানেই সাঙ্গ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা দিতে হল, সে পরীক্ষা মাত্র একজনের কাছে। সে একজন তার নায়িকা। তার গুরুই তাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এইটুকু আমি জানি, এর বেশী জানিনে। আর যা জানি তা লোকমুখে শোনা, লোকের কথা আমি বিশ্বাস করিনে, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রবাদ আছে লোকের কথাই ভগবানের কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসে শুনি সুকু নিরুদ্দেশ। লোকে বলাবলি করছে সারী বোষ্টমী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি প্রথমে ছিল মোদকদের বৌ। অল্প বয়সে বিধবা হয়। পরে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবনে যায়, সেখানে বেশ কিছুকাল থেকে চালাক চতুর হয়। বৈষ্ণবটির কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে দেশে ফিরে সারী তার বিষয়বাড়ি ভোগদখল করে। তারপর থেকে সুন্দর ছেলে দেখলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। গুণের মধ্যে সে গাইতে পারে অসাধারণ। গান দিয়েই প্রাণ মজায়।

ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গাজমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সঙ্গে সুকুও। সুকুর বাবা থানা পুলিস করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, 'খোকন, তুমি তো পাশ করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেন অমন উচ্ছন্ন গেল। ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—' তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন।

সুকুর মা বললেন, 'যে ছেলে মা'র সঙ্গে বনবাসী হয় সে কি তেমন ছেলে। আমার মন বলে সুকু আমার কোন কুকাজ করেনি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে।'

চার

পরবর্তী কালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোন দিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোন ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই ও সুকুকে শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারী, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দী বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দু'চারটে ইংরেজী বুকনিও। হিন্দী ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি গায়িকা নায়িকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দুজন দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

সুকুব মতো আরো অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমন কি সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারো কারো লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে

সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়। সুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু সুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, 'একদিন মা'র সঙ্গে গেছলুম, আজ তোর সঙ্গে যাব।'

সারী বলল, 'আমি কি তোর মা!'

সুকু বলল, 'মাকে যেমন ভালোবাসতুম তোকেও তেমনি ভালোবাসি।'

সারী রসিয়ে বলল, 'তেমনি?'

সুকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'দূর! তেমনি মানে কি তেমনি?'

'তবে কেমনি?' সারী রঙ্গ করল।

'এমনি।' বলে সুকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—

'আশা করি বান্ধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদী, তোর মনে কি এই সাধ ছিল!'

তার পরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারী ও শুক সেইখানে নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, 'সই, তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়। ও যে তোর ছোট ভাইয়ের বয়েসী।'

সারী বলে, 'গোপালও ছিল গোপীদের ছোট ভাইয়ের বয়সী। কারো কারো ছোট ছেলের বয়সী।'

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'আ মর। কার সঙ্গে কার তুলনা।'

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, 'যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা!'

আসলে সারীর বয়স অত বেশী নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল। সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠিবদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। একদিন শুক সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গাজমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সঙ্গে সুকুও। সুকুর বাবা থানা পুলিস করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, 'খোকন, তুমি তো পাশ করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেন অমন উচ্ছন্ন গেল! ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—" তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন।

সুকুর মা বললেন, 'যে ছেলে মা'র সঙ্গে বনবাসী হয় সে কি তেমন ছেলে! আমার মন বলে সুকু আমার কোন কুকাজ করেনি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!'

চার

পরবর্তী কালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোন দিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোন ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই ও সুকুকে শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারী, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দী বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দু'চারটে ইংরেজী বুক্‌নিও। হিন্দী ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি গায়িকা নায়িকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দুজন দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

সুকুর মতো আরো অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমন কি সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারো কারো লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে

সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়! স্বতুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু স্বকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, 'একদিন মা'র সঙ্গে গেছলুম, আজ তোর সঙ্গে যাব।'

সারী বলল, 'আমি কি তোর মা!'

স্বকু বলল, 'মাকে যেমন ভালোবাসতুম তোকেও তেমনি ভালোবাসি।'

সারী রসিয়ে বলল, 'তেমনি?'

স্বকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'দূর। তেমনি মানে কি তেমনি?'

'তবে কেমনি?' সারী রঙ্গ করল।

'এমনি।' বলে স্বকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—

'আশা করি বান্ধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদী, তোর মনে কি এই সাধ ছিল।'

তার পরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারী ও শুক সেইখানে নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, 'সই, তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়। ও যে তোর ছোট ভাইয়ের বয়েসী।'

সারী বলে, 'গোপালও ছিল গোপীদের ছোট ভাইয়ের বয়সী। কারো কারো ছোট ছেলের বয়সী।'

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'আ মর। কার সঙ্গে কার তুলনা।'

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, 'যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা!'

আসলে সারীর বয়স অত বেশী নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল। সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠিবদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। একদিন শুক সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা স্বকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ি। আহার সম্বন্ধে স্বকুর বাছবিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রাঁধে খায়, শুধু ফকিরচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভালো, কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল স্বকু তাদের একটি মেয়ের প্রীতিমুগ্ধ। স্বকু স্বপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন স্বকুই অনুনয় করল, 'চল, আমরা এখান থেকে যাই।'

সারী অভিমানের স্বরে বলল, 'কেন? আমি কি যেতে বলেছি?'

'না, তুই বলবি কেন? আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশীদিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো।'

'কিসের উপর টান? জায়গার না মানুষের?'

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে স্বকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এলো ফুরিয়ে। কারো কাছে তারা কিছু চায়ও না, পায়ও না, নিলে বড জোর চালটা আলুটা জ্বালানীর কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিংবা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, 'চল আমরা শহরে যাই।'

স্বকু বলে, 'শহরে।' বলতে পারে না যে, শহরে আত্মগোপনের স্ববিধা নেই, লোকে বংশপরিচয় শুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ না কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

পাঁচ

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তর বঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো তাদের সেখানে টমটম বা একা গাড়ি চলে। টমটমওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ায় একধারে পশুডাক্তারখানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত না পারদর্শী তার চেয়ে ওস্তাদ গানবাজনায় ও থিয়েটার করায়। স্বকুর

চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাঁকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু'এক পরে যখন পশুদের ড্রেসার চাকরি খালি হল তখন তিনি সাময়িকভাবে সুকুকেই বাহাল করলেন।

সুকুর সারা দিনের কাজ হল টমটমের ঘোড়া, চাষীদের গোরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চীৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সাবী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় শখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলির হুকুম এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গানবাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসেছিল, সুতরাং এক কথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোন ফল হল না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি ডোম মুচি দোসাদ জেলে মালী প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান সঙ্গীতে পল্লী মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তার পর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এত দূর কুখ্যাত হল যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে এক দিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর

এবার গেল ওরা স্বকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ি। আহার সম্বন্ধে স্বকুর বাছবিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রাঁধে খায়, শুধু ফটিকচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভালো, কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল স্বকু তাদের একটি মেয়ের প্রীতিমুগ্ধ। স্বকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন স্বকুই অনুনয় করল, 'চল, আমরা এখান থেকে যাই।'

সারী অভিমানের স্বরে বলল, 'কেন? আমি কি যেতে বলেছি?'

'না, তুই বলবি কেন? আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশীদিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো!'

'কিসের উপর টান? জায়গার না মানুষের?'

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে স্বকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এলো ফুরিয়ে। কারো কাছে তারা কিছু চায়ও না, পায়ও না, নিলে বড় জোর চালটা আলুটা জ্বালানীর কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিংবা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, 'চল আমরা শহরে যাই।'

স্বকু বলে, 'শহরে!' বলতে পারে না যে, শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বংশপরিচয় শুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ না কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

পাঁচ

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তর বঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো তাদের সেখানে টমটম বা একা গাড়ি চলে। টমটমওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ায় একধারে পশুডাক্তারখানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত না পারদর্শী তার চেয়ে ওস্তাদ গানবাজনায় ও থিয়েটার করায়। স্বকুর

চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু'এক পরে যখন পশুদের ডেস্পোয় চাকরি খালি হল তখন তিনি সাময়িকভাবে সুকুকেই বাহাল করলেন।

সুকুর সারা দিনের কাজ হল টমটমের ঘোড়া, চাষীদের গোরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চীৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় শখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলির হুকুম এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গানবাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসেছিল সুতরাং এক কথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোন ফল হল না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি ডোম মুচি দোসাদ জেলে মালী প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান সঙ্গীতে পল্লী মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তার পর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এত দূর কুখ্যাত হল যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে এক দিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর

কীর্তি! গণ্যমান্যরা শিউরে উঠলেন। ছি ছি! মেয়েমানুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হয়েছে। ছি ছি!

সুকু কাকার কথা শুনল না। ভালো ছেলে হল না। তিনি অনেক করে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার দরুন সুকুকে তুষের আগুনে পুড়তে হল।

সারীর বড় গয়নার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খেতেই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, ব্যথার ব্যথী বলে দ্বিগুণ লাগে। গানের প্রলেপ দিয়ে বুকের বেদনা ঢেকে রাখে। দিন কাটে।

এক দিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে এ কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাধল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ। ডাকল, 'সারী। ও সারী।'

মিনিট পাঁচ সাত ডাকাডাকির পর দ্বার যদি বা খুলল কোথায় সারী! সারীর বদলে কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে হন হন করে চলে গেল। চলনটা মেয়েলি নয় মোটেই। সুকু ভেঙে পড়ল। তার মনে হল সে মরে যাবে, বাঁচবে না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে থাকল জানে না। যখন জ্ঞান হল দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার পা ছুঁতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সুকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। দুজনের একজনেরও চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। বুকে দুর্জয় রোদন। দুজনেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল। 'তা হলে এখন তুমি কী করবে?'

সারী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলল।

সুকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'বাড়ি ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে?'

সুকু ভেবে বলল, 'যেখানে তুমি সেইখানেই আমার বাড়ি।'

'কিন্তু দেখলে না? আমি যে বেশ্যা।'

'তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইনে।'

'আমি কে ?'

'তুমি রাধা।'

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হল। এবার ভেঙে পড়বার পালা তার। সে এমন কান্না কাঁদল যে সুকুর মনে হল তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনো তার গলায় দুলছিল এক ছড়া সোনার হার, সত্ত নির্মিত।

ছয়

কাকার চাল ব্যর্থ হল। কিন্তু সারীর নামে যে সব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। সুকুর পক্ষে মুখ দেখানো দায় হল। কিন্তু নিরুপায়। টমটম পাড়ার টিটকারি সে গায়ে মাখে না, ছোটলোকের রসিকতা মাথা পেতে নেয়।

এমন করে তাদের বেশী দিন চলত না। দৈবক্রমে সে শহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে গান রেকর্ড করার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুক উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি তার সাত আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তারপর সে সব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুমহলে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সরাসরি সারীকে লিখলেন কলকাতা আসতে।

সারী এল, তার গান নেওয়া হল। সে সব গানের আশাতীত আদর হল। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারীর বরাতে জুটল সাহেবমহলের সুপারিশ। রেকর্ডের পর রেকর্ড করিয়ে সারী স্বনামধন্য হল। তখন তাকে বাস উঠিয়ে আনতে হল কলকাতায়। বলা বাহুল্য, সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তার পরে সারী পড়ল এক ফিল্মব্যবসায়ীর সুনজরে। তার রূপের জেল্লুস ছিল না, কিন্তু রসের চেকনাই ছিল। ভালো করে মেক্-আপ করলে তাকে লোভনীয় দেখায়। যারা ফিল্ম দেখতে যায় তারা লোভনকে শোভন বলে ভুল

করে। সে ভুলের পুরো সুযোগ পেল সারী। ডিরেক্টর তাকে পরামর্শ দিলেন ফিল্মী-গান শিখতে। লোকসঙ্গীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সঙ্গীত শিখল। কণ্ঠের কৃপায় সে তাতেও নাম করল। ধীরে ধীরে সারী তারা হয়ে জ্বলল। চার পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিল্ম দেখল তারা জানল না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে একদিন শুভলগ্নে সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ আশ্চর্য হল না, কারণ সারীর আয় তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেঞ্জ থেকে ফিরছি। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। কোনখানে একটিও বার্থ খালি নেই। বার কয়েক ঘোরা-ঘুরি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি এমন সময় একটা সার্ভেন্ট কামরা থেকে কে যেন আমাকে ডাক দিল, 'খোকা? খোকা না?' আমি পিছন ফিরে দেখি সুকু।

ওর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে এক রাশ গোঁফ দাড়ি, গলায় একটা কালো কাঠের কি কালো কাচের মালা। ফিটফাট বেহারা চাপরাশির মেলায় ও নেহাত বেমানান। হাতে একটা একতারা না আনন্দলহরী ছিল সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

'প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু ধরো চিনে।'

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে সুকু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? জায়গা মিলছে না?'

আমি বললুন, 'এত রাত্রে কে আমার জন্যে জায়গা ছাড়বে।'

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফার্স্ট ক্লাসে, যদিও আমার টিকিট সেকেণ্ড ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, 'ও সারী। একবার খুলবে?'

সারীর বদলে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন সুকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'একটু কষ্ট করতে হবে এর জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু।'

ভদ্রলোকের মুখে পাইপ, হাতে ডিটেকটিভ নভেল ও পরনে সিল্কের স্লীপিং স্যুট। ভদ্রমহিলার পরনেও তাই, উপরন্তু রঙচঙে ড্রেসিং গাউন। তাঁরা বোধ হয় শয়নের উদ্যোগ করছিলেন।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হল না। আমি উপরের বার্থে সসংকোচে

নিদ্রার ভান করে পড়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোর বেলা আসানসোল স্টেশনে সুকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে তার কাহিনী শুনলুম। বাকীটুকু বর্ধমানে ও ব্যাণ্ডেলে।

হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তোর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?'

সুকু উত্তর দিয়েছিল, 'ও যে রাধা!'

॥ গল্প ॥

বিস্মৃত ক্ষুধার কাঁদে | প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ভরসন্ধ্যেয দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন ? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব।'

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক, সিল্কের একটা শাড়ি সেলাই করছিল। স্ত্রীলোকটির ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন হলেও সিল্কের শাড়িটি যে সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য খুইয়ে বীভৎস প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় প্রথম আঘাত শুনে বেগুন কিসের আশায় একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়িটি বিছানার তলায় লুকোবার চেষ্টা করতে গেছল কিন্তু তারপর বাড়িউলির গলার স্বর শুনে সেটি আর না লুকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, 'খোলাই আছে, জোরে ধাক্কা দাও।' তারপর আবার সে সেলাইয়ে মন দিলে।

তার হারান যৌবনের সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরটুকু বুঝি এখনো অবশিষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরটি ছেড়া জুতোর নতুন ফিতার মত একেবারে বেখাপ্পা!

বাড়িউলী তার বিপুল বাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে অতি কষ্টে এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে বেঁকে আর একপা তুলে উঁচু চৌকাঠটা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—'সে ছোঁড়াও তো আজও এল না রে বেগুন—সে এবার ভেগেছে।'

বেগুন কোন কথা না বলে নীরবে শাড়িটা সেলাই করতে লাগল।

বাড়িউলী তক্তপোষ কাঁপিয়ে বসে বললে, 'বলছিলুম কি, এই বেলা তোর তাগা জোড়াটা বিক্রী করে ফেল্; শশীর বাবু তো শশীকে এক জোড়া কিনে দেবে বলছে, আমি বন্দোবস্ত করে তোর তাগা জোড়াই গছিয়ে দেব'খন।'

শাড়িটা সেলাই শেষ করে সেটা সন্তর্পণে পাট করতে করতে বেগুন বললে, 'আমি তাগা বিক্রী করব না, তোমায় কতবার বলেছি তবু তুমি বিরক্ত করতে আস কেন বল তো মাসী—? এখন যাও বাপু, আমার কাজ আছে।'

অতিরিক্ত ক্রোধেও মাসীর স্থূলদেহ স্থূলতর হবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। মাসীর কর্কশ কণ্ঠস্বর কিন্তু সপ্তমে উঠল—

'কেন যাব না, কেন? দে আমার দু'মাসের ভাড়া দে, গাণ্ডে পিণ্ডে যে দু'মাস গিলেছিস্ সেই খোরাকী দে। আমি তোর কাছে ভিখিরী হয়ে এসেছি? আমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরো আমার বাড়ি থেকে, কালই আমি খেঁদিকে এনে বসাব। ঘাটের মড়া। দু-দু'মাসে একটি মিন্সে ওর চৌকাঠ মাড়াল না ওর আবার রোখ্! কিছু বলি না বলে। ভালোমানুষীর কালই নেই, ভালো কথা বলতে এলুম, না আমি বিরক্ত করতে এলুম। তাগা বেচবি না তো ক'দিন তোকে অমনি অমনি পুষব রে মড়া?'

দম ফুরিয়ে গেছল বলেই বোধ হয় বাধ্য হয়ে এবার চুপ করে মাসী হাঁপাতে লাগল।

মাসীর কণ্ঠস্বরে বাড়িময় সাড়া পড়ে গিয়েছিল, দরজার কাছে যে কয়েকজন এসে জমেছিল তার মধ্যে শশীই সব চেয়ে মাসীর আদরের—মাসী তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। তার দেহে যৌবনের কমনীয়তা হয়ত ছিল না কিন্তু বাঁধুনী ছিল, উগ্রতাও ছিল। তার রোজকার বেশী ছিল বলে সে বাড়ির সমস্ত বাসিন্দার হিংসার, ঈর্ষার ও মাসীর স্নেহের পাত্রী। একটা সোনার চিরুনী হাতে ঘরের ভেতর ঢুকে সে ন্যাকামি-ভরা আদুরে নাকীসুরে বললে, 'ও—মাসী তুই এখানে কোঁদল কচ্ছিস্ আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে সারা! তুই চিরুনীটা ভাল করে গুঁজে দিবিনে তো, বেশ আমার খোঁপা খুলে যাক।'

শশী আবার ঠোঁট উলটে মুখ ঘুরিয়ে দরজার কাছে ফিরে গেল।

মাসী তখনও ভাল করে দম ফিরে পায়নি, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রোধ-কর্কশ গলাটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বললে, 'আয় না লো দিদি, রাগ করিস্ কেন!'

মাসীর পাওনা সত্যি সত্যি বাকী থাকলেও অন্যদিন হলে বেগুন, মাসীর মুখনাড়ার প্রতিশোধ দিতে কিছুতেই পেছপা হত না। কিন্তু আজ সে চুপ করেই রইল। বুকের পুরনো ব্যথাটা আজ আবার বেড়ে উঠেছিল। প্রত্যুত্তর দেবার লোভ সামলান শক্ত হলেও চেঁচামেচির পরিণাম শরীরের পক্ষে কখনই ভাল হবে না, হয়ত তার ফলে এই দুঃসময়ে কদিন অকর্মণ্য হয়ে শয্যাগত থাকতে হবে জেনে সে অতিকষ্টে সংযত হয়ে রইল।

শশীর পায়ে জুতো লক্ষ্য করে মাসী বললে, 'ও আবার কি ঢঙ্ লা, মেম সাহেব হলি নাকি!'

শশী আগেকার মতনই কচি খুকির গলা নকল করবার চেষ্টায়-নাকী সুরে উত্তর দিলে, 'বা! আজ যে এক্‌জিবিশনে যাচ্ছি, জানিস না বুঝি?'

'সে আবার কি?'

'ওমা, এক্‌জিবিশন্ লো একজিবিশন্, সায়েবদের মেলা, জানিস না?'

'তা আমায় নে যাবি নে?'

শশী মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ তুই যে ধুম্‌সি, তোকে আবার নে' যাবে! নড়্‌তে পারিস্ না, থপ্‌ থপ্‌ করে চলিস, তোকে নে' গে' মুশকিলে পড়ি আর কি?'

একথা শশী ছাড়া আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে মাসী সহ্য করত না কিন্তু শশীর এখন রাজপাট্, সুতরাং অতিকষ্টে কথাটা হজম করে মাসী বললে, 'বেশ আমি না হয় ধুম্‌সি, তুই না হয় রূপসী তা বলে তোর মাসী তো, তুই পারিস বলেই সাধছি নইলে আর কাউকে কি বলতে গেছি?'

মনস্তত্ত্বে মাসীর অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল। রূপসী বলায় ও ক্ষমতার উল্লেখে খুশী হয়ে শশী বললে, 'আচ্ছা চ দেখি, বাবু গাড়ি আনতে গেছে।'

ঝগড়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দরজায় ভিড় হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বেগুন ইতিমধ্যে নীরবে টিনের ভাঙা পেটরা থেকে কাপড-চোপড বার করায় মন দিয়েছে।

'সায়েবদের মেলায়' যাবার আশায় আপাততঃ রাগটা কিছু ভুলে, মাসী শশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'খোরাকী আর ভাডা না পেলে বাছা বলে যাচ্ছি, কাল থেকে আমার বাড়িতে আর তোমার জাযগা হবে না।'

'আচ্ছা আজই ভাডা দেব। বলে বেগুন দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিলে। তারপর তাডাতাড়ি সাজ-পোশাক করতে মন দিলে। আজকের এই একজিবিশনই তার একমাত্র আশা। সত্যই দুমাস তার ঘরে কেউ আসেনি, দুমাস ধরে মাসীর কাছে ধারে খাচ্ছে। প্রদীপের তেল-টুকুও আজ ক্ষ্যান্তর অনুপস্থিতিতে তার ঘব থেকে না বলে নিযে এসেছে। মাসী যে পযসা না পেলে এতদিনের বাসিন্দা বলে একটুও খাতির রাখবে না একথা সে ভাল রকমই জানে। আজ কোন রকমে শিকার হাতডানো চাই-ই। তাই মান্ধাতার আমলের সিল্কের শাড়িটা এতক্ষণ ধরে সে সেলাই করেছে। আজ একজিবিশনে গেলে, রাত্রের মত খাওযা বন্ধ জানলেও এখন জলখাবারেব জন্যে অপব্যয করবার তার একটা পযসাও নেই। তার শেষ পযসা ক'টি টিকিট কেনবার জন্যে রাখতেই হবে। প্রদীপেব স্তিমিত আলোর সামনে সে চুলটা বাঁধতে গেল।

ডানদিকে কপালের ওপরেই চুল অত্যন্ত পাতলা হয়ে টাক পডবার মত হয়েছে, সেখানটা যথাসাধ্য অন্যদিকের চুল টেনে ঢেকে সে খোঁপা বাঁধলে। একটি মাত্র ভাল যে সেমিজ ছিল তা ধোপা বহুদিন থেকে পযসা না পেয়ে আব ফেরত দিয়ে যায না—সুতরাং পুরনো আধ ময়লা সেমিজটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। পাউডারের কৌটো বহুদিন খালি। কেরোসিনের ডিবের আলোয় খড়ির গুঁড়ো ধরা পড়ে না কিন্তু একজিবিশনের উজ্জ্বল আলোতে খড়ির গুঁড়ো মেখে যেতে তার সাহস হল না। দুই চোখের কোণের কালীভরা কোটর, লুকোবার কোন উপায় নেই। তাদের ব্যবসায়ে ভাল সাজ-পোশাকের মূল্য যে কত, তা সে বেশ জানে, বিশেষতঃ এই যৌবনের পারে এসে মানুষের

চোখে ধাঁধা লাগাতে হলে সাজ-পোশাকের অন্তরালে আসন্ন-বার্ধক্যের কুশ্রীতা গোপন না করলে যে চলতেই পারে না। কিন্তু বেশ-ভূষা দূরের কথা কিছুদিন ধরে দুবেলার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থান করাও তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে! যে তাগাজোড়া বিক্রী করবার পরামর্শ দিতে এসে মাসী এইমাত্র ঝগড়া করে গেছে, সেই তাগা জোড়াটা বার করে নিয়ে সে পরলে। কেন সে তাগা বিক্রী করতে চায় না, তা যদি মাসী জানত! তার শেষ সোনার অলঙ্কার যে বহুদিন আগে অভাবের তাড়নায় বিক্রী হয়ে গেছে, একথা জানিয়ে, তার তাগাজোড়া এবং সমস্ত গহনাই যে গিল্‌টি এই সংবাদ দিয়ে, সে আর বাড়ির সবার কাছে ছোট হতে চায় না।

শেষকালে কিন্তু শশীর কথা মনে করে সে তাগাজোড়া খুলে রাখলে। বহুদিন আগে তার এক সৌখীন সাহেবি-ঘেঁষা প্রণয়ী জুটেছিল। সে তাকে জুতো পরিয়ে বিবি সাজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তারই দেওয়া এক জোড়া হিল্‌-তোলা জুতো বহুদিন পেঁটরার এক কোণে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল। আজ সেটিকে বার করে ভাল করে পরিষ্কার করে সে অনেকদিন বাদে পায় দিলে। জুতোর সঙ্গে তাগা মানাবে না ভেবে, সে তাগাজোড়া খুলে রেখেছিল।

সাজ-গোজ সমাপ্ত করে যখন সে পথে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হবে। অনেকদিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে চলতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু একেবারে অনভ্যস্ত নয় বলে তার চলন নিতান্ত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না।

চৌরঙ্গীর চৌমাথা পার হবার সময়, দুজন লোক তার সম্বন্ধে একটা অভদ্র ইঙ্গিত করে হেসে উঠল। তার আকর্ষণীশক্তি একেবারে লোপ পায়নি মনে করে বেগুন একটু খুশীই হল।

টিকিট বিক্রেতা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ নয়; তাদের সে অবসরও নেই, নইলে সেদিন দক্ষিণ তোরণের টিকিট-ঘরের কাউণ্টারে টিকিট নেবার সময় একটি শির-ওঠা কঠিন সৌষ্ঠবহীন হাতের কাঁপুনিতে তারা অনেক কিছু দেখতে পেত। এটি বেগুনের শেষ আধুলী।

আলোকের উন্মত্ত উৎসব! অসংখ্য উৎসবমত্ত মানুষের কোলাহলের,

সঙ্গে দূরের ব্যাঙের অপরিস্ফুট সুরধারার মাধুর্য ও সমস্ত আনন্দ সমারোহের ওপর অতল গভীর আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্র-খচিত রহস্য-বরণ—সমস্তই বেগুনের কুটিল পথক্লান্ত জীবনের—নিত্য অবহেলায় মরচেপড়া মনের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া বাঁদিকের অপেক্ষাকৃত নির্জন পথটা দিয়ে সে এগিয়ে চলল। দুর্বল শরীরে এতখানি হেঁটে এসে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল। বুকের ভেতর পুরনো বেদনাটা তাকে পরিহাস করবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে চিড়িক্ দিয়ে উঠছিল। কিছুদূর গিয়েই স্বল্প অন্ধকারে একটা খালি বেঞ্চি দেখে কিছু জিরিয়ে নেবার জন্যে সে বসে পড়ল। এ পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত কম। সামনেই একটা বৈদ্যুতিক বাতির পোষ্ট, কিন্তু তাতে আলো ছিল না। বেগুন কতকট নিজেব অজ্ঞাতে ও কতকটা সজ্ঞানে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে যেন শক্তি সংগ্রহ করছিল। কিছুক্ষণ অবসন্নভাবে বসে থাকবার পর হঠাৎ পাশে চোখ পড়াতে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠল। তার অলক্ষ্যে কে একজন বেঞ্চির অন্য পাশে এসে বসেছে। অন্ধকারে তার মুখ ও বেশ-ভূষা ভাল করে দেখা না গেলেও, সে যে পুরুষ এবং বলিষ্ঠ পুরুষ তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। বেগুন সজাগ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাল করে বসল। ডান পায়ের জুতো মাটিতে ঠুকে বার কয়েক শব্দ করলে এবং মাথার কাপড় ফেলে হঠাৎ খোঁপার কি ত্রুটি শোধরাতে বিশেষ করে মন দিলে।

সামনের বাতিটা কোন কারণে নিশ্চয় খারাপ হয়েছিল। একজন মিস্ত্রী সেটা জ্বালাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বাতিটা পলকের জন্যে জ্বলেই নিভে গেল। ঐ পলকটিতে লোকটাকে দেখে নেবার সুযোগ কিন্তু বেগুনের হয়নি। যাই হোক্ লোকটা তাকে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। অন্ততঃ সেও এবার তার দিকে একটু পাশ ফিরে একটা পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে বসল। মাথার খোঁপার কাল্পনিক ত্রুটি শুধরে বেগুন বেশ একটু জোরেই হাতটা নামালে। হাতের গিল্‌টির চুড়িগুলি বেজে উঠল—রিন্‌ঠিন্ রিনিঠিন্।

অন্ধকারে হলেও বোঝা গেল লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও তার দিক থেকে অগ্রসর হবার কোন লক্ষণ পাওয়া

গেল না। বেগুন একটু অধীর হয়ে উঠল। তবে লোকটা এখনও বোঝেনি, না কোন গোবেচারী গোছের চাষা ভুষো হবে?

আলোটা জ্বলে না কেন? কিন্তু এই বেশ-ভূষা নিয়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই যে তার পক্ষে সুবিধার একথা সে জানত। কিরকম লোক না জেনে আরো অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিল এমন সময় লোকটা একবার কাশলে। বেগুনও একবার কাশলে। লোকটা আবার কাশলে!

বেগুনের বুকটা আশায় দুলে উঠল! এ যে জোর করে নকল কাশবার চেষ্টা, তা বোঝা আর কঠিন নয়। আঁচল থেকে ধীরে চাবিটা খুলে বেগুন পায়ের কাছে ফেলে দিলে। তারপর খানিক খোঁজবার ভান্ করে লোকটার দিকে ফিরে বললে, 'আপনার কাছে দেশলাই আছে? আমার চাবিটা একটু খুঁজে দেখব—'

লোকটা চমকে উঠল। সত্যি সে কণ্ঠস্বর চমকাবার মত। এই কণ্ঠ-স্বরটিতে এখনও কৈশোরের অপরূপ কোমলতা ও যৌবনের অসীম মাধুর্য ও স্নিগ্ধ মাদকতা অটুট হয়েছিল। আর সে স্বরে ছিল—নিখিলের সুষমাময় নারীত্বের প্রচ্ছন্ন বিস্ময়ের আভাস।

এই পতিতার জীর্ণ জীবনের জঞ্জালে এই সদ্য-স্ফুট শেফালির মত সৌরভ-শুচি কণ্ঠস্বর কেমন করে থাকতে পারে এইটেই আশ্চর্য। লোকটা চমকে উঠে ছিল কারণ সে এতটা আশা করেনি।

নীরবে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে বেগুনের প্রসারিত হাতে সে গুঁজে দিল।

বেগুন নীচু হয়ে দেশলাই জ্বেলে চাবি খোঁজবার ছল করবার মধ্যেই টের পেলে লোকটা আর একটু সরে এসে বসেছে।

সামনে ইলেকট্রিক বাতিটা আর একবার জ্বলে উঠল কিন্তু বেগুন মুখ তুলে লোকটাকে দেখবার আগেই আবার নিভে গেল! বেগুন মনে মনে বাতির ও বাতিওয়ালার সপ্তম পুরুষ উদ্ধার করে আবার আর একটা দেশলাই জ্বাললে! বাতিটা যেন ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে তামাসা করছিল। এবার আর চাবি খুঁজে পেতে দেরি হল না। দেশলাইটা ফিরিয়ে দেবার ছলে বেগুন লোকটার হাতে একটা আঙুল দিয়ে ধীরে আঘাত করলে তারপর আর একটু ঘেঁষে বসল। বললে, 'ভাগ্যিস্ আপনি ছিলেন, নইলে এই অন্ধকারে চাবি খোঁজা কি সোজা!—'

লোকটা কোন উত্তর দিলে না শুধু অন্ধকারে একটা হাত বেগুনের কোমরে এসে ঠেকল! বেগুন সে হাতটা বাঁ হাতের মুঠোয় খপ্‌ করে ধরে ফেলে একটু চাপ দিলে। অন্ধকারের মধ্যে স্পর্শ করে বেগুন অনুভব করছিল, হাতটা অত্যন্ত লোমশ ও তার চামড়া অত্যন্ত কর্কশ—লোকটা দেখতে খুব সুশ্রী বোধ হয় হবে না—তা না হোক্।

বার কয়েক মিট্‌ মিট্‌ করে সামনের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আতঙ্কে লোমশ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগুন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার ওপরের ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাতি, ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে, আর তার বাঁ দিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝলসে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

লোকটা বেগুনের এই আতঙ্কে একটুও হতভম্ব হয়নি এমন নয় কিন্তু সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। বেগুন তার দিকে আর না চেয়ে এগিয়ে চলল। অনেক সময় ও অনেক কলা কৌশল তার বৃথা নষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু তা বলে ঐ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে সে স্ফূর্তি করতে পারে না। এর চেয়ে ভাল শিকার সে নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে।

অনেকদিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে অতখানি হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়ে ছিল। একটানা চলার সময় তার বেদনা বিশেষ কিছু অনুভব না করলেও অনেকক্ষণ জিরোবার পর এখন হাঁটা একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এখন জুতো খুলে ফেলাও অসম্ভব, খুঁড়িয়ে হাঁটলেও হাস্যাস্পদ হতে হয় সুতরাং যন্ত্রণা গোপন করে সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবার চেষ্টা করছিল। তাকে হাঁটতেই হবে যে। কিছু দূর গিয়ে একবার সে পেছন ফিরে তাকাল। লোকটা তখনও তার দিকে চেয়ে সেই বেঞ্চিতেই বসে ছিল।

নির্মম জুতোর নিঃশব্দ পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন হয়ে উঠলেও সে অনেকক্ষণ নানাদিকে ঘুরে বেড়ালো। মেলার মজা ও আমোদ লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। চারিদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিকার অনুসন্ধান করাতেই সে একেবারে তন্ময় হয়েছিল। যত সময় যাচ্ছিল তার আশঙ্কা ও অস্থিরতা তত বেড়ে উঠছিল। এ পর্যন্ত কোন সুবিধা সে করতে পারেনি। কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষের আশে-পাশে ঘুরে বেড়িয়ে ও কয়েক-জনকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে কোন ফল হয়নি।

শাখায় শাখায় লাল বাতি-দেওয়া ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় বেশী ভিড জমে ছিল। সেটা জুয়ার আস্তানা। লোহার আলের ওপর ঘুরে ঘুরে একটা ছ-কোণা কাষ্ঠখণ্ড খেলোয়াডদের ভাগ্য নিরূপণ করছিল। বেগুন যখন গিয়ে সেখানে দাঁড়াল তখন ভাগ বাঁটরা হচ্ছে—এক তরফা খেলা শেষ হয়ে গেছে।

একটি বামনাকার স্থূলকায় লোক স্মিতবদনে এক তাড়া নোট পকেটে রাখছিলেন। খুশীতে তার দুভাঁজ চিবুক তিন ভাঁজ হয়ে উঠেছে। বেগুন ঠেলেঠুলে তাঁর পাশে জায়গা করে নিলে। তার ঠিক বিপরীত দিকে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে একটি ফিরিঙ্গি যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁডিয়ে কি বলছিল। তাদের কথাবার্তা না বুঝলেও হাবভাবে বেগুন বুঝতে পারলে ছেলেটি সম্প্রতি অনেক লোকসান দিয়ে আর খেলতে না চাইলেও মেয়েটি তাকে ছাডতে দিতে চায় না।

ইতিমধ্যে মোটা ভদ্রলোক পাচ নম্বরে একটা দশ টাকার নোট ধরেছেন। আবার কাষ্ঠখণ্ড ঘুরল। তারপর চারদিক থেকে কোলাহল উঠল, চার নম্বর মার দিয়া।

মোটা ভদ্রলোকটি রাগে টেবিল চাপড়ে আর একটা দশ টাকার নোট বার করলেন। ওদিকে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সাথে মেয়েটির বচসা শুরু হয়েছে। ছেলেটি এবারেও হেরেছে ও মেয়েটি আর একটি ফিরিঙ্গি বুড়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খানিক বচসা করে ছেলেটি মুখ রাঙা করে চলে গেল। বেগুন মোটা লোকটির আরো কাছ ঘেষে একবার জুতো দিয়ে তাঁর পা-টা মাড়িয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ আবার ক্ষমা চেয়ে সে বলতে যাচ্ছিল 'মাফ করবেন দেখতে পাইনি।' কিন্তু লোকটির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি তার জুতোর চাপ বোধ হয় টেরই পাননি।

আবার খেলা শুরু হল। এবার নম্বর উঠল 'দুই'। মোটা লোকটির টাকা ছিল তিনে।

পেছন থেকে একটা ধাক্কা এল। বেগুন সামলাতে না পেরে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলে।

'এইও পাজী বদমাস!' ভদ্রলোক এক ঝটকায় তার হাত দুটো ছাড়িয়ে তাকে অন্য পাশে ছিটকে দিলেন। বেগুন এবার সত্য সত্যই অতি কষ্টে পেছনের লম্বা চওড়া এক শিখের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাল।

'আরে হিঁয়ে তো মর্ যাওগে' বলে শিখ তাকে ভিড় থেকে ঠেলে বার করে দিলে। সে অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে আর তার সাহস হচ্ছিল না। ভিড়ের বাইরে সে এর পর কি করা যায় ভেবে পেল না।

যে সব পথে, সারি সারি আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত দোকানের সামনে দিয়ে অসংখ্য লোকজন যাতায়াত করছিল সেখানে তার যাবার উপায় নেই। তার সাজ সজ্জার অসংখ্য ত্রুটি, তার অস্তমিত যৌবনের কুশ্রীতা সেখানে আলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে। নিশাচর শ্বাপদের মত তার অন্ধকারের সঙ্গেই আত্মীয়তা। একটি বয়স্ক সুবেশ বলিষ্ঠকায় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে চেয়ে গেলেন খানিক দূর গিয়ে আর একবার ফিরে চাইলেন তারপর ডানদিকের ঝিলের ওপরকার ছোট সাঁকো পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেগুন সন্দিগ্ধ মনে তাঁর পিছু নিলে। সাঁকো পার হয়ে একটা ছবির ঘরে গিয়ে বেগুন আবার তাঁকে দেখতে পেলে। ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে যেন কি খুঁজছিলেন। সে বিপরীত দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে। ভদ্রলোক বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করেননি। হঠাৎ বেগুন তাঁর দিকে ফিরে বললে, 'আচ্ছা তের বছরের মেয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে?'

ভদ্রলোক বোধ হয় শোনেননি, কোন উত্তর দিলেন না। বাম পাশ থেকে কে মিহি গলায় বললে, 'হ্যাঁ, তের বছরের মেয়ে আবার অমনি আঁকতে পারে! ও অমনি বাড়িয়ে লিখেছে।'

পেছনে শশী, তার জিরাফ-গর্দন, কাঠঠোক্‌রা-মুখো বাবু ও মাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। বেগুন আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল। মাসী একবার তার বেশের দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। শশী একটু হাসলে। কিন্তু তখন শশীর সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিত যৌবনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে ঈর্ষান্বিত হবার সময় তার ছিল না। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন; বেগুন তাঁর পিছু নিলে। মাসী পেছন থেকে বলছে শুনতে পেলে, 'ওই রূপের আর দেমাক দেখে বাঁচি না—'

ভদ্রলোক বেশ জোরে হাঁটছিলেন। হয়তো এ অনুসরণে কোন লাভ হবে না ভেবেও এবং পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেগুন যথাসাধ্য জোরে হাঁটতে শুরু

করলে। প্রকাণ্ড একটা নাগরদোলার সামনে গিয়ে তিনি বললেন। বেগুন এবার মরিয়া হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বললে—'আসুন না ঐ চেয়ারটা খালি আছে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলেন। ভদ্রলোক শুনতে পাননি ভেবে বেগুন কম্পিত বুকে, হাতে একটু টান দিয়ে বিবর্ণ-মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে আবার বললে, 'আসুন না ওই দোলনাটায় একবার চড়ে আসি।' কিন্তু তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাঁর হাত ছেড়ে দিল। ভদ্রলোকের মুখে চোখে অসীম বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ ফুটে উঠেছিল। এমন দুঃসাহস অবশ্যই তিনি আশা করেননি। ক্রোধ-কটুকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমার এই বেয়াদবির জন্যে তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জান?—নচ্ছার পাজী মেয়েমানুষ কোথাকার।—'

বহুদিনের পুরাতন বেদনাটা আবার বুকের পাঁজরায় পেরেক ঠুকছিল। ভদ্রলোক বলছিলেন, 'তোমার এতবড় আস্পধা—'

হঠাৎ পাশ থেকে একটি ছেলে ডাকলে 'বাবা। ওমা, এই যে বাবা।' আধ ঘোমটা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। বেগুন ভদ্রলোকের ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার সুযোগে সেখান থেকে সরে গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা চেয়ারে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মাথাটা ঘুরছিল, চোখেও যেন একটু ঝাপ্‌সা দেখছিল—এখন যদি একটু মদ পেত।

কিন্তু ক্রমশঃ সময় যাচ্ছে। আজ যাহোক্ কিছু রোজগার করা চাই-ই। এখন মনে হচ্ছিল, সেই প্রথম শিকার অবহেলা করা হয়তো উচিত হয়নি কিন্তু সে যে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে এক জড়ভরতকে কাঁধে ভর করিয়ে এনে একটি মেয়ে তার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলে। মেয়েটি যে তারই সমশ্রেণীর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এই অষ্টাবক্র মূর্তিমান জরাকে কোথা থেকে সে পাকড়াও করলে।

বুড়োকে চেয়ারে বসিয়ে মেয়েটা বললে, 'খবরদার এখান থেকে নড়িসনি বুড়ো; তাহলে তোর হাড়মাস আর এক জায়গায় রাখব না।' বুড়ো সুরা-জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে কি বললে বোঝা গেল না। মেয়েটা বললে, 'দে টাকা এক বোতল আনি।' তারপর বুড়োর পকেটে হাত দিলে। কিন্তু এ বিষয়ে বুড়ো এখনও খুব সজাগ, সে আর্তকণ্ঠে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বললে, 'ঐ নিলে, সব চুরি করে নিলে।' মেয়েটা বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে

হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, 'দে তবে হতচ্ছাড়া তুই নিজেই দে।' বুড়ো পকেট থেকে একটা নোট কম্পিত হাতে বার করে দিলে; মেয়েটা চলে গেল।

বেগুন নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। বুড়োর যেমন রূপ তেমনি বেশ! তার দেহের গঠন দেখলে মনে হয়, মাত্র সম্প্রতি সে চতুষ্পদে চলা ত্যাগ করেছে! তার কুৎসিত মুখের লোল-মাংসে ও প্রতি রেখায় সারাজীবনের পৈশাচিক ইতিবৃত্ত লেখা। বেশ তার অদ্ভুত। শীর্ণ দেহে একটা ময়লা চাপকান এবং সে চাপকানের ওপর আবার এক দুর্গন্ধ নোংরা চাদর। গলায় কম্ফর্টার জড়ান, পাঁকাটির মত সরু ও ধনুকের মত বাঁকা পায়ে লাল মোজা ও ক্যাম্বিশের ছেঁড়া জুতো। ঐ ধ্বংসাবশেষের মাঝে মৃত্যুর ভ্রূকুটির তলেও কদর্য কামনার বীভৎস উৎসবের লীলা আজও থামেনি! বেগুনের নিঃসাড় মনেও ঘৃণা ও বেদনা জাগছিল।

কিন্তু বৃদ্ধের পকেট টাকায় ভরা। ঐ মেয়েটার বদলে যদি সে নিজে আজ একে শিকার করতে পারত, কিছুদিনের দুর্ভাবনা অন্তত: ঘুচত। একবার ইচ্ছে হল যে মেয়েটার অনুপস্থিতিতে বুড়োকে ভুলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায়, কিন্তু সাহস হল না। মেয়েটা যদি আর না আসে, তাহলে হয়তো ভালো হয় কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব কম। মেয়েটার কিন্তু অনেক দেরি হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটিকে আর ফিরতে না দেখে বেগুন অবশেষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলে না। বৃদ্ধ বোধ হয় ঝিমোচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বসল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা উঁকি মারছিল। একবার ইচ্ছা হল, এই অবসরে মনিব্যাগটা নিয়ে সরে পড়ে; কোন হাঙ্গামা নেই, কেউ দেখতেও পাবে না। কিন্তু সে সাহস হল না, বুড়ো সে সুযোগ দিলেও না, হঠাৎ চোখ চেয়ে বলল, 'কে রূপো এলি? দে বোতল দে!'

বেগুন বললে, 'আমি রূপো নই—'

'আচ্ছা তুই সোনা, দে এখন বোতল দে।'

সে হাত বাড়ালে।

'বা, আমি বোতল কি জানি!'

বুড়ো এবার চটে উঠে বললে, 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? দে বলছি বোতল।'

বেগুন বুড়োকে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললে, 'মর বুড়ো, আমি কি তোর রূপো, তোর রূপো চম্পট দিয়েছে।'

বুড়ো এবার সচেতন হয়ে উঠল। বেগুনের দিকে চেয়ে বললে 'কোথায় গেল রূপো! তুই কে!' তারপর দুর্বল পায়ে উঠবার চেষ্টা করলে। বেগুন তাকে নিরস্ত করতে গেল। বুড়ো চীৎকার করে বললে 'না-না আমার রূপোকে খুঁজব, ছাড় তুই মাগী।' কিন্তু বুড়োর ওঠবার ক্ষমতা ছিল না, বেঞ্চিতে আবার টলে পড়ল। বেগুন বৃদ্ধের গলা বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বললে, 'রূপো থাকৃগে, আমি তোকে বোতল দেব, চ আমার সঙ্গে!'

'না-না আমার রূপোকে চাই।' বৃদ্ধ বেগুনের বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্ত হবার দুর্বল চেষ্টা করতে লাগল। বৃদ্ধের বুকে মাথাটা রেখে ফুঁপিয়ে কান্নার অভিনয় করে এবার বেগুন বললে, 'কে তোর রূপো? তোকে ফেলে সে পালিয়ে গেল আর আমি তোকে সাধছি তবু আমায় পায়ে ঠেলছিস।' অভিনয়ে চির অভ্যস্ত এই পতিতার পঙ্কিল হৃদয়ও সে জঘন্য অভিনয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল—কিন্তু উপায় নেই।......

বুড়োকে রাজী করিয়ে অনেক কষ্টে তাকে গেটের কাছাকাছি এনে বেগুনের একটু আশা হল। এই দুর্বল অসুস্থ শরীরে এই অথর্ব বৃদ্ধের ভার বয়ে আনা সহজ নয়। বেগুনের সমস্ত দেহ ভেঙে পড়তে চাইছিল কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছোলেই কিছুদিনের মত দুঃখের অবসান হবে ভেবে, আশায় সে প্রাণপণে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে হাঁকলে, 'এই ও খাড়া হো যাও—'

বেগুন তখনও এগিয়ে চলছিল। লাল পাগড়ি-পরা পাহারাওয়ালা পেছন থেকে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশকণ্ঠে বললে, 'এত্তা চিল্লাতা, শুনতা নেহি?'

সভয়ে বেগুন দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের শিথিলপ্রায় দেহ তার কাঁধে ঝুলছিল।

'ইতো মাত্তোয়ালা হ্যায়, ছোড়্‌দো ইস্‌কো—।'

বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'হাঁ বাবা মাতাল হ্যায়।' বেগুন হতাশ হয়ে শেষ চেষ্টা করে বললে, 'আমার স্বামী যে, পাহারাওয়ালা সাহেব!' দু'চারজন লোক মজা দেখতে জড় হয়েছিল, তারা হেসে উঠল।

'চুপ বদমাস মাগী, দিল্লাগি কর্তা—' পাহারাওয়ালা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেল! অনেকদিন বাদে বেগুনের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল বোধ হয়।

লোকের ভিড় অনেক কমে গেছল। রাত্রি অনেক হয়ে এসেছে। যে পথে প্রথম একৃজিবিশনের ভেতর গিয়েছিল সেই পথেই আবার বেগুন চলতে আরম্ভ করলে। এখন তার মনে হচ্ছিল প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা তার ভয়ানক বোকামী হয়েছে !—ভাগ্যহীনার আবার স্বরূপ কুরূপ।

বেঞ্চিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপর কে যেন শুয়ে আছে মনে হল। ভাগ্যের এত পরিহাসের পর আর দুরাশা করবার তার সাহস ছিল না। কিন্তু নিজের সৌভাগ্য সে প্রথম বিশ্বাস করতেই পারল না। যাকে দেখে সে কিছু পূর্বে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল তার সেই বীভৎস মূর্তিই খানিক পরে তার এত আনন্দের কারণ হবে একথাও সে কল্পনা করতে পারেনি। সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নই বেঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মনের অদ্ভুত বিতৃষ্ণাভরা আনন্দ দমন করে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, 'রাত তো অনেক হয়ে গেছে।' এই জাগানোর অধিকার নিয়ে কোন সন্দেহ কোন সঙ্কোচ কোন দ্বিধা তার মনে আর ছিল না।

লোকটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! লোকটার গায়ে খাকি ছেঁড়া কোট, পরনে আধ ময়লা কাপড় দেখে নিম্ন শ্রেণীর মিস্ত্রী-টিস্ত্রী হবে বলে মনে হয়। লোকটার হাত ধরে তুলে বেগুন কিন্তু অবিচলিতভাবে বললে, 'চল, যাবে না ?'

প্রথম ঘুমের ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা দু'হাতে চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াল। মেলায় লোক আর ছিল না বললেই চলে। তারা দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চলল। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে বেগুনের পা আর চলছিল না। খাবারের দোকানের সামনে এসে বেগুন তাকে থামিয়ে বললে, 'দাঁড়াও, কিছু খাবার আনি, কিছু রেস্ত বের কর দেখি।'

লোকটা ধীরে ধীরে একে একে তিনটে পকেটের ভেতরকার কাপড় উল্টে দেখালে।

কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বেগুন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল 'মিনি পয়সায় ইয়ার্কি দিতে এসেছ হারামজাদা চোর।—'

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের কোন ভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আয়নায় প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেগুন হতাশ হয়ে আর একবার তার পকেট ও পয়সা লুকোবার সমস্ত সম্ভব স্থান নিজে হাতড়ে দেখলে। একটি দেশলাই ও গুটিকতক বিড়ি ছাড়া তার কোন সম্বল ছিল না!

দাঁতে দাঁত চেপে অসীম অসহায় হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে, 'চল—'

এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।

॥ পুতুল ও প্রতিমা ॥

খট্টাঙ্গ পুরাণ | শিবরাম চক্রবর্তী

বহুদিন পরে আবার ভাই দুটিকে দেখা গেল। আবির্ভাবের মতই দেখতে পেলাম। গোলদীঘি কফি হাউসের কোণ ঠেসে বসে।

আমিও ওদের কোল ঘেঁষে পাশের টেবিলে গিয়ে বসেছি। আমাকে দেখে হর্ষবর্ধন—ঠিক হর্ষধ্বনি নয়—অর্ধপরিচিতের মতই অভ্যর্থনা করল—এই যে।

বলেই আবার ভাইয়ের সঙ্গে মশগুল হয়ে গেল গল্পে।

অনেকদিন পরে দেখা। মনে হল, হয়তো আমায় চিনতে পারেনি ঠিক। কিম্বা হয়তো হাড়ে হাড়ে চিনেই—? নইলে শুধু এই যে—এই শুষ্ক সম্ভাষণ—এত কম ভাষণ নিতান্তই হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধ, কিন্তু ও নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কফির পেয়ালায় মন দিলাম। আর কান দিলাম ওদের কথায়…।

'বুঝলি গোবরা, এরকমের আরেকটা কফিহাউস আছে চৌরঙ্গীর কাছে। কিন্তু সাবধান, সেখানে যেন ভুলেও কখনো যাস্‌নে—।'

'কেন, যাব না কেন?' কান খাড়া করা ভাই মাথা চাড়া দিয়েছে: 'কি হয় গেলে?'

'গেছিস কি মরেছিস। এ কফি হাউস তো ভালো। এখানে তো খালি বাঙালী। বাঙালীর ছেলে-মেয়েরাই আসে কেবল। নিতান্ত নিরাপদ। কিন্তু সেখানে—বাবা, যা মারাত্মক।'

বলে তারাত্মক মুখখানা ভাইয়ের চোখের ওপর তিনি রাখেন।
'মারাত্মকটা কি শুনি ?'
'মেমরা আসে সেখানে।' হর্ষবর্ধন বিশদ হন—'মেমরা দেখা দেয়।'
'দিলেই বা। মেম তো আর বাঘ নয় যে গিলে ফেলবে।'
'বাঘের বেশী। না গিলেই হজম করে ফেলতে পারে। তবে আর বলছি কি।···সেদিন একটা মেমের পাল্লায় পড়েছিলাম। ধরেছিল আমায়।'
'কি করেছিলে তুমি ?
'কিছু না। সবে মাত্র সেখানে ঢুকে একটা খলি জায়গা পেয়ে বসেছি। অত বড় হলটা গিস্ গিস্ করছে মানুষে। বাঙালী, পাঞ্জাবী, চিনেম্যান, সাহেব মেমে ভর্তি। হলের মাঝামাঝি একটা থাম ঘেঁষে শুধু দুটিমাত্র চেয়ার খালি। একটি ছোট্ট টেবিল নিয়ে—তারই একটিতে গিয়ে আমি বসেছি। একটু পরেই একটা মেম এসে অন্য চেয়ারটায় বসল।'
'ও এই ধরা। সে তোমাকে ধরবার জন্যে নয় গো দাদা, বসবার আর জায়গা ছিল না বলেই—' বলতে যায় গোবর্ধন। নিজের দাদাকে সে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না।
'শোন্ না আগে। সবটা শোন্ তো।' হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'মেমটা বসেই না আমাকে বলল—'গুড্ ইভনিং মিস্টার।' আমি তার জবাব দিলুম— 'গুড্ নাইট মিসেস্।'
'তুমি গুড্ নাইট বলতে গেলে কেন ? গুড্ নাইট তো বলে লোকে বিদায় নেবার সময়।'
'তখন কি আর ইভনিং ছিল রে ? সন্ধ্যে উৎরে গেছে কতক্ষণ। আটটা বাজে প্রায়। আমি শুধু মেমটার ভুল শুধরে দিয়েছি। কিন্তু বলতে কি, আমি অবাক হয়েছি বেশ। মেমরাও ইংরেজিতে ভুল করে তাহলে ? আশ্চর্য!'
'তারপর ? তারপর ?'
'তারপর মেমটা কি যেন বলল ইংরেজিতে, তার একটা কথাও যদি আমি বুঝতে পেরেছি—।'
'নিশ্চয় খুব ভুল ইংরিজি ?'
'ক্যা জানে। তারপরে করল কি মেয়েটা। তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বের করল আর ছোট্ট একটা পেন্সিল। কি যেন লিখল কিছুক্ষণ ধরে, তারপরে দেখাল সেটা আমায়।'

'তুমি পড়তে পারলে ?'

'পারব না কেন, ইংরিজি তো নয়। পেয়ালা।'

'পেয়ালা ? পেয়ালা আবার কোন্ দেশী ভাষা দাদা ?'

'এই পেয়ালারে বোকা।' হর্ষবর্ধন কফির পাত্রটা তুলে ধরেন— 'এই বাংলা কাপ্ ডিশ্। এই না এঁকে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যাকে বলে সপ্রশ্ন নেত্রে।'

'তুমি কি করলে ?'

'আমি বুঝলাম মেমটা এক পেয়ালা কফি খেতে চাইছে।' আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে বেয়ারাকে কফি অনতে বললাম—দু পাত্তর। আমাদের দুজনের জন্যে।'

'মেমটা দেখতে কেমন ?'

'মেম—মেম। আবার কেমন ? মেমরা যেমন হয়ে থাকে। তবে বয়েস বেশি নয়, এই পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বাঙালীর মেয়ের মত অত সুন্দর না হলেও দেখতে ভালোই বলতে হবে।'

'তাই বলো।' গোবর্ধন সমঝদারের মতন ঘাড় নাড়ে : 'প্রেম করার মত মেম ? তা বলতে হয়।'

'কি যে বলিস। তোর বৌদি যদি জানতে পায়—। তারপর শোন্। আমি ভাবলাম একটা মেয়েকে কি শুধু শুধু কফি খাওয়ানো ঠিক হবে ? সেটা যেন কেমন দেখায়। তাই আমি ওর খাতাটা নিয়ে একটা পাতায় টোস্‌টের মতন কতকগুলো আঁকলাম। এঁকে দেখালাম ওকে। দেখে সে বলল—ইয়েসিয়েস্। থ্যাঙ্কু।'

'ইয়েসিয়েস্ মানে ?' গোবরা জানতে চায়।

'মানে, তুই যা করেছিস এখন। হাঁ।' দাদা জানায়—'ইয়েস্ মানে জানিসনে বোকা ? তারি ডবোল, বুঝেচিস এখন ? আর থ্যাঙ্কু মানে—'

'জানি জানি। বলতে হবে না আর। তাহলে মেমটা তোমার কথায় হাঁ হাঁ করে উঠল বলো ?'

'করবে না ? তারপর মেমটা করল কি, এক জোড়া ডিম এঁকে দেখাল আমায়। বুঝলাম যে টোস্‌টের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ চাইছে। তাও তখন আনতে বললাম বেয়ারাকে।'

'বাঃ বেশ তো!' বলে গোবরা সুরুৎ করে জিভের ঝোল টানে।

'মেয়ের কথা শুনে যে তোর জিভ দিয়ে জল পড়ছে দেখছি।'

'মেয়ে নয়। মেমলেটের কথা ভেবে দাদা। মেয়েটা মেমলেট খেতে চাইল না?'

'ওর ডিম পাড়বার পর তারপর আমি খাতাটা নিলাম। নিয়ে এক প্লেট কাজু বাদাম আঁকলাম। আর ও আঁকলো—কতকগুলো চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা কি যেন। মনে হল পাঁপডভাজা। কিন্তু বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে পাঁপডভাজা সেখানে মেলে না। আলুভাজা হতে পারে। সে আলুভাজা নিয়ে এলো। আর কাজুবাদামও। আলুভাজা পেয়ে মেয়েটাকে খুশী হতে দেখে তখন বুঝলাম যে সে আলুভাজাই চেয়েছিল।'

'আলুভাজা আর পাঁপডভাজার কি এক চেহারা?' গোবরা নিখুঁত চিত্র-সমালোচকের ন্যায় খুঁৎ খুঁৎ করে। 'দুটোর আকার কি একরকম?'

'তা কি হয়রে? কিন্তু ছবি দেখে কিচ্ছু বোঝবার যো নেই। এই যে মশাই, আপনাকেই বলছি—হর্ষবর্ধন সম্বোধন করেন আমায়—আঁকার বিষয়ে আপনি কিছু জানেন? বলুন তো, আঁকতে গেলে এমনটা হয় কেন? পাঁপড-ভাজার সঙ্গে আলুভাজা এমন মিলে যায় কেন?'

আঁকের বেলায যেমন একেক সময় মিলে যায় না? তেমনি আর কি। আবার আঁকের মতই অনেক সময মেলেও না ফের। ভালো আঁকিয়ে হলে তবেই মেলাতে পারে। এমন ইদুর আঁকবে যে মনে হবে যেন হাতী। আবার উটপাখীকে মনে হবে মুরগি—ঐখেনেই আঁকার বাহাদুরি।'

'কি করে তা হয়ে থাকে?' দুই ভাই একসঙ্গে শুধায়। দুজনের মুখে ডবোল ইযেস্ দেখা দেয।

'ব্লকের কেরামতি মশাই। আঁকা তো কিছুই না। আঁকিয়ে তো এক টুকরো কাগজে ছোট্ট করে একটুখানি আঁকে। যারা ব্লক করে তারাই হচ্ছে ওস্তাদ। তারাই মাথা খাটিয়ে দরকার মাফিক সেইটাকে বাডিয়ে কমিয়ে যে ছবিটি চাই তার মতন ব্লক বানিযে দেয়। ধরুন, আপনি লিচু এঁকেছেন। কিন্তু আপনার দরকার কাঁঠালের। ব্লকমেকার সেই লিচুকেই বড করে বাড়িয়ে কাঁঠাল বানিযে তার ব্লকে আনতে পারে। একই আঁকুনি ছোট করলেই লিচু আর বড করলেই কাঁঠাল।'

'ছোট করলেই লিচু আর বড় করলে কাঁঠাল? বাবে!'—গোবরা অবাক হয।

'তাহলে আমি যে কাজুবাদাম এঁকেছিলাম, ব্লকওয়ালা ইচ্ছে করলে সেই ছবির থেকেই কুমড়োর ঝুড়ি বানাতে পারত ?'

পারতই তো।'

'যাগকে,' আমাদের শিল্প-তাত্ত্বিক আলোচনায় গোবর্ধন বাধা দেয়।—'তারপর কি হল বলো না দাদা।'

'তারপর অনেক কিছুই খেলাম আমরা—একটিও কথা না বলে—শুধু কেবল ছবি চালিয়ে। প্রায় টাকা পনেরর মত খাওয়া হল। তারপর বেয়ারা বিল নিয়ে এলে আমি একটা একশ টাকার নোট দিয়েছি আর সে ভাঙিযে আনতে গেছে এমন সময় দেখলাম কি—মেয়েটা একমনে কি যেন আঁকছে তখনো।'

'তোমার চেহারা বুঝি ?' গোবরার মুখে বেয়াড়া হাসি দেখা দেয়।

'এই চেহারা আঁকা কোন মেয়ের কম্মো না। ছোট্ট একটু খাতার পাতায়। তোর মত রোগা পাতলা হলেও হয়তো হত। আঁকা শেষ করে ছবিখানা সে আমার হাতে দিল। দিয়ে একটুখানি—যাকে বলে সলজ্জ হাসি—হাসল।'।

'ওর নিজের ছবি বুঝি ?'

'না, দেখলাম একটা খাট এঁকেছে সে।'

'খাট ? খাট কেন ? খাট কি কোন খাবার জিনিস ? শোবার তো জানি।' গোবরা অবাক হয়, 'ও বুঝেছি, তোমাকে আরো খাটাবার মতলব ছিল মেয়েটার।'

'আমি কি মশারি যে আমায় খাটাবে ? অত সোজা নয়।' হর্ষবর্ধন আপত্তি করেন। 'কিন্তু কেন যে সে খাট আঁকলো তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।'

'কিরকম খাট ? দুগ্ধফেননিভ ?' আমি শুধাই।

'বেশ বড খাট। খাট যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্যে না, আমার তাক্ লাগলো এই ভেবে যে, আমি যে খাটের জন্মদাতা, কাঠের ব্যবসা যে আমাদের, তা সেই মেয়েটা টের পেলে কি করে ? এর রহস্য আমি ভাই এখনো অব্দি বুঝতে পারিনি। থ হয়ে রয়েছি সেই থেকে—রহস্যের থই না পেয়ে, বুঝচেন মশাই !'

॥ মেয়েদের মহিমা ॥
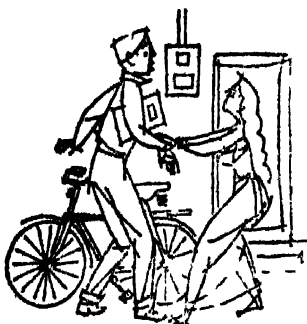
শিকার | প্রবোধকুমার সান্যাল

ছেলেমানুষের মনে যে দাগ পড়ে সেই দাগ কোনদিন মোছে না। মার খেলেও যে-দাগ, ভালোবাসা পেলেও সেই দাগ। ও দুটো সমানভাবেই গাঁথা থাকে।

তরুদিদির বাঁকা চোখে থাকত খরদৃষ্টি—কিশোর বালক আন্দুর নীরোগ স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টি ভরে উঠত ঈর্ষায়। আন্দুর গা ছমছম করে উঠত ভয়ে। সে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেত এই দূর-সম্পর্কীয়া দিদির সামনে।

চিরকালের জন্য এই দাগ বসে গেছে।

তরুদিদি জমিদারের বউ। বাপের বাড়ীটি হল গরীবের ঘর—বিধবা মা শুধু আছেন। বছরের মধ্যে তিন-চার বার তরুদিদি তাঁর রুগ্ন এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে উঠতেন ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য। ওদের মধ্যে একটি মেয়ের আবাল্য মৃগীরোগ, এবং কোলের ছেলেটির আজন্ম পুঁয়ে রোগ। সুস্থ সন্তান কাকে বলে, তরুদিদি সেটি জানতেন না। রূপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়া তাঁর জমিদারিতে আর সবই ছিল।

কিন্তু এই দুটি অভাবের একটি পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর নিজেরই

সর্বাঙ্গে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে এবং একথা বলা চলে—প্রত্যঙ্গেও, ভারি ভারি অলঙ্কার কম-বেশী দুই সের সোনারুপোর ভরা থাকত এবং রাত্রের দিকে কোলের শিশুটি কেঁদে উঠত বার বার তাঁর সোনার গহনার খোঁচায়। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক কি প্রকার, সেটি খুব স্পষ্ট নয়।

গহনার ভারে তিনি হাঁপাতেন—কেন না মানুষটি হলেন স্থূলাঙ্গ ও খর্বকায়া—আর তাই দেখে দরিদ্র পরিবারের সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো।

সেবার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তিনি বাপের বাড়ীতে ঢুকেই প্রথমে কঠোর সম্ভাষণ করলেন তাঁর বিধবা ও নিরুপায় জননীকে—এতটুকু বিবেচনা নেই তোমাদের ঘটে? আমার যে চর্বির ব্যামো, মনে নেই তোমাদের? একজন লোক পাঠাতে পারনি ইস্টিশানে? বাড়িসুদ্ধ আক্কেলের মাথা খেয়েছ?

মা বললেন, তেমন তো কেউ নেই, কে যাবে মা?

কে যাবে! মরেছে বুঝি সব? আগে বললেই পারতে! আমি না হয় নাই আসতুম।

ম্লান হাসি হেসে মা চুপ করে গেলেন। কিন্তু তরুদিদির এই উগ্র কঠোর প্রথম সম্ভাষণে বাড়িসুদ্ধ সবাই হতবাক।

এবারেও তাঁর সঙ্গে আছে সেই ঝিয়ের মেয়েটা। ওর নাম হিমি। এ বাড়ির ছেলেমেয়ে মহলে সে খুব পরিচিত। মেয়েটা তরুদিদির দু চোখের বিষ হলেও বার বার সঙ্গে আসে এবং তারই জন্য তরুদিদির অবস্থানকালটি বেশ সরগরম থাকে। হিমি হল ওঁদের গায়ের এক প্রজার মেয়ে, বছর এগারো বারো বয়স এবং অতিশয় স্বাস্থ্যবতী। বস্তুত, ওর স্বাস্থ্যের কাঠিন্যই হল যেন ওর অপরাধ। হিমি এসে পৌঁছলেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে মিশে যায় এবং তরুদিদি ক্রুদ্ধ বিদ্বেষে সেটি পর্যবেক্ষণ করেন। মেয়েটা বিশেষ কারো অপ্রিয় ছিল না।

তরুদিদির ছেলেমেয়েদের চেহারায় জমিদারগোষ্ঠীসুলভ কোনও ছাপ নেই। সবগুলিই কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কাল ও হতশ্রী। প্রথমেই খাবার জন্য তারা বাহানা ধরলো—কেউ শুয়ে পড়লো আনাগোনার পথে, কেউ ঢুকলো রান্না-ভাঁড়ার ঘরে, কেউবা নোংরা করে বসলো একেবারে সকলের মাঝখানে। কিন্তু সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রথমেই ছুটে এসে তরুদিদি

হিমির গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন,—হারামজাদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস্? ওদের সামলাতে পারিসনে?

আন্দু বলে উঠল, ওর কোন দোষ নেই, তরুদিদি!

থাম্, ছোট মুখে বড় কথা কসনে। তরুদিদি কঠোর কণ্ঠে এক হাঁক দিলেন। আন্দু কাঁচুমাচু হয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

মেয়েটাই যে কেবল বিনা দোষে মার খেলে তাই নয়, ওই চপেটাঘাত পড়ল সমস্ত বাড়িখানারই গালে—অন্তত ওব প্রতিধ্বনি সেই কথাটাই প্রকাশ করল। সেই কারণে হিমির উপরে এই নির্বিচার লাঞ্ছনাটা সবাই যেন একটি মুহূর্তে নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে নিল।

হিমি কিন্তু একটু অন্য ধরনের। মার খেলে সে ভ্রূক্ষেপ করে না এতটুকু। বিড়ালকে মারলে বিড়াল সরে যায় বটে, কিন্তু নিজের হাতে লাগে। হিমির দেহ পাথরের মতো শক্ত আর নিরেট। এর আগে দেখতে পাওয়া গেছে ঠাণ্ডায় বর্ষায় ওব কিছু হয় না। অযত্নেই মেয়েটা সুস্থ থাকে। আধ সের চালের পান্তা ভাত খায় এক খাবল নুন আর তেঁতুল দিয়ে। যেখানে সেখানে পড়ে লোহার মতো ঘুমোয়। ডাকলে বরং পাড়ার লোক জাগে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

মনিবের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থেকে তাঁকে তুষ্ট রাখাই ভৃত্যের কর্তব্য, —কিন্তু হিমি ছিল অন্যরকম, এটি তরুদিদি অনুভব করতেন। তাঁর মনে হত, হিমি তাঁকে গ্রাহ্য করে না। রাগও ছিল সেইখানে।

কোলের ছেলেটার পুঁয়ে রোগ, কিন্তু তাকে ভুলিয়ে শান্ত রাখা ছিল শিবেরও অসাধ্য। তবু ওই কাজটিই ছিল হিমির। আড়াল থেকে আন্দু সকৌতুকে দেখত, কাঁদুনে ছেলেটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে হিমি তাকে কাঁদাচ্ছে আরো বেশী এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটাকে টিপে টিপে দু-এক ঘা বসিয়েও দিচ্ছে, আবার চেঁচালেও মুখ টিপে ধরছে। একসময় ছুটতে ছুটতে আসেন তরুদিদি। চীৎকার করে বলেন, আমাকে ভাত তুলতে দিবিনে মুখে? কেন তুই ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারিসনে? বদমাইস নচ্ছার—!

হিমি গোঁজ গোঁজ ক'রে বলে, অত কাঁদলে আমি কি করবো?

ফের আমার মুখের ওপর কথা?—তৎক্ষণাৎ তরুদিদি রাগে অন্ধ হয়ে যান এবং পলকের মধ্যে একপাটি জুতো এনে হিমির পিঠে সজোরে বসিয়ে দেন।

হিমি একটুও নড়ে না, কাঠের মতো বসে থাকে। ছেলেটা আবার চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। আন্দু গা ঢাকা দিয়ে চলে যায়।

তরুদিদির উচ্চকণ্ঠের দাপটে বাড়িসুদ্ধ সবাই তটস্থ।

ওরই মধ্যে হিমি আবার একটু খামখেয়ালীও বটে। কাজ করে যখন, তখন সে অক্লান্ত। বাজার করে, ওষুধ আনে, নোংরা কাঁথা কাচে, বাসন মাজে, এঁটো পাড়ে, জল তোলে, রান্নাবান্নার যোগাড় দেয়, ঘরদোর ঝাঁটায়। কিন্তু তার মেজাজ যদি ভালো না থাকে, তাহলে সেদিন আর রক্ষা নেই। বাজার থেকে পচা মাছ কিনে আনবে, ওষুধের শিশি ভেঙে আসবে, বাসনপত্র ফেলবে ঝনঝনিয়ে, জলের বালতি কাৎ করবে শোবার ঘরে, রান্নাঘরের এটোকাঁটা ফেলে রাখবে—সেদিন ওকে দিযে আর কোন কাজ করাবার উপায থাকবে না। ছোট ছেলেটা যদি সেদিন কেঁদে কেঁদে ককিযেও যায়, হিমি ভ্রূক্ষেপও করবে না, বরং নিজে একসময় ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। আর নয়তো সেদিন এমন ঘুম ঘুমোবে যে, একেবারে পাথরের ডেলা। সকালের দিকে শোবে, বিকেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু আশ্রিত অনাথা ঝিয়ের এই স্পর্ধা তরুদিদি বরদাস্ত করবেন, তেমন মানুষ তিনি নন্। কাঠের চেলা নিযে তিনি একসময উঠে যেতেন সেই চিলেকোঠায় এবং কোন বিচার বিবেচনা করে দেখার আগেই তিনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে মেয়েটাকে সায়েস্তা করতে আরম্ভ করতেন। হিমি অনড় হয়ে মার খেত।

আন্দু চুপ করে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকত। আশ্চর্য, এত মারধোর, কিন্তু মেয়েটা কোনদিন কাঁদল না। লোহার মতো কঠিন নিশ্চল হযে থাকত, আর পিঠের ওপর দিযে গাছ-পাথর চ'লে যেতো। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে তরুদিদির ত্রিসীমানা থেকে দূরে দাঁড়িযে লক্ষ্য করতো, অন্ধ আক্রোশে তরুদিদির চোখ দুটো দপদপ করে জলছে। অমনি এক উত্তেজনার কালে একদিন আন্দু পড়ে গিয়েছিল তরুদিদির মুখোমুখি। তরুদিদি কেমন একপ্রকার তীব্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দূর সম্পর্কের ছোট ভাইটি:ক প্রশ্ন করলেন, তোর অসুখ করে না কেন? কি খাস তুই? কি জন্যে ভালো থাকিস?

সুস্থ থাকাটাই যেন অপরাধজনক। ভয় পেয়ে থতিয়ে মুখখানা লুকিয়ে আন্দু সেখান থেকে সরে গেল।

রোষে ক্ষোভে উত্তেজনায় তরুদিদি ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে আবাল্য ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। একটি মেয়ের মৃগীরোগ,—কথায় কথায় সে বেঁকেচুরে যায়। পরের ছেলেটি জ্বর আর আমাশয়ে শয্যাগত। শান্তি ছিল না তাঁর। অথচ কী পরিমাণ অলঙ্কার সর্বাঙ্গে। তরুদিদির ওই ক্রুদ্ধ চলাফেরার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গের গহনাগুলি ঝমর-ঝমর করে বেজে ওঠে। গহনাগাঁটি খুলে রাখা জমিদারের স্ত্রীর পক্ষে নাকি সম্মানজনক নয়। তাঁরা পুবদেশের মস্ত জমিদার।

মাঝরাত্রে সহসা একদিন চীৎকার করে উঠলেন তরুদিদি। রাত তখন বোধ হয় বারোটা। মা এলেন ছুটে, বুড়ো দাদুর ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য। তরুদিদির মাথা ধরেছিল সন্ধ্যাবেলা থেকে। হিমির ওপর হুকুম হয়েছিল, সে মাথার কাছে বসে তরুদিদির মাথা টিপে দেবে। ছেলেমানুষ মেয়ে, মাথা টিপতে টিপতে একসময় তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে। তরুদিদি তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মতো উঠে দাঁড়ান এবং সেই অন্ধকারে হিমির শরীরের কোথায় যেন কিভাবে আঘাত করেন, মেয়েটা নিজের পেটটা দুই হাতে চেপে ঘুমের ঘোরে এক-প্রকার আর্তনাদ করতে থাকে। চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এলো। তরুদিদি তারই ওপর হিমিকে এর মধ্যে দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছেন। তরুদিদির মা মেয়েটাকে টানতে টানতে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আন্দু ঠাহর করে দেখল, হিমি মুখের আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু চোখে তার এক ফোঁটাও জল নেই। আশ্চর্য, মেয়েটাকে কোনোমতেই কাঁদানো যায় না। কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য সে-রাত্রে সবাই মিলে তরুদিদিরই সেবা করতে লাগলো।

একদিন হিমি আবার এক অপাট করে বসল। তরুদিদির নতুন পছন্দসই শাড়িখানা কাচতে গিয়ে বালতির খোঁচায় ছিঁড়ে ফালা দিয়ে লুকোতে দিল। ঘটনাটা তখন ঠিক টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিকেলে গা ধুয়ে এসে শাড়িখানা জড়াতে গিয়ে তরুদিদি একেবারে শিউরে উঠলেন। এ কাজ হিমি ছাড়া আর কারো নয়। তিনি বললেন, দাঁড়া, এবার তোর তেজ আমি ঘোচাব।

বাড়িসুদ্ধ থরহরিকম্প। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, হিমির কোন গ্রাহ্যও নেই। একটি বালিকার জীবনে মারপিট যেন সয়ে গেছে—ওটাকে অনিবার্য বলে জীবনের সঙ্গে সে মিলিয়ে নিয়েছে। কোন লাঞ্ছনাতেই তার ভয় অথবা উদ্বেগ—কোনটাই নেই।

একটি ছোট সুস্থ ও সবল মেয়ের 'তেজ ঘোচাবার' জন্য সকলের বড় অস্ত্র হল, তাকে সম্পূর্ণ উপবাসে রাখা। তরুদিদি সেই ব্যবস্থাই করলেন। তাঁর হুকুম এ বাড়িতে অলঙ্ঘ্যনীয়। সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে হিমির আহারাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হল। শুধু তাই নয়, সেই শীতের সন্ধ্যায় নিজে এসে তরুদিদি হিমির কাঁথাকুঁথি নিয়ে চলে গেলেন। তিনি নামজাদা জমিদারের স্ত্রী—অবাধ্য এবং দুঃশীল প্রজাকে কেমন করে সায়েস্তা করতে হয়, তাঁর জানা আছে বৈকি। তাঁর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হিমি এলো, এবং এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে দেখল তার বিছানার পুঁটলিটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। দেখে-শুনে তারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে সটান গিয়ে দাঁড়াল তরুদিদির সামনে। বললে, আমার বিছানা কই?

তরুদিদি চুপ। তিনি সেদিন কিছু অসুস্থ, তাঁর হার্টের অবস্থা সেদিন ভালো ছিল না। উত্তেজনা ঘটলে অসুখ বাড়তে পারে।

হিমি পুনরায় বললে, আমি বুঝি আজ থেকে খাব না কিছু? সবাই খাবে, আর আমি খাব না কি জন্যে?

তরুদিদির পক্ষ থেকে কোন জবাব নেই।—

হিমি বললে, বেশ, আমিও বলে রাখলুম, খেতে না দিলে আমিও কোন কাজ করতে পারব না।

হিমি চলে গেল। লেপ ঢাকা দিয়ে তরুদিদি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন।

দুদিন পরে ব্যাপারটা একটু রহস্যময়ই মনে হচ্ছিল। এক কাঁসি ভাতের কম যে মেয়ের পেট ভরে না, তার সম্পূর্ণ উপবাস চলছে। হিমি খাচ্ছে না একবারও, সেদিকে তার চেষ্টাও নেই। সে ছটফট করবে, পায়ে ধরে কাঁদবে এবং তার বদলে তাকে আরও উৎপীড়ন করা হবে—এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু হিমি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, তার ভ্রূক্ষেপও নেই কোনও দিকে। ডাকলে সে কাছে আসে না, এবং—

বিস্ময়ের কথা—খাদ্যের প্রতি তার কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। বাড়ির সবাই ওই মেয়েটার দুর্ভাগ্যের দিকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত মেয়েটার চেহারা মনে করে কারো কারো মুখে অন্নও রোচে না। কিন্তু তরুদিদির সেদিকে এতটুকু গ্রাহ্য নেই। তাঁর জিদ বেড়ে গেছে। তিনি এবার ওই অবাধ্য মেয়েটার সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত চান। দেখা যাচ্ছে তাঁর হার্টের ব্যামোর কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেমন যেন একপ্রকার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং রুগ্ন ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখে তিনি গোয়েন্দার মতো এদিক ওদিক ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে আসেন, কথায় কথায় সকলকে সাবধান করে দেন কঠিন কণ্ঠে—খবরদার, কেউ ওকে খেতে দেবে না! আমি এর শোধ তুলব।

দিন চারেক হতে চললো, হিমির মুখে অন্নজল নেই। অবাক করে দিল মেয়েটা সকলকে। সে পরম নিশ্চিন্তে একপাশে পড়ে থাকে এবং আহারাদি সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। পরনের সেই নযহাতি ধুতিখানার একপ্রান্ত মেঝের উপর বিছিয়ে রাত্রে সে অকাতরে ঘুমোয়। তরুদিদির মনে পরাজয়বোধ জেগে ওঠে। তিনি চান কেউ ওকে গোপনে খেতে দিক এবং তিনি আহত সর্পের মতো তাকে ছোবল মারুন। কিন্তু এমন ভুল কেউ করে না। তরুদিদি তখন দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে রাত্রের দিকে এক একবার হিমিকে পাহারা দিয়ে আসেন। দেখা যায়, হিমি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। তার নিটোল কঠিন দেহের কোথাও অনশনের কৃশতা নেই।—বলিষ্ঠকায়া স্বাস্থ্যোন্নতা কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে তরুদিদির দুই হিংস্র চক্ষু দপদপ করে যেন অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। অতঃপর আপন বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস চেপে তিনি ফিরে এসে লেপের মধ্যে ঢোকেন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চীৎকার করে সারারাত সবাইকে গালি দিতে পারলে হয়তো তিনি কতকটা স্বস্তিবোধ করতেন।

সেই নিঃসাড় এবং নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ও-মহলের বিছানার ভিতর থেকে আন্দু এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকায়। না, কেউ কোথাও জেগে নেই। শেষবারের মতো টহল দিয়ে তরুদিদি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন, আর তিনি উঠবেন না।

আন্দু পা টিপে টিপে ওঠে। তারপর কুলুঙ্গী থেকে একটি কাগজের

বাক্স নিয়ে চলে যায় দালান পেরিয়ে সেই ছোট ছাদের পাশে। সন্তর্পণে গিয়ে হেঁট হয়ে হিমির কানে কানে সে ডাকে। হিমি জেগেই থাকে আগের থেকে। আন্দু চাপা গলায় বলে, বাক্সের মধ্যে ভাত-চচ্চড়ি আছে। চৌবাচ্চা থেকে জল খেয়ে নিস।

তেমনি পা টিপে-টিপে আন্দু নিঃসাড়ে পালায়। মেয়েটা খাবার আগে ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসে।

পিত্রালয়ে তরুদিদির বসবাস এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে আসত। সকলের অশ্রদ্ধা কুড়োতেন তিনি, সকলকে পরোক্ষ-ভাবে অপমানও করতেন। যারা তাঁর পায়ের তলায় দলিত হত, তাদেরই কাছে তিনি পূজা প্রত্যাশা করতেন। তাঁর ঘৃণার পাত্র ছিল সবাই। তিনি নিজে ছিলেন যেহেতু খর্বকায় ও স্থূলাঙ্গ, সেজন্য কারো মাথা উঁচু হোক—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আন্দুকে কাছাকাছি দেখলে তিনি চাপা উত্তেজনায় ফুলে উঠতেন।

তাঁর যাবার আগের দিন হিমি আবার একটা ভীষণ অপরাধ করে বসল। বোধ হয় মাসিমাই কাপড় শুকোতে দেবার জন্য ছাদে উঠছিলেন। সিঁড়ির ঘরের পাশে চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন, খেজুর গুড়ের একটি নাগ্‌রির মধ্যে হাত ঢুকিযে হিমি গোপনে টাউ-টাউ করে গুড় খাচ্ছে। প্রায় আধখানা নাগ্‌রি সে তখন শেষ করে এনেছে।

খবরটা মাসিমা কোনমতেই চাপতে পারলেন না। উঠে পালাতে গিয়ে হিমি সিঁড়ি উপরেই হুডমুড়িয়ে পড়ে গেল কাপড়ে বেধে। খবর পেয়ে তরুদিদি ছুটে এলেন। তাঁর ঝি চুরি করে খাচ্ছিল, এ তো তাঁরই পক্ষে অপমান। দ্রুতপদে তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে একখানা বঁটি নিয়ে ছুটে এলেন। অমন মেয়েকে আজ তিনি কেটেই ফেলবেন। অনেকের ধারণা, সবাই মিলে তরুদিদির হাত থেকে বঁটিখানা সময় মতো সেদিন কেড়ে না নিলে তিনি মেয়েটাকে সত্যিই হয়তো কেটে ফেলতেন। তাঁরা বড় জমিদার—বছরে দশ বিশটে দেওয়ানি আব ফৌজদারি মামলা তাঁদের নামে আলিপুর কোর্টে ঝুলেই থাকে। ওর ওপর না হয় আর একটা বাড়ত—এই যা। কিন্তু বঁটিখানা হাত থেকে কেড়ে নিলেও তরুদিদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে কারও উপায় ছিল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে একবার হাঁক দিলেন, সবাই সামনে থেকে সরে যাও বলছি। ও আমার ঝি, আমার ভাত-কাপড়ে মানুষ, ওর

ব্যবস্থা আমার হাতে। তোমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।—বলতে বলতে তিনি একগাছা বাঁকারি নিয়ে দৌড়ে এলেন।

সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হিমির বেশ চোট লেগেছিল। হাঁটু কেটে গেছে, কোমরে আঘাত লেগেছে। সুতরাং ওই সিঁড়ি থেকে মেয়েটা আর উঠতে পারেনি। কিন্তু তারই ওপর যখন সপাসপ বাঁকারির ঘা পড়তে লাগল—অদূরে দাঁড়িয়ে আন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল আর্ত কান্নার আওয়াজ। দাঁতের উপর দাঁত রেখে হিমি বসে আছে মাথা নিচু করে—পিঠে আর মাথায় আর পায়ে পড়ছে বাঁকারির ঘা। রক্ত ফেটে পড়ছে তার চামড়া দিয়ে।

কিন্তু কেবল হিমিই মার খাচ্ছে না, মার খাচ্ছে আন্দুও। সংসারে এক একটি প্রাণী এমন জন্মায়। মার খায় একজন মুখ বুজে আঘাত খেয়ে কাঁদে অন্যজন। আন্দু ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—তরুদিদি রোষকষায়িত চক্ষে তার দিকে তাকান।

এতদিন পরে তরুদিদির মা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন—ও ছাড়া তুই কি আর ঝি খুঁজে পাসনি তরু? এবার যখন আসবি, ওকে যেন আর এ বাড়িতে আনিসনে। মরণ হলেই মেয়েটার মুক্তি হয়!

তরুদিদির মা কেঁদে ফেললেন। হিমির মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল।

কিন্তু কান্নাকাটি সবই মিথ্যে হল। একটি দিনের মধ্যেই হিমি দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। গায়ে পিঠে তার দড়া দড়া দাগ, হাঁটুর কাছে কালশিরে, বাঁকারির ঘায়ে কপাল ফোলা—কিন্তু সে সুস্থ। লোহা পুড়ে-পুড়ে ইস্পাতে পরিণত হয়েছে।

যাবার সময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সকলের সঙ্গে হিমি গাড়িতে গিয়ে উঠল হাসিমুখে। গাড়ি ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে তার পথের দিকে আন্দু চেয়ে রইলো।

এরপর তরুদিদি বাপের বাড়িতে এসেছেন অনেকবার। বছরের পর বছর। কিন্তু হিমি আর একটিবারও আসেনি সঙ্গে। সে গ্রামের মেয়ে। গ্রাম থেকেই মায়ের সঙ্গে যেন কোথায় ভেসে গেছে। তার জন্য তরুদিদির কোনও উদ্বেগ নেই। হিমিকে ভুলে গেছে সবাই।

অনেক বছর চলে গেছে তারপর।—

সে-বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। মামিমা মারা গেছেন অনেক কাল আগে। তরুদিদিদের আরও কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। ছড়িয়ে পড়েছে সবাই নানাদিকে।

আন্নু হয়েছে এখন আনন্দমোহন। বিয়ে করে সে ঘরসংসার পেতেছে অন্যত্র। সে এখন ইলেকটিক আপিসে চাকরি করে। কোটপ্যান্ট পরে একখানা খাতা হাতে নিয়ে সে পাড়ায়-পাড়ায় লোকের বাড়ির মেন্-ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষা করে খাতায় টুকে নেয়। সাইকেল চড়ে তাকে আনাগোনা করতে হয়।

মাঝে মাঝে তাকে যেতে হয় অনেক অলিগলিতে। হয়তো বা অনেক নোংরা পল্লীর আনাচে-কানাচেও কাজের জন্য ঢুকতে হয়। ইতর-ভদ্র মানতে গেলে আফিসের কাজ চলে না। তবে কিনা কাজ হল তার মাত্র দুমিনিটের। মিটারের নম্বর মেলানো, আর কারেণ্ট খরচের পরিমাণ পাঠ করে খাতায় টুকে নেওয়া—ব্যস, ছুটি।

হঠাৎ একদিন কিন্তু দু মিনিটে ছুটি পাওয়া গেল না। পিছনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েছেলে প্রশ্ন করল, কত উঠল এবার?

খাতায় টুকতে টুকতে আনন্দমোহন জবাব দিল, আশি ইউনিট।

কথাটা শুনেও স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইল। আনন্দমোহনের সময় কম, এখনও বহু বাড়ি বাকি। খাতা বন্ধ করে সাইকেলখানার দিকে হাত বাড়াবার সময় স্ত্রীলোকটির দিকে তার চোখ পড়ল। সে একটু থতিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির মুখে মধুর হাসি, দুই কানে হীরের ফুল, গলায় জড়োয়া হার। যৌবনের লাবণ্য ঠিকরে পড়ছে!

চেনো?

আনন্দমোহন ঢোক গিলে বললে, হিমি না?

না—হেমাঙ্গিনী! চিনতে পেরেছ দেখছি! ষোল-আঠারো বছর হতে চলল, না?

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি। কতকালের কথা!—আনন্দমোহন ভদ্রকণ্ঠে জবাব দিয়ে একবার সাইকেলখানার দিকে তাকাল।

তোমার সেই তরুদিদির কি খবর? সেই জমিদারের গিন্নী?

আছেন তিনি এক রকম! সেখেই আছেন! তবে আমার ভগ্নিপতিটি মারা গেছেন বছর কয়েক হল।

হেমাঙ্গিনী একটু হাসল। তারপর বললে, তোমার সেই বৌদি আমাকে উপোস করিয়ে রাখত, আর তুমি ভাত চুরি করে অর্ধেক রাত্রে আমাকে খাওয়াতে—মনে পড়ে?

কাষ্ঠ হাসি হেসে আনন্দ জবাব দেয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কত ছেলেমানুষিই করা গেছে!—আচ্ছা, এগারোটা বেজে গেল, এবার যাই!

ও কি কথা—হেমাঙ্গিনী বললে, এতকাল পরে দেখা, সেই ভাতের ঋণ আজ শুধবো বৈকি।

আনন্দ মুখ তুলে তাকাল।—বিলক্ষণ। সেসব পুরনো কাসুন্দি। সেসব কি আর মনে করতে আছে? এবার আমি যাই। বেশ তো অন্যসময়ে আবার দেখা হবে।

কঠিন হাসি হেসে হেমাঙ্গিনী বললে, না গো না, দেখা যখন পেয়েছি, সে-দেনা এখনই শোধ করব। ভেতরে এসো।—বলতে বলতে হঠাৎ আনন্দর হাত থেকে খাতাখানা সে কেড়ে নিয়ে পুনরায় বললে, ঘরে না এলে এ খাতা এখনই ছিঁড়ে ফেলব।

আনন্দ বললে, এমন করলে আমার চাকরি যাবে, তা জান?

যাক্, আমি তোমায় এ পাড়ায় ভালো চাকরি দেব। আমাকে দেখিয়ে অনেক রোজগার করতে পারবে।

আনন্দ বললে, একজনের ওপর রাগ আছে তোমার অনেক কাল আগে, তাই বলে আমাকে এসব অপমানের কথা বলছ কেন?

অপমান? হেমাঙ্গিনী হেসে বললে, ঠিক জান এটা অপমান? যদি বলি এটা ভালোবাসা?

কিন্তু আনন্দকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঝপ্ করে তার একখানা হাত ধরে হেমাঙ্গিনী তাকে উঠোন থেকে ঘরে তুলে আনল।

অদূরে কয়েকটি মেয়েছেলে জোট পাকিয়ে বসে ছিল, এবার খিলখিলিয়ে বলে উঠল, দেখো! দিনদুপুরে মাগির কাণ্ড দেখো।

ভিতরে এসে আনন্দ প্রতিবাদ জানাল—আরে আরে, শোন, বারোটার মধ্যে আমাকে আপিসে পৌঁছতে হবে। আঃ কি হচ্ছে এসব? সাইকেলখানা বাইরে পড়ে—চুরি যেতে পারে। ছাড়ো, ছাড়ো—

হেমাঙ্গিনী উল্লসিত কণ্ঠে বললে, সাইকেল গেলে আমিই তোমাকে আবার সাইকেল কিনে দেব! কিন্তু তুমি হারালে আর যে তোমাকে পাব না!

আনন্দ বললে, তোমার মতলব কি? তুমি যা ভাবছ আমি তা নই। সরো, যেতে দাও আমাকে।

কোনও কথায় কান না দিয়ে হেমাঙ্গিনী ভিতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, যাবে বৈকি, তুমি কি আর থাকতে এসেছ? তবে ঘণ্টাখানেক বাদে যাবে।

আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না।

খিলখিল করে হেমাঙ্গিনী হেসে উঠল—লাগবে, একটু সবুর করো—চোখ বুজে আসবে ভালো লেগে। দাঁড়াও, আগে পুতুলটিকে সযত্নে কোলে নিয়ে কলঙ্কের কালি মাখাই—দেখবে তখন, দরজা খুলতে আর মন উঠবে না।

বাঘিনী আজ যেন তার শিকারকে ধরেছে। তার কঠিন কামড়ের থেকে পালাবার পথ ছিল না। সেই আবছায়াময় ঘরের গুমোটের মধ্যে হেমাঙ্গিনীর হিংস্র দুই চক্ষু দপদপ করে জ্বলছিল—ঠিক যেমন জ্বলত তরুদিদির দুই চক্ষু। দুই নারীর মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র এতকাল ধরে থেকে গেছে, সেই কথা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে আনন্দ যেন থেই হারিয়ে ফেলছিল।

বিশ্বসংসারের বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছে ততক্ষণে। শিকারটা প্রায় মৃত। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জন্তুটা ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের রক্তটা লোল-জিহ্বাগ্রে লেহন করছিল। ঘরময় তখন ঘুরছে যেন একটা সুদূর মৃদুকণ্ঠের কান্নাজড়ানো প্রলাপ: মার খেয়ে লাথি খেয়ে যখন আমার পিঠ দুমড়ে যেত, দিনের পর দিন কালশিরে পড়ত সর্বাঙ্গে···তখনও খেয়েছি নেড়িকুকুরের মতন, তোমাদের ভাত··দোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সব অপমান তোমরা সবাই দেখতে ·আজ আমার শরীরের থেকে ব্যাধি আর বিষ তুলে নিয়ে যাও। যদি পার তোমাদের ওই জমিদারগুষ্টীর মধ্যে এই বিষ ছড়িয়ে দিও। বিষ নিয়ে যাও—ছারখার হোক তোমাদের পরিবার।

আনন্দর ততক্ষণে মৃত্যু ঘটে গেছে।

॥ নওরঙ্গী ॥

চোর! চোর! | বুদ্ধদেব বসু

অন্ধকারে চোখ মেলে ললিতা প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না। তবে, একটু আগে, ঘুমের মধ্যে একটা শব্দ সে শুনেছে, তা ঠিক। ঠিক তো? তার ঘুম খুব পাৎলা, একটুতেই ভেঙে যায়। আগেকার দিনে—ছেলেবেলায়—সে ভীষণ ঘুমুত। এমন ঘুমুত যে ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে পড়লেও তার ঘুম ভাঙত না। একবার—সতেরো বছর বয়সে—সে তখন সবে নাম লিখিয়েছে—একটি ছেলে এলো তাব কাছে, ভারি সুন্দর দেখতে। কত মিষ্টি কথা যে বললে তার হিসেব নেই। ছেলেমানুষ সে, মিষ্টি কথায় ভুলেছিল। ছেলেটিকে থাকতে দিয়েছিল রাত্রে। পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙল, ছেলেটি নেই। ললিতার দুহাত ভরা চুড়ি ছিল, তাও নেই। কানে দুল ছিল, তা-ও অদৃশ্য হয়েছে। পাশের ঘরের মালতী বলেছিল—এখনো ললিতার সে-কথা মনে পড়ে—'এখন আর কাঁদাকাটি করে কী হবে, বল। তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি হবে তো! বলি, রাত্তিরে কখনো কোন বাবুকে ঘরে রাখতে আছে! ফুর্তি করে টাকা গুনে দিয়ে চলে যাও—এর বেশি আবার কার সঙ্গে কী সম্পর্ক। যেমন গিছলি পিরিত করতে, পেলি তো ফল! প্রাণে যে মেরে যায়নি, এই তোর সাত পুরুষের ভাগ্যি।

পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে, পোড়ারমুখি! আর কী মানুষের ঘুমই বা ভোর—কান থেকে দুল খসিয়ে নিলে, কিছু টের পেলিনে। আফিং-টাফিং খাইয়েছিল নাকি?…'

পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে! না—তার পর থেকে, সে অন্তত কখনো করেনি। সর্বদা সজাগ, সর্বদা সতর্ক। অতিথির মনোরঞ্জন করতে তাকে হেসে কথা কইতে হয়, গান গাইতে হয়; অলস কটাক্ষ-বিলাসে, উদ্দীপক দেহভঙ্গিতে মোহ-বিস্তার করতে হয়, কিন্তু তার মনের এক কোণে কড়া পাহারা বসে থাকে সব সময়। মদের নেশাতেও তা ঝিমিয়ে পড়ে না, ঘুমের মধ্যেও তা ঘুমোয় না। সর্বদা সন্ত্রস্ত, সর্বদা সজাগ। কোথায় খুট করে একটু শব্দ হল, অমনি সে জেগে উঠল। তার ঘরেই শব্দ একটা হয়েছে—ঠিক তো? ললিতা চোখ খুলে রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ধ্রাম।—উঃ। সঙ্গে-সঙ্গে ললিতা হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ টিপল।

মশারি তুলে বিছানার বাইরে আসতে আসতেই তার চোখ পড়ল উল্টো দিকের দেয়ালের বড় আয়নায়। সেখানে দেখল, ঘরের মাঝখানকার গোল টেবিলের পাশে একটা চেয়ার উল্টে গেছে, আর একটা মনুষ্য-মূর্তি চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে উঠে দাড়াচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাতেই লোকটির সঙ্গে তার চোখোচোখি হল। ঠিক চোখোচোখি—তার বেশি নয়। কারণ লোকটির মুখ কালো একটা মুখোশে ঢাকা, নাকের দু'পাশে দুটো গর্তের ভিতর দিয়ে কালো একজোড়া চোখ ঝকঝক করছে। লোকটির পরনে—ললিতা একদৃষ্টিতে দেখে নিলে—জিনের একটা হাফপ্যান্ট, অত্যন্ত নোংরা। গায়ে বেখাপ্পা রকম ফর্সা একটা হাত কাটা শার্ট। খালি পা। মাথার চুল যেন আঠা দিয়ে লেপটে উপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নিজের অজান্তে ললিতার বুক থেকে একটা চীৎকার উঠে আসছিল, সচেতন চেষ্টায় সে সেটা রোধ করলে। পুরুষ চরিয়ে যাকে খেতে হয়, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে তার চলে না। নিতান্ত নিঃসহায় তার জীবন, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। ঘোর বিপদেও রক্ষা করবার কেউ নেই, অনিষ্ট যে-কেউ করতে পারে। বছরের পর বছর অনেক বিপদে, অনেক দুঃখে, অনেক ক্ষতিতে নিজেকে নিজেই সামলাতে হয়েছে, স্বাধীন আত্ম-রক্ষায় সে অভ্যস্ত। তাই নিস্তব্ধ রাত্রিশেষে একা বন্ধ ঘরে এই আকস্মিক মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও

সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল না। ভয়ে তার বুকের ভিতর টিপটিপ করছিল ; কিন্তু সে জানত, বাইরের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ না রাখতে পারলে এ-অবস্থায় উপায় নেই।

একটু সময় উভয় পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চল ; তারপর হঠাৎ যেন মোহ থেকে জেগে উঠে ললিতা পিছন দিকে এক পা বাড়াল।

লোকটি শাঁ করে প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট কালো একটা জিনিস বের করে ললিতার দিকে উঁচু করে ধরলে।—'কোন দিকে এক পা নড়েছ কি মরেছ!' গম্ভীর, ভীষণ কণ্ঠস্বর নয় ; বরং কাঁপছে যেন। ললিতা একটু অবাকই হলো। পিস্তলের নলটা একটা হিংস্র নিষ্পলক চোখের মতো তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে, লোকটার তর্জনী একটু যদি নড়ে ওঠে—একটু টান—ভীষণ শব্দ, অনেক ধোঁয়া, খানিকটা আগুন তার বুকের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে গেল। ললিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। খুব আস্তে বললে, 'কী চাও তুমি ?'

'কী চাই ?' মুখোশ ভেদ করে খানিকটা বিকৃত হাসির শব্দ বেরিয়ে এলো, 'সবাই যা চায়—টাকা।'

'কিন্তু ঘরে তো কিছু নেই।'

কালো মুখোশের ফাঁকে এক জোড়া কালো চোখ হেসে উঠল যেন।—'বেশ, খুঁজে দেখা যাক, কিছু আছে কি নেই। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে হচ্ছে—কিছু মনে করো না। তুমি কি একটু কষ্ট করে চাবিগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আসবে ?' পিস্তলের ঘোড়ার উপর সে যেন আদরে একবার আঙুল বুলোল।

ললিতা মনে-মনে হিসেব করে দেখল যে চীৎকার করে কোন ফল হবার আশা নেই। চীৎকার করে গলা ভেঙে ফেললেও নিচে ভাঙের ঘুমে অচেতন দরোয়ানজীর কানে তা পৌছবে না। দোতলার রাসমণি হয়তো ছুটে আসতে পারে, কিন্তু তার আগেই লোকটা হয়তো তর্জনী একটু নাড়বে, আর সঙ্গে-সঙ্গে···। লোকজন ডেকে জড়ো করবার অপেক্ষায় সে থাকবে না, তা ঠিক। ললিতা এক ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে ? আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ ; খুলতে যে-সময় নেবে, তা পোষাবে না। রাস্তার দিকে ছোটো একটা বারান্দায় যাবার দরজা—সে প্রায়ই সেটা খুলে শোয়, আজ কী মনে করে যেন বন্ধ করেছিল। ও বারান্দায় পৌছতে

পারলেও একরকম হত; এ-রাস্তায় গভীর রাতেও দুটো-একটা লোক থাকেই, আর উল্টো দিকের পানের দোকানটা তো প্রায় সারা রাতই খোলা। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ হত? সেই নিষ্পলক, হিংস্র দৃষ্টি—তাকে সে কী করে এড়াবে?

'শিগগির, শিগগির—বেশি সময় নেই। ভূতের সঙ্গে আমার মিল এই যে ভোর হবার আগেই আমাকে অদৃশ্য হতে হবে।—আর খানিকটা মিল সম্প্রতি চেহারায়—কী বলো?' আবার অস্পষ্ট হাসি শোনা গেল।

'কিন্তু সত্যি বলছি—কিছু নেই। হয়তো রোজকার খরচের দু'দশ টাকা —তাতে তোমার খাটনিও পোষাবে না।'

'কেন—পুরুষমানুষকে ছাগল বানিয়ে যে মুঠো-মুঠো টাকা বার করে নাও, সে-সব কী হল?'

'এটা বোধ হয় জান যে আজকালকার দিনে সবাই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখে?'

'হুঁ।' একটু পরে: 'যাক—যা পাওয়া যায়, তা-ই সই। দু'দশ টাকাও মন্দ নয়। তাছাড়া, গয়না-টয়নাগুলো—তাও কি ব্যাঙ্কে জমা রেখেছ?'

ললিতার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। তার আলমারির দেরাজে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার অলংকার রয়েছে—সোনা-হিরে-মুক্তোর গা-ঘেঁষাঘেষি, আলোর এক রাজ্য। তার সমস্ত জীবনের উপার্জন, তার জীবনের আলো। ও-গুলো যদি নিয়ে যায়—।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বার কর চাবি।'

উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। ললিতা নড়তে চাইল, কিন্তু তার পা দুটো অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে।

'আঃ, সময় নষ্ট করো না, বলছি। লক্ষ্মী মেয়ের মতো চাবির গোছাটা আমার হাতে তুলে দেবে, না সেটাও আমাকেই কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে?'

উপায় নেই, উপায় নেই। ললিতা চেষ্টা করল নড়তে—কিন্তু তার শরীর পাথরের মতো স্থির। শুধু তার চোখ মশারির হালকা আবরণ ভেদ করে পড়ল গিয়ে তার বিছানায়, প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে, তারপর স্পষ্ট হয়ে বালিশের উপর। কালো মুখোশের নিচে কালো দুই চোখ তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করল।

'আঃ—thank you', বালিশ তুলতেই তার নিচে চাবির গোছা পাওয়া গেল। 'Thank you', চাবিগুলোকে লোকটা আঙুল দিয়ে একটু আদর করল—'এবার তাহলে একটু খুঁজে দেখা যাক—কী বলো?' যেন ললিতারই অনুমতির জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

এতক্ষণে ললিতা তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল। 'তুমি কত টাকা চাও বলো আমি দিচ্ছি।'

'বা-বাঃ, এখন যে একেবারে দয়ার অবতার, রানি! কী দেবে? বাজার খরচের দু'দশ টাকা?'

'যা তুমি চাও। এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি।'

'চেক?...বাঃ, আমি ভাঙাতে যাই, আর এদিকে তুমি ব্যাঙ্কে খবর দিয়ে রাখবে—ঠেলবে হাজতে। না, তোমার এ-দয়া নিতে পারলুম না, দুঃখিত।'

'না—সত্যি। আমি মোটেও খবর দেব না ব্যাঙ্কে। সত্যি তোমাকে দিয়ে দেব—ধর, এক হাজার? কাল ঠিক দশটার সময় তুমি কড়কড়ে হাজার টাকা পেয়ে যাবে।

লোকটা যেন একটু ইতস্তত করছে। অমনি ললিতা বললে, 'আচ্ছা, দেড় হাজার। হবে ওতে?'

লোকটা মনে-মনে কী-যেন একটু হিসেব করল, তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল, 'নাঃ—বেশ্যার কথায় যে বিশ্বাস করে, নরকেও তার জায়গা হয় না।'

'তাহলে আমার কথাটা তুমি রাখলে না?'

'বেশি কথা বোল না—যা বলছি, তা-ই কর।'

'কী করতে হবে, বল।' এতক্ষণে ললিতা তার স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছিল।

'এই নাও চাবি—ঐ আলমারিটা খোল তো।'

'দাও।' ললিতা হাত পাতল। চাবি দিতে গিয়ে লোকটার আঙুল তার হাতে লেগে গেল।

'বাঃ, বেশ নরম তো তোমার আঙুল।'

'ও-সব প্যাঁচ আমার উপর চলবে না, সুন্দরী। যাও—খোল আলমারি।'

'যদি না খুলি?'

আমাকেই খুলতে হবে তাহলে।

'যদি বাধা দিই ?'

'তাহলে এই যে—' উঁচোনো পিস্তলটায় (এতক্ষণের মধ্যে সে একবারও সেটা নামায়নি) সে একবার ঝাঁকুনি দিলে।

'তাহলে আমাকে সত্যি মেরে ফেলবে ?'

'না, মেরে ফেলব কেন ? ঠ্যাংটা শুধু একটু খোঁড়া করে দেব, যাতে আমি স্বচ্ছন্দে পালাতে পারি।'

'তারপর বাকি জন্ম আমি খোঁড়া হয়ে থাকব ?'

'বোধহয়।'

'না, না, খোঁড়া হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। সে বড় বিশ্রী। তার চেয়ে বরং আমায় মেরে ফেল।'

তা ঠিক জায়গায় লাগলে মরেও যেতে পার।'

'আচ্ছা—তুমি যে আমাকে মেরে ফেলবে, একটু কষ্ট হবে না তোমার ?'

'কষ্ট কিসের ? তোমার মতো জঘন্য জীবন যত শিগগির শেষ হয়, ততই ভালো।'

'তা হোক, তবু—আচ্ছা, আমার মতো সুন্দর মানুষ কখনো দেখেছ ?'

কালো মুখোশের নিচে কালো দুই চোখ মুহূর্তের জন্য ললিতার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়েই আনত হল।—'তোমার সঙ্গে রসালাপ করতে আমি এখানে আসিনি। যা বলছি করো।'

আস্তে-আস্তে ললিতা আলমারির কাছে গেল, লোকটি ঠিক তার পিছনে। আলমারির দরজায় প্রকাণ্ড, ঝকঝকে আয়না সেখানে ললিতা নিজের ছায়া দেখে একটু স্তব্ধ না-হয়ে পারল না। অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিচার করলেও মানতে হয় যে সে সুন্দরী। অপরিপূর্ণ ঘুমে ঈষৎ ফোলা-ফোলা তার চোখ—সন্ধ্যাবেলা সে যে সুর্মা মেখেছিল তার কালো আভা এখনো দুঃখের চিহ্নের মতো চোখের কোণে লেগে আছে, একরাশ এলো চুল পিঠে ছড়ানো—কালো, এখনো কালো। কিন্তু আর কদিন ? দিনে দিনে বয়েস বেড়ে চলে—বয়েস তো কারো কথা শোনে না। তার এমন যে নিটোল মজবুত শরীর—তাও একদিন ভেঙে পড়বে। সময় আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু—অদৃশ্য, অপরাজেয়। তার হাত এড়াতে কেউ পারেনি; ললিতা, তুমিও পারবে না। তবু—যে কদিন হয়। এখনো হয়তো বছর দশেক মেয়াদ আছে। তার ভাগ্য ভালো; অনেক বাঙালি মেয়ের চাইতেই তার যৌবন

দীর্ঘস্থায়ী হল। জ্বালিয়ে যাও, ললিতা, আর যে-কদিন পার, জ্বলে যাও, জ্বালিয়ে যাও। আয়নায় ছায়ার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

ললিতা মুখ ফিরিয়ে সেই কালো মুখোশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিজের চেহারা দেখছিলাম। সুন্দর—কি বলো?'

'খোল!' লোকটির স্বর অধীর আগ্রহে কাঁপছে, 'খোল!'

'খুলছি।' চাবি লাগিয়ে ললিতা হঠাৎ আবদারের সুরে বলে উঠল, 'তোমার পিস্তলটা নামাও—আমার বড ভয় করছে।'

'আমার কথা-মতো চলো—কিছু ভয় নেই তোমার।'

ললিতা চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলল। উপরের তাকগুলো সব শাড়িতে ঠাসা। সেখানে হাত রেখে ললিতা বললে, 'তোমার বৌ আছে?'

লোকটি হুমকি দিয়ে উঠল, 'ফাজলেমি!'

ললিতা হতাশভাবে একটু ঘাড নেড়ে বললে, 'কী মুশকিল! ভালো কথা কইলেও যে চটে যায়—'

'থাক, তোমাকে এখন ভালো কথা কইতে হবে না। কী আছে বের করো দিকি।'

আছে তো এক বোঝা শাড়ি—মরলে পরে সব চিতেয় যাবে আর কি। মেয়েটাও মরে গেল—নইলে অ্যাদ্দিনে কি আর ওর শাড়ি পরবার বয়েস না হত। বলছিলাম কী—ভালো দেখে একখানা বেছে বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাও—বৌ খুশী হবে। তা তুমি তো চটেই উঠলে। চাও তো আমিই বের করে দিচ্ছি। এই যে, এখানা—' ললিতা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উপরের তাকের তলা থেকে আগুনের রঙের একটা শাড়ি টেনে বের করলে—'পছন্দ হয়? খাঁটি বেনারসি সিল্ক—হাজার টাকা এর দাম।'

'হাজার টাকা?'

'ছিলেন এক জমিদারবাবু—মৈমনসিং জেলায় বাড়ি। বড্ড ভালোবাসতেন আমাকে। তিনি দিয়েছিলেন এখানা। ভদ্দরলোকের দিলটা খুব খোলা ছিল—তা এমন কপাল, অকালে মরে গেলেন। লিভার নাকি পচে গিয়েছিল।' ললিতা শাড়ির ভাঁজ খুলল, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল খানিকটা—'ভালো জিনিস—একশো বছরেও কিছু হয় না। নিয়ে যাও না এখানা বৌয়ের জন্য।'

লোকটা হাত দিয়ে শাড়িখানা একটু নেড়ে-চেড়ে বললে, 'হুঁ। ভালো জিনিশ—না? হাজার টাকা দাম। হাজার টাকা দামের আরো শাড়ি আছে তোমার?'

'ক—ত! আরো চাই দু'একখানা?'

'ছাই! বৌ-ফৌ আছে নাকি যে নিয়ে যাব!'

'ও—তুমি বুঝি বিয়ে করোনি? আহা—কেন গো?

'তোমার সঙ্গে এখন ঘরোয়া আলাপ করবার সময় আমার নেই। দেরাজগুলো খোল। গয়না কী আছে দেখি।'

হ্যাঁ, গয়না।—দেখছি।' আগুনের রঙের শাড়িটা এলোমেলো হোয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। ললিতা নিচু হয়ে উপরের দেরাজে চাবি লাগিয়ে বললে, 'পিস্তলটা নামাও না ভাই। বড্ড ভয় করছে আমার।'

'কী ছেলেমানুষের মতো কেবল ভয় করছে! ভয় করছে! আর—ছাখো, আমাকে ভাই-টাই বলবে না।'

'ওমা, কেন? একজনকে ভাই বললে কী দোষ?'

'আছে দোষ।'

'কী বলব তাহলে?' ললিতা মুখ ফিরিয়ে চপল হাসি-ভরা চোখ তুলে তাকাল, 'প্রভু?' সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত থিয়েটারি মুখ-ভঙ্গি করে—'নাথ? প্রাণেশ্বর?'

'ফাজলেমি—না?' লোকটা রাগে যেন গর্জাচ্ছে।

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ কিন্তু।' ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'ছাখো, বাড়াবাড়ি করবে তো মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। খোল শিগগির দেরাজ।'

ললিতা এক টানে দেরাজ খুলে ফেলল। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ বাক্সটা দেখি।' তার নির্দেশমতো ললিতা কুমিরের চামড়ার বেশ বড় একটা অ্যাটাশে কেশ বার করে পাশের একটা টিপয়ের উপর রাখল। তারপর লোকটা কিছু বলবার আগেই সেটা খুলে ফেলে বললে, 'দেখবে এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা ঝুঁকে তাকাল। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। ললিতা তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেশ সুন্দর না?'

'বেশ।' লোকটার গলা দিয়ে স্বর যেন ফুটছে না।

'বেশ! শুধু বেশ! এত সুন্দর জড়োয়া গয়না তুমি দেখেছ কখনো?' লোকটা কোন কথা বললে না। 'এই সব—' হঠাৎ ললিতার স্বর অত্যন্ত কোমল হয়ে এলো, 'স—ব তুমি নিয়ে যাবে?

'আপত্তি আছে তোমার?'

'আমাকে একেবারে বিধবা করে রেখে যাবে? উঃ, পুরুষের প্রাণ কী নিষ্ঠুর!'

এতক্ষণে লোকটার চোখ অ্যাটাশে কেস থেকে ললিতার দিকে ফিরল। —'থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না।'

'ন্যাকামো! একে তুমি ন্যাকামো বলো!' ললিতার স্বর আবেগে ভারি হয়ে উঠল, 'বলবেই তো! তুমি নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় নেই; তুমি কী করে বুঝবে এই গয়নাগুলোকে আমি কত ভালোবাসি।'

'ইশ—এত মোহ! এ-কথা কখনো ভাবো, তুমি মরে গেলে এ গয়না-গুলোর কী হবে?'

'মরে গেলে কী হবে? যা খুশি তাই হবে। সে-কথা ভেবে কী লাভ? মেয়েটা যদি থাকত তাহলে কি আর কোন ভাবনা ছিল? কী সুন্দর ছিল দেখতে—মনের সাধ মিটিয়ে ওকে আমি সাজাতে পারতাম। গয়না-গুলোর দিকে যখনই তাকাই, ওর কথাই আমার মনে পড়ে।'

'তোমার মেয়ের কপাল ভালো—তাই সে মরেছে।' লোকটা এক হাতে অ্যাটাশে কেসটা বন্ধ করলে।

'ও কী? ওটা বন্ধ করছ কেন? সত্যিই কি সব নেবে তুমি?'

'কত দাম হবে এগুলোর বল তো? হাজার খানেক—?'

'ওমা, বলে কী!' ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'উঃ, হেসে আর বাঁচিনে!

'চুপ!' লোকটা হিংস্র স্বরে বলে উঠল। 'বলো—এখানে কত টাকার গয়না আছে?'

ললিতা শান্তভাবে বললে, 'তিরিশ হাজারের একটি পয়সা কম না।'

'কত?'

'তিরিশ হাজার।'

'তি-রি-শ হা-জা-র!' পরক্ষণেই স্বর বদলে: 'ও—তিরিশ হাজার।
বে—শ। আচ্ছা, এবার তোমার দেরাজের অন্যান্য বাক্সগুলো একটু নেড়ে-
চেড়ে দেখা যাক।'

'দেখাচ্ছি। কিন্তু—' করুণ স্বরে ললিতা বললে, 'কিন্তু আমার একটা
কথা রাখবে?'

'না, রাখব না।'

বেশি কিছু নয়—সামান্য একটা হিরের আংটি; অত জিনিসের মধ্যে
টেরও পাবে না তুমি। একজন আমাকে দিয়েছিল।'

'এ-সবই তো তোমাকে কেউ-না-কেউ দিয়েছিল?'

'সেইজন্যেই তো ওগুলোর উপর আমার এত মায়া। সমস্ত জীবন ভরে
কত লোকের ভালোবাসা কুড়িয়ে এত-সব জিনিস উপহার পেলাম—আর তুমি
হঠাৎ এসে এক ফুঁযে সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আর-সব নাও—কিন্তু ঐ
আংটিটা কি দিযে যেতে পাব না? ওটা যে দিয়েছিল, তাকে আমি ভারি
ভালোবাতাম।'

'ভালোবাসতাম।' লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। 'ভালোবাসার
কথা তোমার মুখেই মানায়।'

'যেন তোমার মুখেই মানায়। কী জানো তুমি ভালোবাসার? কখনো
ভালোবেসেছ কাউকে?'

'হয়েছে, এখন থামো।'

'না, কক্ষনো বাসোনি। তাহলে আমার এ-কথাটা তুমি রাখতেই।
ওগো—এত করে বললাম—'

'ওগো-টোগো বোলো না, বলছি।'

'থুড়ি—ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এত জিনিসের মধ্যে সামান্য একটা
আংটি রেখে গেলে এমন কী ক্ষতি হত তোমার।'

'নাও—এবার ঐ বাক্সটা খোলো তো।'

'কোনটা? ঐটে? ওটা খুলে কী হবে—ওটাতে কিছু নেই।'

'কিছু-নয়টাই দেখা যাক।'

'বেশ।' চন্দনকাঠের একটা বাক্স—চাবিও ছিল না। টানতেই ডালা
উঠে এলো। 'এটার ভিতর সব চিঠিপত্র। প্রেম-পত্র। এগুলো কি তোমার
কোন কাজে লাগবে?' ললিতা বাক্সটা তুলে এনে টিপয়ের উপর রাখল।

'আঃ—' ভিতরের চিঠিগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে—'এগুলো দেখে কত কথাই যে মনে পড়ে! কত বাবু এলেন—আর গেলেন।'

'সবাই তোমাকে চিঠি লিখত?'

'ঝুড়ি-ঝুড়ি। সব কি আর রাখা যায়? যাদের সঙ্গে খুব বেশি প্রণয় ছিল, তাদের চিঠিগুলো সব আছে।'

'কেন রেখেছ?'

'এমনি—মাঝে-মাঝে দেখতে বেশ মজা লাগে।' ললিতা বাক্স থেকে একটা খাম বা'র করল। 'এটা কার?…ও—' চিঠিটা খুলে চোখের সামনে ধরল ললিতা। লোকটা ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল।

'ওগো, তুমি অত কাছে এসো না। আমার বড্ড ভয় করে।'

'ছি ছি।' বলে লোকটা সরে গেল।

'ছি ছি কেন?'

'কী-সব লিখেছে!'

'এ আর কী! আরো কত সব আছে। ভারি রসিক ছিল ছেলেটা। বড়োলোকের ছেলে, কলেজে পড়ত। দেদার টাকা উড়িয়েছে এখানে। গুণ-যোগ্যতাও ছিল কিছু। গান গাইতে পারত—পদ্য লিখত, কাগজে ছাপা হত সে-সব, আমাকে দেখাত এনে। একবার আমার নামে মুখে-মুখে ছড়া কেটছিল, এখনো মনে আছে—

ওগো ললিতা—
প্রাণের প্রদীপে মোর
তুমি সলিতা।

তুমি সলিতা—ভারি মজার, না?' ললিতা হেসে উঠল

'হুঁ, এই হচ্ছে কলেজে-পড়া বড়োলোকের ছেলে।'

'এখন ডিপটি হয়েছে শুনলাম। ওরই আবার এক বন্ধু এসেছিল, কথায় কথা উঠল—বিয়েও করেছে। বি. এ. পাশ বৌ। ভারি মজা লাগে ভাবতে —কত ছেলে যে আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল—' মুহূর্তের জন্য ললিতা যেন অনেক দূরে চলে গেল। 'তা ছাখো', উপস্থিত সময়ে ফিরে এসে ললিতা বলতে লাগল, 'এই চিঠিগুলোও তুমি কাজে লাগাতে পার।'

'কী করে?'

'তা-ও বুঝতে পারছ না? ধরো, এই চিঠিগুলো যদি তোমাকে দিয়ে দিই—ডেপুটি-সাহেব নতুন বিয়ে করেছেন, ব্যাপারটা জানাজানি হোক তিনি তা নিশ্চয়ই চাইবেন না। আর তার জন্য অমন দু-পাঁচশো টাকা কি তোমায় দিয়ে না দেবেন।'

'ছি ছি—আমি বুঝি তা-ই করতে যাব। এ তো blackmailing।'

'তা ইংরিজিতে ওকে যা-ই বলুক, এ করে তুমি পয়সা কিন্তু পেতে পার—যদি পয়সাই চাও।'

'যদি চাই। কে না চায়?'

'তাহলে তোমাকে যখন টাকা দিতে চাইলাম—নিলে না কেন? আমি ভাবলাম তোমার বুঝি গয়নাগুলো দিয়েই বিশেষ-কোন দরকার, তাই তুমি ওগুলো নিচ্ছ।'

'দরকার আর কী। ওগুলো ভাঙিয়ে তিরিশ হাজার টাকা করে নিতে কতক্ষণ।'

'ওমা, তুমি ওগুলো বেচতে যাবে নাকি? বলিহারি বুদ্ধি তোমার।'

'ছ্যাখো—মুখ সামলে কথা বোলো।'

'তুমি কি মনে করছ ওগুলো কোথাও নিয়ে বেচতে পারবে? তুমি কি মনে করেছ আমি পুলিসে খবর দেব না? তুমি কি মনে করেছ যে ও-রকম গয়না সবারই থাকে যে তোমার হাতে তা দেখামাত্র যে-কেউ সন্দেহ করবে না?'

'তুমি কি মনে করেছ তোমার লেকচার শুনতে আমি এখানে এসেছি?'

'শুনলেও ক্ষতি নেই। আমার কাছে তোমার অনেক শেখবার আছে। তোমারই ভালোর জন্য বলছি—তুমি যদি ওর একটি গয়নাও বেচতে যাও, অমনি হাতে-হাতে ধরা পড়বে, আর পত্রপাঠ জেল।'

একটু চুপ করে থেকে লোকটা বললে, 'তা-ই বা মন্দ কী? তবু তো জেলে গেলে খেতে পাব।'

'কেন, এমনিতে তুমি কি খেতে পাও না?'

'ও-সব কথা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'থাক, থাক,' ললিতা অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'তোমার ইচ্ছা না-হলে কিছু বোলো না। আহা—যে দিন-কাল পড়েছে—দেশে এমন টানাটানি আর কখনো হয়নি।'

'থাক, তোমাকে আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না। অভাবের তুমি কী জানো? কত জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে? লাখ-খানেক?'

'পাগল! অত কী করে হবে? তবে অল্প-স্বল্প কিছু যে নেই, তাও নয়।'

'তুমি তো দিব্যি পাপের পয়সা জমিয়ে যাচ্ছ—এদিকে কত লোক যে ভালো করে দু'বেলা খেতে পাচ্ছে না, সে-খোঁজ রাখ? বলতে পার, কী অধিকার আছে তোমার একা এত টাকা ভোগ করবার? মরে গেলে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোকও তো তোমার নেই। কী হবে তখন তোমার এত টাকা দিয়ে?'

'সে-কথা যে আমিও না ভেবেছি, তা নয়। একটা ছেলেকে পুষ্যি রাখব ভাবছি, এমন-একটা ছেলে, সংসারে যার কেউ নেই-টেই। সে-রকম কারো খোঁজ দিতে পার?' একটু পরে ললিতাই আবার বলল, 'খোঁজবার আর দরকার কী। এই তো তুমিই আছ। তুমি—হবে আমার ছেলে?'

'যাও:।'

'যাও: কেন? হও না।'

'রসিকতা, না?'

ললিতা হেসে উঠল।—'ও:, ছেলেমানুষ। একেবারে ছেলেমানুষ।'

'ত্যাখো, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ কোরো না বলে দিচ্ছি। তোমার বয়স কত শুনি?'

'ওগো ছেলেমানুষ, এ-ও কি জানো না যে মেয়েমানুষকে কখনো তার বয়স জিগেস করতে নেই?'

'যাও—যাও—তোমার বয়সের বা অন্য-কোন বৃত্তান্ত জানবার কৌতূহল আমার নেই। আমার যে-বিষয়ে কৌতূহল আছে, তা হচ্ছে তোমার টাকা। শোনো—' (খুব গম্ভীরভাবে)—'তুমি তখন যা বলেছিলে, সত্যি?'

'কী বলেছিলাম?'

'সেই চেক লিখে দেবার কথা? সত্যি আমাকে দিয়ে দেবে টাকাটা? খবর দেবে না পুলিসে?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিনবার বললাম। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' ললিতা লোকটার হাতের উপর হাত রাখল।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত সরিয়ে নিয়ে লোকটা বললে, 'তাহলে লেখ শিগগির। পাঁচ হাজার টাকা।'

'পাঁচ হাজার ?—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচ হাজার। শিগগির। তোমার গয়না-টয়না সব রইল—ও আমি চাইনে। আমার দরকার টাকার। তোমার পাপের বোঝা খানিকটা হালকা করে দিয়ে যাচ্ছি—ভালোই হল তোমার।'

'আমি করব পাপ, আর তুমি তার পুণ্যফল ভোগ করবে! মন্দ নয় ব্যবস্থা।'

'তোমার হয়ে টাকাগুলো মিছিমিছি পড়ে আছে, আমার হলে সেগুলো কাজে লাগবে। সুতরাং আসলে ও-টাকা আমারই। কোথায় তোমার চেক-বই, বার করো।'

'ঐ ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে চেক-বই আর কলম আছে—নিয়ে এসো না।'

'তুমি যেতে পার না, না?'

'বড্ড ভয় করছে যে—তোমার পিস্তলটা—'

'কিছু ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব, কিন্তু তোমাকে ছোঁবও না।'

'ছোঁবেও না। একেবারে ভীষ্ম—'

'ফের ফাজলেমি।

'আর করব না—অভ্যাসের দোষ। কিন্তু তোমার পিস্তলটা একটু নামাও না—যদি ধর কোনরকমে ছুটে গেল—'

'কী ঘ্যানর-ঘ্যানর করছ। এটা সত্যিকারের পিস্তল কিনা যে ছুটে গিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

খানিকক্ষণ ওলোট-পালোট, অস্ফুট দু'একটা চীৎকার। তারপর ললিতা হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। লোকটা মেঝেতেই বসে আছে, সেই আগুনের রঙের শাড়িটা দিয়ে তার দু'হাত পিঠ-মোড়া করে বাঁধা। একটু দূরে তার পিস্তল আর মুখোশ পড়ে আছে। ভারি কাঁচা মুখ—আঠারোর বেশি বয়স মনে হয় না। ভালো করে যেন দাড়িগোঁফও ওঠেনি। কালো কালো চোখ। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে পড়েছে। আশঙ্কায়, হতাশায় বিমর্ষ গম্ভীর মুখ। স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে সে তাকিয়ে।

ঘরের এক কোণে একটা টেলিফোন ছিল, ললিতা আস্তে-আস্তে সেখানে গিয়ে মৃদুস্বরে জিগেস করলে, 'এইবার ডাকি তাহলে পুলিস?'

লোকটা তার কালো-কালো চোখ তুলে একবার ললিতার দিকে তাকালো; কোন কথা বললে না।

'যদি কিছু মনে না করো—' ললিতা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো।

'না, না' সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা চীৎকার করে উঠল, 'না, না।' দু' পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে টলতে-টলতে সে উঠে দাঁড়াল—তার পিঠ একটু বেঁকে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে—মুহূর্তের মধ্যে সে ললিতার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে মস্ত লম্বা শাড়িটা লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা লেজের মতো গড়াচ্ছে।

ললিতার তীব্র চোখ লোকটাকে বিদ্ধ করল।—'বারণ করছ পুলিস ডাকতে?'

লোকটি মাথা নিচু করে চুপ।

'নিজেই তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করব তাহলে? কী হবে তোমার শাস্তি?' ললিতা ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল।

'তোমার যা খুশি তা-ই করো,' নিষ্প্রাণ স্বরে লোকটি বললে, 'বোকা—আমার মতো বোকা আর হয় না।'

'সে-কথা মনে করবার কোন কারণ নেই, ভাই,' মিষ্টি হেসে ললিতা বললে, 'পুরুষমানুষ যদি মাঝে মাঝে বোকাই না-বনবে, তাহলে আমাদের চলবে কী করে, বলো।'

লোকটি কথা না-বলে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। 'দুঃখের বিষয়', তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ললিতা বললে, 'তোমার পক্ষে এখন পালানো শক্ত। জোর যদি করতে যাও, কিছু লাভ হবে না, বরং চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে থাকো। লাফালাফি করতে গেলে হয়তো হাত-পা ভাঙবে। আচ্ছা,' লোকটিকে চুপ দেখে ললিতা জিগ্যেস করলে, 'তুমি কী করে ঢুকলে এ-ঘরে?'

'পাইপ বেয়ে।'

'পাইপ বেয়ে! মাগো—ভয় করল না তোমার? যদি পড়ে যেতে!'

'যেতাম তো যেতাম। অত ভাবলে কি আর চলে।'

'তাই বলে পাইপ বেয়ে এই তেতলার ঘরে—তোমার এত সাহস, অথচ পুলিসকে তোমার ভয়!

'সাহস! সাহসই বটে। অমন দায়ে-পড়া সাহস অনেকেরই হয়।'

'দায়ে-পড়া কেন ?'

আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি যা করবার করো—এই আমি বসলাম।' লোকটি কোনরকম করে একটা চেয়ারে বসল।

'তোমার বসে খুব আরাম হচ্ছে না বোধহয়', ললিতা বললে, 'তা একটু না-হয় কষ্টই হল। এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।'

লোকটি হঠাৎ উত্তেজিতস্বরে বলে উঠল, 'আমার হাত খোলা থাকলে এ-জন্য তোমাকে চড় বসিয়ে দিতে পারতাম।'

'আর সে-জন্যই তোমার হাত দুটো খোলা রাখলাম না।'

লোকটির উত্তেজনা যেন আর এক ডিগ্রি চড়ে গেল, 'ও-কথা এত শুনেছি যে কাউকে এখন বলতে শুনলেই মারতে ইচ্ছে করে।'

ললিতা খাটের এক প্রান্তে আলগোছে পা ঝুলিয়ে বসে জিগেস করলে, 'কোন কথা ?'

'এই কষ্ট সইবার কথা। চাকরির খোঁজ করে করে হয়রান—কোথাও কিচ্ছু হয় না। বাড়ি-গাড়ি নিয়ে যারা গ্যাঁট হয়ে বসেছে, তাদের কাছে গেল এই উপদেশ শুনেছি—'কষ্ট করতে শেখ, ছোকরা, এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।' কষ্ট। কতই যেন জানেন ওঁর কষ্টের। ইচ্ছে করে—' লোকটি হঠাৎ থেমে গেল।

'থামলে কেন ? বলো না, কী ইচ্ছে করে তোমার।'

লোকটি যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি ফশ করে নিবে গেল। হতাশভাবে মাথা নেড়ে শুধু বললে, 'না, না।' স্বচ্ছন্দভাবে একটু নড়তে গিয়ে তার হাতে চোট লাগল।

—'উঃ।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, না ? হঠাৎ যেন গরমও হচ্ছে।' ললিতা উঠে গিয়ে পাখাটা ছেড়ে দিলে। হাওয়ায় লোকটার দু-একটা চুল উড়ে-উড়ে তার কপালের উপর এসে পড়তে লাগল।

হঠাৎ ললিতা বললে, 'কী সুন্দর তোমার চুলগুলো। কিন্তু অমন বিশ্রী করে লেপটে উল্টে রেখেছিলে কেন ?'

'ভ্যাখো, তুমি যদি—' লোকটি খুব চড়া গলায় আরম্ভ করেই থেমে গেল।

'নাঃ, তুমি যেন কেমন ! কোন কথা বলি কি ফোঁশ করে জ্বলে ওঠো। মিষ্টি কথা তোমার যেন মুখেই আসে না !'

'তোমার দু-হাত কষে বেঁধে রাখলে দেখতাম, তোমার মুখ দিয়েই কেমন মধু ঝরে!'

'ও, সে-কথা! তা তুমি যখন আমাকে পিস্তল নিয়ে শাসাচ্ছিলে, আমি বলিনি মিষ্টি কথা?'

'বলেছিলে বইকি। মিষ্টি কথা বলেই তো আমাকে পথে বসালে।—উঃ, কী ভীষণ বোকা আমি।'

'যদি বলো তোমার হাত ছেড়ে দিই।'

লোকটি সন্দেহ-ভরা চোখে ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'বিশ্বাস! লজ্জা করে না তোমার ও-কথাটা উচ্চারণ করতে।'

একটু হেসে ললিতা বললে, 'লজ্জা-টজ্জা থাকলে কি আর আমাদের চলে ভাই!'

'সত্যি নেইও।' তীব্র মুখভঙ্গি করে লোকটি বললে।

'তোমার সঙ্গে গল্প করতে কিন্তু মন্দ লাগে না, কিন্তু এমন বিশ্রী তোমার

'আর বকতে পারিনে তোমাব সঙ্গে।' একটা হাই ছেড়ে লোকটি বললে, 'পুলিশ ডাকতে হয় ডাক—আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'পুলিশ এসেই তোমার ঘুমের চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে নাকি?'

'বসে-বসে আর বকর-বকর করতে হবে না তো।'

'কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে যখন দেবে মার—'

'ইস, মারবে কেন? ভদ্রলোককে কখনো মারে?'

'চোর আবার কখনো ভদ্দরলোক হয়?'

'ছাখো, চোর চোর বলো না, বলছি।'

'নিশ্চয়ই বলব। চোরকে চোর বলব না! চোর! চোর!

'আমি চোর নই। আমি চোর নই।' (চীৎকার করে)

'নাঃ, চোর হবে কেন? রাত চারটের সময় পাইপ বেয়ে এমনি একটু শখ করে আমার ঘরে উঠে এসেছিলে। তবু যদি পিস্তলটা সত্যিকারের হত!'

খোঁচা খেয়ে লোকটা এক লাফে উঠে দাঁড়াল। নানারকম মুখ-

বিকৃতি সহকারে হাত দুটো খোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বলতে লাগল, 'তুমি! তুমি চোর! তুমি যা করো তা ও তো চুরি! স্রেফ চুরি!'

ললিতা একটু লাজুক-লাজুক ভাবে বলল, 'আমি মন চুরি করি, আর কিছু না।'

'উঃ, অসহ্য! অসহ্য।'

'ও-রকম ধেই-ধেই করে লাফাচ্ছ কেন? নিচে রাসমণি শোয়—সে হয়তো জেগে উঠবে।'

ললিতার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা পড়ল। ভীত মেয়েলি গলায় শোনা গেল—দিদিমণি, ও দিদিমণি।' মুহূর্তের মধ্যেই ললিতার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। ত্রস্তভাবে সে একবার এদিক ওদিক তাকাল, তারপর চট করে উঠে এসে লোকটার হাত খুলে দিতে-দিতে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'যাও—শিগগির খাটের নিচে ঢোকো গে।'

লোকটা হাত ছাড়া পেয়ে পরম আরামে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দরজার বাইরে থেকে আবার শোনা গেল, 'দিদিমণি, ও দিদিমণি।'

'যাও', ললিতা লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে তীব্রস্বরে বললে, 'শিগগির যাও।'

লোকটা কোন কথা না বলে তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচের অন্ধকারে অদৃশ্য হল। স্তূপীকৃত লাল শাড়িটা লাথি মেরে মেরে ললিতা তার পিছনে পাঠিয়ে দিলে, তারপর একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে জিগেস করলে, 'কী হয়েছে, বিন্দি? চ্যাচাচ্ছিস কেন?'

'কী হয়েছে, দিদিমণি?'

'কী হয়েছে?' ললিতা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'আমিও তো তোকে সে-কথাই জিগেস করছি। তোর হয়েছে কী?'

বিন্দি ঘরের ভিতরে একবার তাকিয়ে বললে, 'তুমি চোর-চোর বলে চ্যাচাচ্ছিলে, না গো?'

'চোর! মাথা-খারাপ হয়েছে নাকি তোর? কী যে বকছিস!'

'ওমা, আমি যে স্বকর্ণে শুনলুম গো। শুনে উঠে এনু। তুমি চ্যাচাচ্ছ —চোর চোর—আর একজন মোটা গলায় বললে, আমি চোর নই, চোর নই—এ যে স্পষ্ট শুনলুম।'

'তোর মাথা! ছাইভস্ম কী স্বপ্ন দেখেছিস তার ঠিক নেই, এখন মাঝ-রাত্তিরে উঠে জ্বালাতন করছিস আমাকে।'

বিন্দি একটু দ্বিধার স্বরে বললে, 'না দিদিমণি, স্বপন নয়। আমার বুকটা যে এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে গো।'

'যা, যা, আর বকিসনি—শুয়ে থাক গে। ঘুমটা ভাঙালি তো আমার।'

'আমি তোমার ঘুম ভাঙাতে যাব কেন গো? ভালো মনে করে উঠে এনু। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে—'

'নে, হয়েছে, কাল সব শুনব। এখন ঘুমোতে দে।'

বিন্দি তবু একটু অপেক্ষা করল।—'তুমি কিচ্ছু শোনোনি, দিদিমণি? কিচ্ছু না?'

'কই, না তো। তারপর অনাবশ্যকভাবে বললে, 'আমি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছিলাম।'

'যাক—ভাগ্যিস কিছু নয়, দিদিমণি। একবার ভাবো দিকি—'

'হ্যাঁ ভেবেছি; তুই এখন যা তো,'

দরজাটা আবার বন্ধ করে ললিতা খাটের কাছে গিয়ে ডাকল, 'বেরিয়ে এসো।'

গুড়গুড় করে বেরিয়ে এলো লোকটি।—দেখলে তো কাণ্ডটা! ললিতা বললে, 'খুব চ্যাচাও আরো—পাড়াসুদ্ধু সব ছুটে আসুক।'

'আমার দোষ হল?' খুব ক্ষীণস্বরে, যেন ভয়ে-ভয়ে লোকটি জবাব দিলে, 'চোর-চোর বলে চ্যাচালে তো তুমিই।'

ললিতা হেসে উঠল।—'তোমাকে চটাতে এমন মজা লাগে!' তারপর লোকটির দিকে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে; 'কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে। ঠিক যেন সঙ।' ললিতা হেসে উঠল আবার।

লোকটি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। ললিতা জিগেস করলে, 'কেন পরেছিলে তুমি ও-সব? পাইপ বেয়ে উঠতে সুবিধে হবে বলে?'

লোকটি চুপ করে রইল।

'বেশ, যেমন এসেছিলে তেমনি এবার পাইপ বেয়ে নেমে যাও। কতক্ষণ আর তোমাকে নিয়ে রাত জেগে বসে থাকব?'

'না, না। পাইপ বেয়ে আমি কিছুতেই নামতে পারব না।'

'পারবে না? উঠতে পেরেছিলে কী করে?'

'কী করে পেরেছিলাম? তাই তো। নিজেই এখন সে কথা ভাবছি।'

'সে কথা বললে চলবে কেন? উঠতে যখন পেরেছিলে, নামতেও পারবে। নামতেই হবে তোমাকে।'

'না, না', লোকটির স্বর এবার ব্যাকুল হ'য়ে উঠল, 'পারব না। কিছুতেই পারব না। আমি ঠিক পড়ে মরে যাব। দয়া করে আমাকে সিঁড়ির পথটা একটু দেখিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

'বা রে আবদার! এখন আমি হাঁকডাক করে দরোয়ানকে জাগাতে যাই আর কি। আর দরোয়ান যদি মনে করে, তোমার মতো পোষাক নিয়ে কোন লোক আমার কাছে আসে, তাহলে কি আর আমার মান থাকবে।'

লোকটির মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল।—'তাই তো—'

'তাই তো তাই তো করে আর লাভ কী? পাইপ বেয়েই নামতে হবে তোমাকে!'

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লানমুখে বললে, 'নামতে যদি হয়ই তো নামব। এক্ষুনি।'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি।'

'আচ্ছা।' লোকটি অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করল। 'এক গ্লাশ জল দিতে পার আমাকে?'

'তা আর পারিনে। জল খাবে?'

'জল খাব।'

'না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু আবার কী?'

'এই যেমন, হুইস্কি—'

'না, না, ও-সব কিছু না।'

না কেন? হুইস্কি খেয়েছ কখনো?'

'না।'

'তাহলে ছাখো না একটু খেয়ে।'

'না, জল।'

ললিতা ঘরের কোণের কুঁজো থেকে এক গ্লাশ জল গড়িয়ে এনে দিলে।

লোকটি ঢকঢক করে সবটা জল খেয়ে ফেলে বললে, 'আঃ।' তারপর আস্তে-আস্তে—যে-জানলা দিয়ে সে ঢুকেছিল, তার দিকে পা বাড়াল।

'ও কী, চললে ?'

'হ্যাঁ।' একটু পরে: 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

হঠাৎ ললিতা বলে উঠল, 'এই—'

লোকটি ফিরে তাকাল।

'—তোমার জিনিস যে ফেলে যাচ্ছ।'

'কী জিনিস ?'

'তোমার পিস্তল—আর মুখোশ।'

'ও থাক গে।' বলে লোকটি আবার পা বাড়াল। 'কী হবে আর নিয়ে ?'

'আমারই বা কী হবে রেখে ? কেউ দেখলে যদি জিগেস করে, তখন বলবই বা কী ?'

'ফেলে দিও।'

'ফেলবই বা কোথায় ? না, তুমি নিয়েই যাও।' ললিতা জিনিস দুটো কুড়িয়ে আনল।

'আচ্ছা দাও, নিয়েই যাচ্ছি।' লোকটি ফিরে ললিতার কাছে এসে সেগুলো নিতে যাবে, এমন সময় এক প্রকাণ্ড হাড়-ভাঙা হাই এসে তাকে বাধা দিল।—'আঃ, কী যে ঘুম পাচ্ছে!' কথাগুলো জড়িয়ে গেল তার।

ললিতা তার ঘুমে-ঘোলা চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিগেস করলে, 'আচ্ছা, কেন করলে তুমি ?'

'কী করলাম ?'

'এই যে—'

'কেন ? বুঝতে পার না কেন ?'

'টাকার জন্য ?'

লোকটি কথা না বলে ললিতার হাত থেকে তার পিস্তল আর মুখোশ নিতে গেল, কিন্তু সে-দুটো তার হাত ফসকে পড়ল মেঝের উপর।

'বা—বাঃ, এতই ঘুম পেয়েছে তোমার! এই ঘুম নিয়ে তুমি আবার যাচ্ছিলে পাইপ বেয়ে নামতে।—থাক, ও-দুটো আর কুড়োতে হবে না এখন—না-হয় একটু বসেই যাও। বস না—এখানেই বস।'

লোকটি ভয়ে-ভয়ে আলগোছে খাটের উপর বসল।

মশারিটা চাঁদা করে তুলে ললিতা বসল তার কাছে।—'এইবার বলো।'

'কী?' (অস্পষ্টস্বরে)

'আচ্ছা, তোমার এমন-কী টাকার দরকার হল?'

'টাকার দরকার সবারই হয়।'

'সবাই কিছু পায়ও। কী করো তুমি?'

লোকটি বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ তুলে মৃদুভাবে একটু সঞ্চালন করল।

'থাক কোথায়?'

'মেসে।'

'কী করে চলে?'

'চলে না। সেইজন্তেই—'

'ও। তোমার বাবা—?'

বাঁ হাত একবার শূন্যে ঘোরাল সে।

'মা—'

'আছেন এক মা।'

'ভাই-বোন?'

লোকটি আঙুল দিয়ে শূন্যে ঢালু রেখা আঁকলো।

'অনেক বুঝি?'

'অনেক।'

'কোথায় থাকে তারা?'

'দেশে।'

'সেখানে—?'

'এই, কোনরকমে।'

'তুমিই বড়?'

লোকটি মাথা ঝাঁকাল।

'আর কেউ নাই তোমাদের?'

লোকটি মাথা নাড়ল।

'হু।' একটু চুপ করে থেকে: 'বলো না।'

'কী?'

'সব বলো।'

'সবই তো বললাম।'

'ঐ যাঃ—আসল কথাটাই তো এতক্ষণ জিগেস করা হয়নি। তোমার নামটি কী?'

'কমল।'

'বাঃ, বেশ নাম, কমল। কমল, কমল।' ললিতা দুএকবার নামটা নিজের মনে পুনরাবৃত্তি করলে।

'ডাকছ কেন?'

ললিতা ছেলেটির এলোমেলো চুলগুলিতে একবার হাত বুলিয়ে আস্তে বললে, 'কমল।'

'উঃ, কী শক্ত করেই বেঁধেছিলে হাত, এখনো টনটন করছে।'

'খুব লেগেছিল, না? দাও, আমি রগড়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে।—না, না, এমনি সুবিধে হবে না। তুমি শোও তো।'

কমল দ্বিরুক্তি না-করে বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ললিতা তার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে কব্জি থেকে আরম্ভ করে আস্তে-আস্তে রগড়ে দিতে লাগল।

'আঃ', গভীর আরামে কমল চোখ বুজল। তার মুখ সদ্য-মৃত লোকের মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ। সেই মুখের দিকে ললিতা তাকিয়ে রইল—মুগ্ধ দৃষ্টিতে। হঠাৎ তার মনে হল বিছানায় যেন সে শুয়ে আছে নিজে, আর পাশে বসে আছে তার মা—সারা রাত সে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে—'মাগো আর পারিনে, মরে গেলাম, উঃ, মা, মা-গো।' তারপর ভোরের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছে, মার হাত তার কপালে মুখে, চুলে·· সেই তাদের পাড়াগাঁর বাড়ি, খিড়কির পুকুর, উঠোনে ব্রতের আলপনা, মাঘের শীতে রাত থাকতে নাইতে যাওয়া, মাঘমণ্ডলের গান, 'ওঠো ওঠো সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে'—মা-গো। ললিতার সারা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল, তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

ঘুমের মধ্যে কমল পাশ ফিরল।

॥ নতুন নেশা ॥

বিষাক্ত প্রেম | মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মনের মিল তো যখন তখন যেমন তেমন অবস্থায় যার তার সঙ্গে অনায়াসেই হতে পারে। সত্য আর সরলার মনের মিল হতেও একমাসের বেশী সময় লাগল না। অপরে যেখানে বাদ সাধে না, মাথা ঘামানও দরকার মনে করে না, সেখানে সেই মিলন হতে মনের মিলটাই সাধারণতঃ যথেষ্ট, যে-মিলনটা মনের মিলের স্বাভাবিক পরিণতি। মনের মিলই তো প্রেম। কিন্তু সত্য আর সরলার মনের মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনটা যেন তারাই নিষ্প্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে রেখে দিল। পরস্পরকে না দেখে তাদের মন করতে লাগল কেমন কেমন, কিন্তু তারা কেউ টের পেল না যে একসঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ না করে তাদের আর উপায় নেই।

ঘটনাচক্রে মনের যে তাদের মিল হয়ে গেছে, সরলার চেয়ে এ বিষয়ে সত্যই যেন হয়ে রইল বেশী উদাসীন। একেই তো লোকটা সে একটু চাপা, তার উপর তার ব্যবসা হল চুরি—সরলার ঘরে আসা-যাওয়াও সে আরম্ভ করেছে একদিন সুযোগমত তার গয়না আর টাকা নিয়ে পালাবার মতলবে। জীবনে কোন কিছুর অভিব্যক্তি না হওয়াটাই সত্যর পরম কাম্য। যা কিছু হবার গোপনেই হোক, জীবিকার্জন থেকে জীবন-যাপন পর্যন্ত। নিজের মনটা চুরি গিয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করবার মানুষ সত্য নয়।

অবশ্য সরলার ঘরে প্রথম রাত্রে সে এসেছিল প্রচলিত মন-চোরার বেশে। মন-চোরার বেশটা কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে। বাড়িতে পর্যন্ত চোরের ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে থাকে তারাই জানে, ব্যবসায়ীটির নিজের ঘরে সত্য সুবিধা করতে পারেনি। তার বিগড়ে-যাওয়া ছেলেটার ঘর থেকে কেবল সংগ্রহ করে এনেছিল রাত্রিচর বাবু সাজবার সরঞ্জাম—ধুতি পাঞ্জাবী, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম ইত্যাদি। একজোড়া নতুন জুতো কিন্তু তাকে কিনতে হয়েছিল। তবে জুতো কেনার পয়সাটা জুটেছিল ব্যবসায়ীর বিগড়ে-যাওয়া ছেলেটারই মনিব্যাগে। কিন্তু যতই হোক, এমনিভাবে পরের মনিব্যাগ থেকে পয়সা রোজগার করাটা যখন সত্যর জীবিকার্জ্জনের উপায়, হাতে-আসা পয়সা খরচ করে দামী জুতো কিনতে হওয়ায় মনটা তার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বৈকি। মোটামুটি বলা যায়, জামা কাপড়ের সঙ্গে মানানসই জুতো কেনার শখটাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনেই সে সরলার ঘাড় ভাঙবার মতলব ঠিক করেছিল। পায়ের জুতোর মৃদু মসমসানি আওয়াজ কানে এলে মনের মধ্যে কেবলি মৃদু আপসোস আর অস্বস্তি জাগতে থাকবে, এ অবস্থার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে মানুষ কদিন ঠিক থাকতে পারে?

রূপ বলে সরলার কিছু নেই। এ একটা অতি বড় সম্পদ সরলার—অতি বড় আকর্ষণ। সবাই রূপসী বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসী বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোন একটা মতামত ঠিক করে ফেলবার অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোন পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয় না, ভীরু পুরুষেরা তাকে ভারি পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যে-সব পুরুষের স্বভাব, তারা বড় ভীরু। সরলার গায়ে গয়না আর ঘরে আসবাব আছে তাই অনেক।

তবে গায়ের গয়না অধিকাংশই গিল্টি করা, ঘরের আসবাব অধিকাংশই নীলামে-কেনা। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস। আসল সোনার গয়নাগুলি সরলা রেখেছে লুকিয়ে, গায়ে রাখার চেয়ে লুকিয়ে রাখলে গয়না যে নিরাপদ থাকে এ খবর জানা থাকায় গায়ের গিল্টি-করা গয়নার জন্য তার কোন আপসোস নেই। আসবাবগুলি তার আদায়-করা উপহার—আদায়-করা উপহার যে সাধারণতঃ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস হয় এ খবরটাও জানা থাকায়, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আসবাবের জন্যও তার কোন আপসোস নেই। তাছাড়া, তিন পুরুষের একটা

ভাঙা খাট আর উই-এ ধরা আলমারিতে সাজান স্বামীর ঘরখানার তুলনায় সাহেববাড়ির নীলামে-কেনা আসবাবে সাজান ঘরের শোভাই কি কম মনোহর! খাটখানা সরলার নতুন—এই ঘরে মদ খেতে খেতে সাতবছর আগে যে-লোকটা হার্ট ফেল করে মরে গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সরলার স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। তা হোক। সাতবছরে অনেক স্মৃতি উপে যায়, কিন্তু দামী খাট পুরনো হয় না।

এই যে সত্য আর এই যে সরলা, কিছুদিন অযাচিতভাবে তারা পরস্পরকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে, একজনের জন্য অপরের মনে ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, বড ভাল তারা, বড় সরল, আনন্দের নামে হৈ-চৈ করতে তাদের পটুত্ব অসাধারণ, দুজনের মধ্যে মিল যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

তারপর দুজনের হল মনের মিল।

কিন্তু কথাটা যতদিন মিথ্যা ছিল ততদিন বিশ্বাস করান গিয়েছিল সহজেই, এখন কে একথায় বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করিয়ে লাভও নেই, বিশ্বাস করবার উপায়ও নেই। সোজাসুজি মুখে বলে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, বড় বড় প্রতিজ্ঞা করে দেবদেবীর নামে দিব্যি কেটে জানালেও ফল হবে সেই একই। সত্যের লুকানো গয়না আবিষ্কারের ফন্দি-ফিকির ফাঁদের মত সরলাকে যেমন ফাঁপরে ফেলে রেখেছে তেমনি ফাঁপরেই ফেলে রাখবে, সরলার টাকা আর উপহার আদায়ের চেষ্টা সত্যকে যেমন বিপদগ্রস্ত করে রেখেছে তেমনি বিপদগ্রস্তই করে রাখবে। মনের মিল হোক বা না হোক, কারোর জন্য সোনার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সত্যর নেই, টাকার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সরলার নেই!

সরলা ভাবে, লোকটা যদি চোর না হত। দাবী-দাওয়া নিশ্চয় কিছু কমাতাম, আদর যত্নের পরিমাণ নিশ্চয় কিছু বাড়াতাম, বেশী বেশী সময় কাছে রাখবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীছাড়া যে চোর বদমাস।

সত্য ভাবে, ছুঁড়ি যদি ঝানু না হত! ঘাড় ভাঙার মতলবটা নিশ্চয় বন্ধ রাখতাম, যা রোজগার করি নিশ্চয় সব এনে দিতাম, একটা বোঝাপড়া করে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গাড়তাম। বজ্জাত যে পাকা কাবুলিওয়ালী!

এইসব ভাবে আর দুজনেরই গা জালা করে।

গা জ্বালা করে আর দুজনেই মনে মনে আপসোস করে যে; আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি বাবা, ভাবনায় চিন্তায় দেহ গেল।

আপসোস করে আর সত্য ভাবে যত শিগগির সম্ভব কাজটা হাসিল করে পালাবে।

আপসোস করে আর সরলা ভাবে, আদায়ে একটু ভাটা পড়লেই লোকটাকে তাড়াবে।

একদিন বিকাল বিকাল হাজির হয়ে সত্য বলে, 'কতগুলো টাকা পেয়েছি সরলি, আজ একটু ফুর্তি করা যাক, অ্যা ?'

সরলা খুশী হয়ে বলে, 'কত টাকা পেয়েছিস ? কোথায় পেলি ?'

এক চোখ বুজে সত্য মুখের যে ভঙ্গি করে তার তুলনা নেই, 'পেলাম।'

জগতে পাওয়াটাই সত্য। কি উপায়ে কোথায় কি পাওয়া গেল তার বিচার করতে বসে কেবল তার্কিক। সরলা তাই খুশীতে গদ গদ হয়ে বলে, 'জেলে যাবি বাপু তুই একদিন।'

বিপদ মাথায় করে উপার্জন করে এনে পুরুষ যখন হাতে তুলে দেয়, তখনকার মত দুর্বল মুহূর্ত মেয়েমানুষের জীবনে আর কখন আসে? সরলা গদ-গদ হয়েছে টের পেয়ে সত্যও গদ গদ হয়ে বলে, 'যাই তো যাব জেলে, তোর জন্ম যাব তো ?—বয়ে গেল।'

সরলা আরও গদ গদ হয়ে বলে, 'ইস্!'

শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয়নি, তবু কি যেন কামড়ায়। কামড়ায় অবশ্য সেই সাপের মত, যে সাপ কোন অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।

তাই মুখখানা বিমর্ষ করে সত্য বলে, 'এক কাজ করি আয় আজ, একটা বড় বোতল এনে রেখে বায়স্কোপ দেখতে যাই চল—ফিরে এসে ফুর্তি জমান যাবে। ভাল করে সাজিস কিন্তু, সবাই যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে তোর দিকে।'

'আসমানী রঙের শাড়িটা পরব ?'

এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যকে একটু ভাবতে হয়।

'বেগুনিটা পরলে হত না ?—আচ্ছা পর, আসমানীটাই পর। বেগুনি আর আসমানী দুটোর যেটাই পরিস, এমন দেখায় তোকে মাইরি—সত্যি যেন তুই কার বৌ।'

'ইস্ !'

সত্য হাই তুলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, 'গয়নাগুলো বদলাস কিন্তু—গিল্টি দেখে লোকে হাসবে, আমার কিন্তু লজ্জা করবে।'

এ সমস্যাটা সত্যসত্যই জটিল। সরলা কিন্তু চোখের পলকে মীমাংসা করে বলে, 'তুই বুঝি ভাবিস গিল্টি পরে যেতে আমার লজ্জা হয় না? যা না, টিকিট কেটে আনগে না তুই, আমি এদিকে বোতল-ফোতল আনাই, সেজেগুজে ঠিক হয়ে থাকি।'

সত্য সাত বছরের নতুন খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে বলে, 'টিকিট কাটতে যাব কি, চার আনার টিকিট তো নয়। দুজনে একবারে গিয়ে টিকিট কাটব।'

কিন্তু এ ফিকিরও তার সার্থক হয় না, কখন কোন্ ফাঁকে সরলা আসল সোনার গয়নাগুলি গোপন স্থান থেকে বার করে আনে সত্য টেরও পায় না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু, সরল ভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'কখন বদলালি গয়না?'

'এই তো মাত্তর।'

সত্যর বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'এই মাত্তর!—কোথায় ছিল রে?'

আদায়-করা উপহার নীলামে-কেনা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আলমারিটার দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে বিনা দ্বিধায় সরলা বলে, 'ঐ আলমারিতে, আবার কোথা?'

এমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার তার জবাব দেবার ভঙ্গি এবং এমন স্পষ্ট, জোরালো তার জবাব যে, এক বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ হতে পারে। সরলার গয়না কোনদিন আলমারিতে লুকান ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনদিন থাকবে না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছা হয় বলে সত্য দাঁত বার করে হাসে। সরলাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে বলে তাকে বেশীরকম আদর করে। একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই জেনে মনটা যত তার ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, রসিকতা করে ততই সে সরলাকে হাসায়। সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে যায় দেশী ফিরিঙ্গি হোটেলে, পচা-চপ আর দামী বিলাতী মদ খাওয়ায়।

সরলা বলে, 'ঘরেই তো ছিল, আবার এখেনে কেন?

'আজ একটু প্রাণ ভরে ফুর্তি করতে সাধ যাচ্ছে।'

'কেন, আজ কি ?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটা সংশয়, মৃদু একটা ভয় ধরা পড়ে। সত্য সাবধান হয়ে বলে, 'অতগুলো টাকা রোজগার করলাম যে আজ ?' বলে দাঁত বার করে হাসে না, সরলাকে আর বেশীরকম আদর করে না, বেশী বেশী রসিকতা করে হাসায় না।

ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পরে সরলা তাই জিজ্ঞাসা করে, 'হঠাৎ যে আবার মুখ ভার হল ?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভয় ও সংশয় স্পষ্টতর প্রকাশ পাওয়ায় সত্য আবার সাবধান হয়ে বলে, 'না, মাইরি না। মুখ ভার হয়নি।'

জবাবটা স্বাভাবিক হওয়ায়, বড় রকম কৈফিয়ৎ না থাকায়, একটু নিশ্চিন্ত হলে সরলা ফুর্তি জমানর আয়োজন করে। বোতলের রসালো বিষে কখন কোন্ ফাঁকে যে সত্য কাগজের মোড়কের খানিকটা গুড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়, সে টেরও পায় না। সত্যকে ফাঁকি দিয়ে লুকানো গয়না বার করতে সে যেমন পটু, ফাঁকি দিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে দিতে সত্যও তার চেয়ে কম পটু নয়।

বিষে বিষক্ষয় হবার নিয়মটা এ ক্ষেত্রে বোধ হয় বাতিল হয়ে যায় এজন্য যে বোতলের বিষকে লোকে সুধা বলে, মনেও করে তাই। মুখ বিকৃত করে সরলা বলে, 'থুঃ, কি খাওয়ালি আমাকে তুই ? কি বিচ্ছিরি স্বাদ।'

সত্য অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পচা চপ্ খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার।—নে, পান খা একটা।' বলে সস্নেহে তার মুখে পান গুঁজে দেয়।

তারপর সরলা আরও খানিকটা বিষ পান করে আরও কাতর হয়ে বলে, 'গা কেমন করছে। মাথা ঘুরছে। আর খাব না আমি।'

সত্য আবার অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বললাম পান খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার।—আয় মাথাটা টিপে দিই।'

তারপর সত্যর কোলে মাথা রেখে সরলা ছটফট করে, গোঙায়, মুখে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম করে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যর মুখের দিকে, দুহাতে সত্যকেই জড়িয়ে ধরে বিষক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে, অপমৃত্যুকে জয় করার চেষ্টায় সাহায্য চায়, আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিথিল, অবসন্ন নিঃশব্দে নিশ্চেষ্ট হয়ে নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেয় সত্যর হাতে, কিন্তু চেতনা কেবল থাকে চোখে আর চোখ দেখে মনে হয় ভেতরেও যেন একটা অদ্ভুত নির্বোধ চেতনা সৃষ্টি হয়েছে।

একেই বলে জীবনপাত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। যার সঙ্গে মনের মিল হয়েছে তাকে মরণাপন্ন করে কিছু গয়না আর টাকা সংগ্রহ করা। বিবর্ণ পাংশু মুখে সত্য একে একে সরলার গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নেয়, সরলার আঁচলে বাঁধা চাবির সাহায্যে লুকানো ও জমানো টাকাগুলি খুঁজে খুঁজে বার করে। কিন্তু সব সংগ্রহ করে পালাবার সময় বিষাক্ত প্রেমের বিষক্রিয়ায় সত্যর পাও যেন অবশ হয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করে। বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সরলার পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কার সাধ্য কল্পনা করে সে পাকা মেয়ে, জবরদস্ত কাব্লিওয়ালি। তাড়াতাড়ি পালানোই ভাল, কিন্তু সত্য জানে, সমস্ত রাত এ ঘরে কেউ আসবে না, দরজা বন্ধ থাকলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত সরলার খোঁজ পড়বে না। মুখের গাঁজলা মুছিয়ে মাথায় একটু জল দিতে কতক্ষণ লাগবে ?

সরলার আসমানী রঙের শাড়ির আঁচলেই তার মুখ মুছিয়ে, মুখে চোখে জল ছিটিয়ে এবং অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা বাঁচিয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে দিলে আর কতটুকু সেবা করা হয় ? চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না ! এমনি আশ্চর্য সেবা করার নেশা !

পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করে সত্যর হঠাৎ মনে হয়, মরবার কথা নয় বটে, কিন্তু যদি মরে যায় ? সব বিষের ক্রিয়া তো সকলের ওপর সমান হয় না ! যে বিষে একজনের কিছুই হয় না, সেই বিষে অন্য একজনের মরে যাওয়া আশ্চর্য কি ? আর যদি জ্ঞান না হয় সরলার অপলক চোখে আর যদি দৃষ্টি না আসে, বক্ষস্পন্দন যদি চিরদিনের জন্য থেমে যায় ? অনেকেই জানে সে সরলার সঙ্গে ছিল, খোঁজ তার পড়বেই। সরলাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালালে পালাবার সময়টা সে একটু বেশী পাবে বটে, কিন্তু এই অবহেলার জন্য সরলা যদি মরে যায়, চোরের চেয়ে খুনীকে আবিষ্কার করার জন্য পুলিশের মাথাব্যথাও হবে সেই অনুপাতে বেশী। ধরা পড়লে চোরের চেয়ে খুনীর শাস্তিটাও চিরদিন বেশীই হয়ে এসেছে।

সত্য জানে সরলার কিছু হবে না, কাল অনেক বেলায় জ্ঞান হয়ে টাকা

আর গয়নার শোকে সে যদি হার্টফেল না করে। যে বিষ যতখানি সরলার পেটে গিয়েছে তার তিনগুণ বিষ পেটে গেলেও সরলার কিছু হবে না, কিন্তু যদি হয়? খুব কি দুর্বল নয় সরলা, খুব নির্জীব? আজ পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ সে দেখেছে, তাদের সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সরলার কম নয়? এমন কোমল এমন অসহায় জীব জগতে আছে?

ভয়ে সত্যর বুকের মধ্যে মোচড দিতে থাকে, নিস্পন্দ সরলার দিকে চেয়ে জগতে কারও যে বিষে মরবার কথা নয় সেই বিষটুকু সহ্য করবার মত শক্ত-সমর্থ সরলা নয় কেন ভেবে ক্ষোভে তার চোখে জল আসে। এত বেশী রাগ হয় যে, সরলার শিথিল অবসন্ন দেহটা বুকে তুলে তাকে পিষেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এতদিনের মতলব যে এমনিভাবে ফাঁস করে দেয়, সেই তার উপযুক্ত শাস্তি। রাগটা খুব বেশী হয় বলে বুকে পিষে মেরে ফেলবার কথাটাই সত্যের মনে আসে, গলা টিপে মেরে ফেলবার সহজ উপায়ের কথাটা খেয়াল হয় না।

একে একে গয়নাগুলি সরলাকে পরিয়ে দিয়ে, তার টাকাগুলি যথা স্থানে লুকিয়ে রেখে, আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সে সরলার আরও জোরাল সেবা আরম্ভ করে দেয়। যে অবস্থা ফিরে এলে সে যে বাঁচবেই এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, সে অবস্থাটা ফিরে আসতে কাল বেলা হবে—মেয়ে কি সহজ ননীর-পুতুল! সত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হল না। যাক, কি আর করা যায়, চুরি করার জন্য খুনী হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্য ব্যবস্থা করবে—আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিযে রাখে? যত দিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটুম্বর।

॥ সরীসৃপ ॥

বারবধূ | সুবোধ ঘোষ

বাইরের বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায়, তার সঙ্গে একদল মেয়ে ও পুরুষের হাসিখুশী আলাপের কলরব। কারা যেন এসেছে। এইবার কড়া নাড়ছে।

—শুনছেন। বাইরে থেকে এক ভদ্রলোকের গলার স্বর শোনা গেল।

ঘরের ভেতর চমকে উঠল প্রসাদ। চেয়ারটা ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়াল। ঘরের অবস্থা যেমন অসম্বৃত, তার বুদ্ধিও তখনকার মত তেমনি অপ্রস্তুত। ফাঁপরে পড়ল প্রসাদ। চাপা গলায় আস্তে আস্তে বলল—যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই হল লতা। শিগগির ওঠ।

লতা বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—আমাকে মিছে ভোগাও কেন? আমি ওসবের কি ধার ধারি?

তাকিয়ার ওপর এলিয়ে শুয়ে তেমনি নিবিষ্টমনে সিগারেট খেতে থাকে লতা। পাশে টেবিলের ওপর একটা বীয়ারের বোতল আর চাবি, তখনো ছিপি খোলা হয়নি। একটা রেশমী শাড়ি এলোমেলোভাবে লতার কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোতে সবেমাত্র বৈঠক তখন বসেছে।

—অন্যায় করছ লতা। ওঠ লক্ষ্মীটি। তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেল। এতে শুধু আমারই মান বাঁচবে তা নয়, তোমারও। একটু ভদ্রতা রক্ষা করে

চলতে দোষ কি ? ওঠ, কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট কর, অনেকক্ষণ ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লতা উঠল। প্রসাদ তাড়াতাড়ি বীয়ারের বোতলটা আলমারিতে তুলে বন্ধ করল। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দুটো বড় বড় ছবি নামিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখল। যতদূর সম্ভব ঘরের মূর্তিটাকে দু'চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল প্রসাদ কোথাও কোন অপরুচির ইঙ্গিত সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে যদি বা লুকিয়ে থাকে। হ্যাঁ, ঐ পর্দাটা—জরির কাজ-করা এক জোড়া বিলিতী নগ্নিকা বাতাসের দোলায় কুৎসিতভাবে ঢলাঢলি করছিল তখনো। প্রসাদ পর্দাটাকে এক থাবা দিয়ে ধরে, কুঁচকে পাকিয়ে, খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল।

প্রসাদ—এইবার তুমি একটু তাড়াতাড়ি···।

লতা—নাঃ, আর পারি না। তোমার ভদ্দোরপনার ভড়ং রাখতে গিয়ে বার বার বাইরের লোকের কাছে ঢঙ দেখাতে পারব না। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর-বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকব কেন ? থিয়েটারে খাটলে দুদশ'শো হত।

প্রসাদ যত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লতার উৎসাহ যেন ততই এক নির্বিকার হৃদয়-হীনতায় শ্লথ হযে পড়ে থাকে। প্রসাদ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখের চেহারাটা যেন বলছে—জোর করছি না। দয়া করে উদ্ধার কর।

ফিক করে হেসে ফেলে লতা। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে—ডুডু খাবে খোকা ? ভদ্দোরলোকের ভয়ে বুক দুর দুর করে, মেয়েমানুষ রাখার শখ কেন ? শ্যাম রাখি কুল রাখি—দুই-ই একসঙ্গে হয় না।

লতা একটা তোয়ালে আর শাড়ি আলনা থেকে তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায়। প্রসাদের বুক থেকে বদ্ধ নিঃশ্বাসটা মুক্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দেয়। জন চারেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও যুবক, ছ'সাতটি প্রৌঢ়া ও তরুণী আর গোটা দশেক ছোট ছোট মেয়ে মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

হিলতোলা জুতো আর স্যাণ্ডেলের শব্দ। একপাল ছেলের উল্লম্ফ হুটোপুটি, শাড়ি আর আঁচলের খস্‌খস্ ফিস্‌ফাস্ শব্দ, চুড়ির নিক্কণ, পাউডার ও এসেন্সের একটা সুবাসিত ঝড়, তার সঙ্গে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়দের চুরুটের ধোঁয়া

আর হাতছড়ির টুকঠাক—বাইরের পৃথিবী থেকে একটা প্রীতি ও সৌজন্যের উচ্ছ্বাস যেন প্রসাদের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে এসে ছড়িয়ে পড়ল। প্রসাদ হাসি মুখে নমস্কার জানায়—আসুন।

বেশ লোক এঁরা। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই। কেতাদুরস্ত ভদ্রয়ানার বালাই নেই। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। বৃদ্ধ রাখালবাবু গা থেকে আলোয়ানের স্তূপ নামিয়ে প্রসাদের খাটের ওপরেই তাকিয়া টেনে বসে পড়লেন। যে যার ইচ্ছামত চেয়ার টেনে নিল। মেয়েরা ব্র্যাকেট থেকে একটা গোটানো সুতির গালিচা নিজেরাই নামিয়ে নেয়, মেঝের ওপর পাতে এবং বসে পড়ে।

এক যুবক-আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে এক বৃদ্ধ-আগন্তুক বললেন—এইবার তোমার অভিযোগ শুনিয়ে দাও, রণজিৎ।

রণজিৎ প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে—সত্যি মশাই, আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বলবার আছে। আমরাও আপনার মতই এখানে চেঞ্জে এসেছি। এই তো ক'ঘর মাত্র আমরা, এ ছাড়া আর কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। আমরা খুঁজছি কি করে দল ভারি করি, আর আপনি বেমালুম আড়ালে লুকিয়ে আছেন ?

প্রসাদ সলজ্জভাবে স্বীকার করে নিল—হ্যাঁ, এটা অন্যায় হয়েছে।

মেয়েদের দল থেকে প্রথম কথা বলল আভা, রণজিতের বোন।

—বড়দা, তোমরা তো এরই মধ্যে নিজেদের দল ভারি করে ফেললে। আমরা কি কবি ? ভেতর থেকে তো কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রসাদ তেমনি লজ্জিতভাবে হেসে হেসে বলে।—একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি আসছেন।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল লতা।

চাওড়া-পাড় একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে লতা। ঘরে ঢুকে সামনেই বুড়ো রাখালবাবুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় লতা, মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে সামনে নামিয়ে দেয়। লতার সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই, তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।

লতাকে দেখবার পর প্রসাদের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণের ভীরুতা ও কাতরতার খিন্ন ছায়াটুকু সরে গেল। কথাবার্তায় সহজ স্ফূর্তি ফিরে পেল প্রসাদ।

রণজিতের বৌন আভা লতাকে হাত ধরে গালিচার ওপর বসাবার জন্ত একবার টানল। লতা বলল—ভেতরে চলুন।

বাইরের ঘরে ও ভেতরের ঘরে অবাধ গল্প তর্ক ও হাসির পালা গড়িয়ে চলল অনেকক্ষণ। ছেলেপিলেরা দু'বার মারামারি বাধাল। তাদের থামাতে গিয়ে বুড়োরা গোলমাল করল আরও বেশি। আজ দেড় মাসের মধ্যে বরাকর কলোনির একান্তে এই নিরালা বাংলো বাড়িটার কোন সন্ধ্যা আজকের মত এত হর্ষমুখর হয়ে ওঠেনি।

অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করার জন্য লতা খাবার তৈরী করবার উদ্যোগ করে। মেয়েরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করে—শুধু চা হলেই হবে, খাবার-টাবার করবেন না, খবরদার।

লতা বলে—কিন্তু ছেলেরা কি খাবে? শুধু চা? তা হতে পারে না।

লতা রাগ করেই বলে—দেখছেন তো, ওদিকে মশাই কেমন নিশ্চিন্ত মনে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছেন। এদিকের কাজের জন্য কোন হুঁশ নেই, একটু খোঁজখবরও নেই।

মেয়েরা হেসে উঠল সবাই—তা বেশ করেছেন, আপনি হিংসে করছেন কেন?

আভা হঠাৎ নিজের খেয়ালেই বাইরের ঘরে এসে বলে—বৌদি রাগ করছেন। ভেতরে কত কাজ রয়েছে, আর আপনি এখানে গল্পে ডুবে আছেন?

প্রসাদ—কেন কি ব্যাপার?

আভা—স্বয়ং এসে খোঁজ নিন।

লতাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। দরজার আড়ালে ভেতরের দাওয়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রসাদ ভেতরে আসতেই ফিস্‌ফিস্ করে লতা বলে—চা না হয় হল, কিন্তু ছেলেপিলেদের কি দেব? তুমি একবার বাজারে ঘুরে এস, কিছু মিষ্টি-টিষ্টি···।

আভা এবং আরও দুটি তরুণী ঐ মৃদু ফিস্‌ফিসের ভাবার্থ বুঝতে পেরেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করে—বৌদি বড় বাড়াবাড়ি করছেন!

প্রসাদ বলে—বিস্কুটের টিনটা খুললে হয় না? নইলে বাজারে যেতে হয়।

লতা বলে—তাই তো, মনে ছিল না। যাক, ওতেই হবে।

বিস্কুটের টিন শূন্য করে দিল ছেলের দল। মেলামেশার পালা ক্ষান্ত হল

রাত্রি দশটায়। তার আগে প্রসাদকে গাইতে হল গান; ঘরের কোণে শালুর খোলে ঢাকা এসরাজটা গুণী প্রসাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিল।

রাখালবাবু আলোয়ানটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন আবার। রাখালবাবুর স্ত্রী, মেয়েরা এঁকে মাসীমা বলে ডাকছিল, পায়ের মোজাটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। তাঁর ফোলা ফোলা পা দুটোতে বেরিবেরির নিদর্শন স্পষ্ট। তারকবাবু নতুন চুরুট ধরিয়ে হাতছড়িটা আবার ঠুকলেন। আভা ছাড়া সঙ্গের আর তিনটি মেয়েই হল তাঁর ভাগ্নী, ভাইঝি আর শ্যালিকা। ছেলেপিলেদের মধ্যে চারজন হল রাখালবাবুর নাতি, বাকী সবকটি হরিশবাবুর। হরিশ দম্পতি আজ অনুপস্থিত। তাঁরা বাতের প্রকোপে এখন শয্যা আশ্রয় করে আছেন।

রাখালবাবু বললেন—তা হলে এইবার তোমায় মুক্তি দেব প্রসাদবাবু। রাত হল অনেক। আমরা উঠি।

বিদায় প্রসঙ্গে আর একবার আলাপবার্তার কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। প্রসাদ ফটক পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল। লতা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল ছায়ার মত।

চলে গেল আগন্তুকের দল।

—আঃ বাঁচা গেল! বীয়ারের বোতলটা আবার টেবিলের ওপর নামালো প্রসাদ। শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লতার, তাই বিছানার ওপর একটা বালিশ আঁকড়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু প্রসাদের গলার স্বরে স্ফূর্তি চড়ে উঠেছে—এ কি? উঠে বসো লতা, এ সময়ে বে-রসিকতা করো না মাইরি!

লতা কোন সাড়া না দিয়ে তেমনি নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকে। প্রসাদ হাত ধরে টানাটানি করতেই উঠে বসে এবং রুক্ষস্বরে বলে—যখন তখন অসভ্যতা করো না।

প্রসাদ—বেশ বেশ, করব না। যাও, এবার চটপট এই আল্‌তা-ফাল্‌তা সাজসজ্জা বদলে এস। এক পাত্র চড়িয়ে নিয়ে বসা যাক জুত করে।

লতা—এ রকম ক্যাংলাপনা করছ কেন? কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে চলে গেল লতা। তাঁতের শাড়ি ছাড়ল, আলতা সিঁদুর মুছে ফেলল। আকস্মিক একটি সন্ধ্যার কপট বধূবৃত্তির নির্মোক ঘুচিয়ে, পায়জামা পরে চটি পায়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকল।

প্রসাদ খুশীতে আটখানা হয়ে গেল—বাঃ, সত্যিই তোমাকে ফাইন মানিয়েছে এইবার।

লতার কানে যেন কথাটা গেল না ; ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লতা। দূরে বরাকরের পুলের ওপরে একটা আলোর সারি মিট মিট করছে। আর কিছুই দেখা যায় না। নিকটেই একটা নামহীন ফুলের গাছের তলা থেকে স্তূপীকৃত বাসি ফুলের পচাটে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। লতা লম্বা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরে নেয়, আস্তে আস্তে ছাড়ে।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদের যেন চমক ভাঙলো। দ্বিতীয় বীয়ারের বোতলটা শেষ হয়েছে। লতা তখনো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়। তার পর বিড়বিড় করে বলে, স্বর জড়িয়ে যায়—বেশ, বেশ! ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক। দূরেতে বন্ধু দূরেতে রহ। কিন্তু তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়। এতগুলি ভদ্র নরনারীতে দিনে তারা দেখিয়ে দিলে বাবা। তবু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্! আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিশ দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু···কিন্তু তুমি আমাকে এইমাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোমাকে জুতিয়ে···।

টেবিলটা একটা ঠেলা মেরে উল্টে দিয়ে সরোষে দাঁত ঘষে প্রসাদ একটা হুমকি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লতা শান্ত ও সহজ অথচ দৃঢ়স্বরে বলে—হঠাৎ এত মেজাজ জেগে উঠল কেন? বসো বলছি!

প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মত তবু যেন থেকে থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভাল করেই এ-রোগের ওষুধ জানে। এখনি প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে যদি একটু ফষ্টি করা যায়, অথবা দুটো খেউড় গেয়ে ওঠে, তবে ঐ মেজাজের আগুন ঠাণ্ডা ছাই হয়ে উঠতে কতক্ষণ।

প্রসাদ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ করে, একটা দৃপ্ত ভঙ্গি নিয়ে বলে—যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে!

লতা—বলছি তো, তাই থাকব।

প্রসাদ—তবে এত পোজ করছ কেন? তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র।

লতা—তা তো জানিই।

প্রসাদ—তুমি আস্তার চাকরানি হবার যোগ্য নও।

হঠাৎ যেন আগুনের ঝাপটা লেগে লতা ছটফট করে উঠল। এতক্ষণ প্রসাদের বকাবকিকে নেশাড়ে মানুষের মূঢ়তা মনে করেই চুপ করে ছিল লতা। কিন্তু এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে যেন একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

প্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে তার মুখের ওপর কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল লতা। কিন্তু লতার ক্ষোভ শুধু ফণা তুলে দাঁড়াল মাত্র। ছোবল আর পড়ল না।

—তোমার কাছে বাঁধা থাকতে কোন গরজ নেই আমার। আমি কালই চলে যাব তারকেশ্বরে। লতা সরে এসে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে দরজার খিল এঁটে দিল।

অনেক রাত্রে একটানা স্তব্ধতার পর লতার ঘরের কড়া বেজে উঠল আবার। নেশা কেটে যাবার পর প্রসাদের মনের অবসাদের মধ্যে সেই ভাল-মানসী ভীরুতা যেন আবার সতর্ক হয়ে উঠেছে। লতাকে সে ভাল করেই চেনে। এসব মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। জীবনের চোরাঘরে ওরা পাপের সঙ্গে চুক্তি করে চলে। বাইরের আঙিনা, যেখানে আত্মীয়তার মেলা, সেটা ওদের কাছে বিদেশের মত দুর্বোধ্য। তার মর্যাদা দেবার মত কোন দরদ ওদের নেই। লোকসমাজে প্রসাদের মান মর্যাদার জন্য কতটুকু মাথাব্যথা লতার? কাল সকালেই যাবার আগে হয়তো বরাকর কলোনির, প্রতিটি প্রাণীকে জানিয়ে দিয়ে যাবে নিজের পরিচয়, আর সেই সঙ্গে প্রসাদের এত যত্নে গড়া সুনামের সামাজিক স্বাক্ষরে কালি ঢেলে দিয়ে যাবে।

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বলে—লতা, বল তুমি রাগ করনি, তবে আমি ঘুমোতে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বল, তা না হলে এখান থেকে নড়ব না।

প্রসাদ বারবার কড়া নাড়তে থাকে, ভেতর থেকে লতার শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাব আসে—না, আমি যাব না। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড।

—চাচিজী!

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লতাকে ডাকছে বিক্রম, সুবেদারবাবুর ছোট

ছেলেটা। মেঝের ওপর বিক্রমের লাট্টু মাঝে মাঝে থর্ থর্ করে চক্কর দিচ্ছে শোনা যায়। ঘুম ভাঙতেই প্রসাদ বুঝল ভোর হয়ে গেছে।

কদিন থেকে রোজ প্রত্যূষে ছেলেটা আসে। লতার সঙ্গে চা পাউরুটি খায়। তারপর কিছুক্ষণ পেঁপে গাছটার নীচে মাটি দিয়ে একটা কেল্লা তৈরী করে, পেঁপে ডাঁটার তোপ দিয়েই শেষে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

ভাঙা স্বপ্নের মত গত রাত্রির ঘটনার ছবিগুলি যেন জাগ্রত চেতনায় আবার জোড়া লেগে সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রসাদের কাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রসাদ বুঝতে পেরেছে—পাশের ঘরে লতা জেগে উঠেছে, কাপড়-চোপড় ছাড়ছে। এইবার বাইরের ঘরের খিল খুলছে লতা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যায়, লতা বলছে—এস বিক্রম।

বিক্রম যেন অনুযোগ করে বলে—কিতনা নিঁদ যাতি হো চাচিজী।

প্রসাদ শুয়ে শুয়ে সবই অনুমান করে নিতে পারছিল। মহাবীর চাকরটাও বোধ হয় এসে গেছে। ঝাড়ু দেবার শব্দ শোনা যায়। তার পর? তার পর মহাবীর চা নিয়ে আসবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তার পর আরও দেখতে হবে—লতা সুগৃহিণীর মত সারা দুপুর মহাবীরের কাজ তদারক করছে। ভাঁড়ার খুলে হিসেব করে ঘি-ময়দা বের করছে। তার পর খাওয়া। লতা তখন স্নান সেরে মহাবীরের সঙ্গে ধর্মশালার মন্দিরে প্রসাদ আনতে যাবে। এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে সমস্ত দিন ধরে এই নিষ্ঠাশীল ও নিয়মিত কর্তব্যের সাধনা। প্রেরণা নেই, তবু যেন নিজের দমেই চলে। প্রসাদের মনও যেন ক্লিষ্ট যাত্রীর মত এই খাপছাড়া মুহূর্তগুলির চাকার ওপর দিয়ে ধৈর্য ধরে গড়িয়ে চলে যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়, গন্তব্য এসে পৌঁছে। তখনি শুধু লতাকে কাছে পাওয়া যায় আর চিনতে পারা যায়। তার আগে, এতক্ষণ সে বাংলো বাড়ির হাওয়া থেকে যেন উবে যায়।

বিক্রম চলে যায়, এবং যেতে না যেতে হয়তো লালবাবুর স্ত্রী এসে বিশ্ব-সংসারের কাহিনী নিয়ে বসেন। লালাবাবুর জামাইটির চাকরি নেই, মেয়েটা দুঃখে আছে। কাহিনী শুনে লতার মুখ ম্লান হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, দুঃখটা যেন লতার মনে বড় বেশি বেজেছে।

সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রসাদের কাছে আজ কেমন যেন গর্হিত মনে হয়। এত বড় একটা ফাঁকি সত্যের সাজ সেজে থাকবে, আলো-অন্ধকারের তফাত-টুকুও যে মিথ্যে হয়ে যায়।

রাখালবাবুর বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল—প্রসাদবাবু, লতাকে আজ বিকেলে একবার পাঠিয়ে দিও। আজ রাত্রে এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে ফিরবে। ইতি—মেসোমশাই।

চিঠি পড়ে অগ্রসর হয় প্রসাদ। দুশ্চিন্তার জাল আরও জটিল হয়ে ওঠে। কেমন যেন ভয় ভয়ও করে। এবং কি করবে ভেবে পায় না। ঘরের পর্দা সরিয়ে দিয়ে দেখতে পায়, বারান্দায় বসে মশলা বাছছে লতা।

আজকের সকালে লতার মনটাও কেমন অস্বস্তিতে ভরে আছে। মাঝে মাঝে অকারণে ভয়ও করছে। কিসের জন্য এবং কেন, লতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এ রকম কোন দিন হয়নি। নইলে তাকে গালাগালি দিয়ে সেরে যাবে, এমন কোন জমিদারের বেটা আজও সে দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের দিকেই চেয়ে লতা আশ্চর্য হয়, কালকের রাত্রির ঘটনা নিয়ে একটা ঝগড়া বিতণ্ডা করার মত উৎসাহও যেন সেখানে আর নেই।

লতার বুঝতে দেরি হয় না—এটা ভয় নয়, দুর্বলতা। কিন্তু দুর্বলতাই বা কেন?

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যেই লতার মন ধীরে ধীরে আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। তাড়িয়ে দেবে? দিক না, তাতে ক্ষতি কি? সেই মাড়োয়ারী বেনিয়াটা এখনও আছে, তু করে ডাকলেই চলে আসবে। কিন্তু যাবার আগে এই ভালমানুষের ছেলেকে এমন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, জীবনে যেন আর বেশ্যার সঙ্গে বেয়াদবি করার দুঃসাহস না হয়।

—লতা।

প্রসাদের ডাক শুনে লতার বুকটা তব আশঙ্কায় ছমছম করে উঠল। প্রসাদ এগিয়ে আসতেই লতা মাথা নীচু করে মশলা বেছে চলল, কোন উত্তর দিল না।

—রাখালবাবুর বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন! যাবে?

চোখ তুলে তাকাল লতা। আশঙ্কার ঝাপসা পর্দাটা সরে গেল। উত্তর দেয়—যাব।

—যাও, কিন্তু কোন রকম বেয়াড়াপনা যেন টের না পায়।

নাটকের সীন পাল্টে গেছে। নতুন দৃশ্যের আরম্ভ। যেমন অদ্ভুত

তেমনি জটিল। শুধু লতা নয়, প্রসাদও তার সংক্ষিপ্ত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহু মানুষের মেলামেশার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসাদের সন্ধ্যেগুলি বেশির ভাগ আভাদের বাড়িতেই কেটে যায়। লতা যায় রাখাল-বাবু, তারকবাবু ও হরিশবাবুর বাড়ি। তাছাড়া সুবেদার ও লালাজীর বাড়িও আছে। শুধু আজ পর্যন্ত আভাদের বাড়ি লতার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার দু'বার নেমন্তন্ন এসেছে। কিন্তু দুদিনই হঠাৎ কেন জানি লতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একদিন জ্বর আর একদিন মাথাধরা।

প্রসাদ খুশী হয়ে বলে—সত্যিই তোমার বাহাদুরি বলতে হবে। যেখানে যাই, সবারই মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরে না। কি চালই চেলেছ লতা!

উত্তরে লতা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—দেখো, বেশি বাড়িয়ে তুলো না যেন।

লতা—বাড়িয়ে তুললে তোমারই মান বাড়বে।

প্রসাদ হেসে ফেলে—সত্যিই কি যে কাণ্ড হচ্ছে! এক এক সময় যা ভয় করে আমার! যদি একবার ধরা পড়ে যাও লতা, কি ব্যাপার হবে বল তো?

লতা—আমার আর কি ছাই হবে? বনের পাখি বনে ফিরে যাব।

প্রসাদ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কি যেন ভাবে, তারপর অন্যমনস্কের মতই বলতে চলে যায়—হ্যাঁ, তোমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু....

আভা আরও দু'তিন দিন প্রসাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আভা কথা বলেছে লতার সঙ্গে, কিন্তু প্রথম দিনের সেই সহজ হৃদ্যতা তার মধ্যে আর ছিল না। পরিচয় যত পুরনো হয়েছে, ব্যবধান বেড়ে গেছে তত। লতাও ঠিক সহজভাবে মিশতে পারেনি। কথা বলেছে লতাও, কিন্তু তাল কেটে গেছে বার বার। লতা চা এনে আভার সামনে ধরেছে, আভা আপত্তি করেছে, কিন্তু সাধাসাধি করতে পারেনি লতা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

প্রসাদ আর লতা। যখন এরা দুজন শুধু থাকে, তখনই এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কথাবার্তা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে এসেছে। লতা বেড়িয়ে এসে দেখে প্রসাদ তখনও ফেরেনি। প্রসাদ বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখে—লতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ভদ্রলোকদের বাড়িতে মেয়েদের গল্পের আসরে লতার প্রসঙ্গ এক-একবার ওঠে। মাসীমা বলেন—মেয়েটা বড় শান্ত।

তারকবাবুর মেয়েরা, নিভা প্রভা ও মমতা একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে—লতাবৌদি বেচারা সত্যিই ভালমানুষ। আভা মিছিমিছি ওর নিন্দে করে।

মাসীমা গলার স্বর চড়িয়ে প্রশ্ন করেন—আভা কি বলেছে?

মমতা—লতাবৌদি নাকি লেখাপড়া জানে না। একেবারে গেঁয়ো, গাঁয়ের মেয়ে।

মাসীমা চটে উঠলেন—আভা নিজেকে কি মনে করে? ভয়ঙ্কর বিদুষী? মর ছুঁড়ি, বিয়ের ছ'মাস না যেতে স্বামী হারিয়েছিস, বিদ্যে নিয়ে ধেই ধেই করছিস। লজ্জাও করে না!

নিভা প্রভা হেসে ওঠে। আভার ওপর মাসীমার আক্রমণের একটা অর্থ হতে পারে, মাসীমাও গাঁয়ের মেয়ে।

লালাজীর স্ত্রী এসেছেন। লতা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে। বাইরের ঘরে গল্প করে প্রসাদ, আভার সঙ্গে।

প্রসাদ বেশ জোরে জোরে যেসব কথা বলে, শুনে আভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘন ঘন দরজার দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে ভৎর্সনার সুরে বলে—আপনার কোন ভয়-ডর নেই, প্রসাদবাবু।

একটু পরেই দেখা যায়, আভা ও প্রসাদ বেড়াতে বার হয়ে যাচ্ছে। লালাজীর স্ত্রী বোকার মত লতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—ও ছোক্‌রি কে লতা? ওর চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি একটু কড়া হও, লতা।

লতা বলে—আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে, আমার স্বামীও ঠিক থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

লালাজীর স্ত্রী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন—তা বটে।

কিন্তু লতার নিজের কথার প্রতিধ্বনি তার অন্তরের ভেতরে প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত বেজে ওঠে। হেসে ফেলে লতা।

প্রভার স্বামী এসেছে প্রভাকে নিয়ে যেতে। তারকবাবুর বাড়ি তাই আজ লতা ও প্রসাদের নেমন্তন্ন ছিল। সব মেয়েদের মত লতাও জামাইয়ের সঙ্গে গান গল্প ও ঠাট্টা নিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসল। বিদায় নেবার সময় প্রসাদ দেখতে পায়, প্রভার স্বামী লতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। প্রসাদের সারা মনটা একটা অপঘাতে যেন ছিঁড়ে পড়ল।

পথে আসতে লতাকে গম্ভীরভাবে প্রসাদ বলে—সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

লতা উত্তর দেয় না।

প্রসাদ বলে—এই পাপ আমায় লাগছে। তোমার কিছু হবে না।

প্রসাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে খুশী হতে পারত লতা। সব পাপ প্রসাদের জীবনের অভিশাপ বড় করে তুলুক, লতা তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছিল না লতার। তাই লতার বুকের ভেতরটাও শিউরে উঠেছিল সংশয়ে।

প্রসাদের অনুমান সত্য হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরীহ নির্দোষ মানুষের হৃদয়ের প্রীতিকে এত বড় ফাকি দেওয়া পাপ বৈকি। সে পাপের ভাগী কি সে নিজেও নয়? কিন্তু কোন্ স্বার্থের খাতিরে? প্রসাদের মানের জন্য।

লতা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েও হেসে ওঠে। আরও বেশি করে হাসি পায়, প্রসাদের ভাগ্যবিপাক দেখে।

ঘরে ফিরে প্রসাদ আবার কথা পাড়ল। কথার খাপছাড়া ভঙ্গিতে বোঝা যায়, অনেক কিছু সে বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না, সে সাহস তার নেই।

প্রসাদ বলে—আজকাল দেখছি ঘরের ভেতরেও তুমি বড় শুদ্ধাচার চালিয়েছ। এখানে তো তোমাকে কেউ দেখতে আসে না। তবে এখানেও কনে বউটি সেজে থাক কেন।

লতা—কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

প্রসাদ—আমি না ডাকলে তোমার তাতে কি আসে যায়? দরকার থাকলেই ডাকব। কিন্তু তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে কেন? তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। তোমার এত কষ্ট করার দরকার নেই।

লতা—তোমাকেও কোন উপদেশ দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনি থাকব।

লতার এই উদ্ধত উক্তি প্রসাদকে অপমান করল ঠিকই, কিন্তু তার বিভ্রান্ত ও অসহায় চিত্তের অলিগলি ঢুঁড়ে সে এমন কোন মুক্ত আশ্রয় পেল না, যেখানে এসে লতাকে উপেক্ষা করা যায়। তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটা যেন লতা হাত করে ফেলেছে।

লতা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছে। আভার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলে। তার একটা মেকী আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয় হোক, তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবী সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব বাধা ছাপিয়ে গেছে।

এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না। বাহির যার এত বিচিত্র, অন্তর শূন্য থাকলে ক্ষতি কি। লতার দিনগুলি এই আশ্বাসে ভরে উঠেছিল। চোরাবালির উপর কত বড় দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও লতার সংসার তার প্রমাণ।

আভার জ্বরের খবর শুনে প্রসাদ সেই যে সকালবেলা বের হয়েছিল, ফিরে এল এই সন্ধ্যায়। আভার জ্বরের সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার মত আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে, শুধু অকারণ কান্না। রণজিৎ বলেছে, আভার জ্বর আগেও হয়েছে, কিন্তু এসব উপসর্গ কখনও ছিল না।

লতাও সবেমাত্র বেড়িয়ে ফিরেছে।

প্রসাদ ঘরের ভেতর চিন্তিতভাবে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একটা কৌতুক যেন বিভীষিকা হয়ে চারদিক থেকে তাকে চেপে ধরেছে।

অনেকদিন পরে প্রসাদ আজ আবার কথা বললো—তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ, লতা। অভার নামে নিন্দে রটাবার সাহস পেলে কোথায়।

লতা—নিন্দে? আমি আভার নামে কোথাও তো কিছু বলিনি।

প্রসাদ—সেটাও একরকমের নিন্দে ও অপমান করাই হল।

প্রসাদের কথাগুলির মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। মেজাজও আগের মত দপ করে জ্বলে ওঠে না। বিচারকের রায়ের মত অবিচল সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ণ ও শান্ত।

লতা—বল, কি করব।

প্রসাদ—না তোমাকে দিয়ে আর বেশি নাটুকে খেলা করতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভাল ভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ, চিরকালই তো এমনি ভাবে চলতে পারে না, তাতে তোমারই বা লাভ কি?

চুপ করে শুনতে থাকে লতা।

প্রসাদ যেন আরও একটু শক্ত হয়ে উঠল—তারপর, আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তুমি কি বস্তু? তাহলে আমি কোথায় থাকি? তুমি আমার মানমর্যাদার চাবিকাঠি আগলে বসে থাকবে, তা হয় না। তোমাকে ভয় করে চলতে হবে, তোমার মেজাজ মরজির জন্য সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, এ হয় না।

লতা টেবিল ল্যাম্পটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। কথা বলতে সেও জানে, কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন করার মত যুক্তি তার নেই, তার সে শিক্ষা দীক্ষা নেই। সে প্রয়োজনও হয়নি।

প্রসাদ বলে—তোমার চলে যাওয়া উচিত।

লতার শরীর পাথরের মত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল।

—তোমার যা পাওনা হয়েছে, সব মিটিয়ে দিচ্ছি, আরও কিছু দেব।

লতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু, তারপর আমার চলবে কি করে?

প্রসাদ এইবার মেজাজ হারাল—সেটা কি আমার ভাবনা? ভুলে গিয়েছ, এখানে এসে প্রথম দিন তোমায় রাঁধতে হয়েছিল বলে কি কাণ্ড করেছিলে? বাক্সপেটরা নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে। কত সাধতে হয়েছিল মনে আছে? তোমার মত একটা···।

প্রসাদের কথার মধ্যে এক তিল মিথ্যা নেই। প্রতিবাদের কোন অবকাশ নেই। নিছক নিরেট সব সত্য কথা। কাহিনী নয়, ঘটনায় গড়া ইতিহাস।

প্রসাদ তখুনি আবার শান্ত হয়—তুমি যেজন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচি আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছ।

প্রসাদের গলার স্বর আরও নরম হয়ে এল—সত্যিই, আমি এভাবে টিঁকতে পারছি না, লতা। তোমার বোঝা উচিত।

এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মত, নিঃসহায়ের আবেদনের মত শোনায় কথাগুলি।

লতা বলে—সত্যি বলছ, আমায় যেতে হবে?

প্রসাদ—হ্যাঁ। শুধু ভাবছি, কার সঙ্গে যাবে।

লতা উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে—তার জন্য ভাবতে হবে না।

আমি একাই যাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিও কিছু, মামা-কাকা কেউ এসে নিয়ে গেছে। কাল ভোরেই যাচ্ছি।

প্রসাদের সম্মুখ থেকে লতা সবেগে ছুটে অন্য ঘরে চলে যায়।

মাত্র আজ রাত্রিটা। জেগে থাকলেও কেটে যাবে, ঘুমিয়ে পড়লেও কাটবে। তবু খুব ভোরেই উঠতে হবে, বিক্রম আসবাব আগেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে যেতে হবে।

ভেতরের বারান্দায় অন্ধকারে মেজের ওপর নিঝুম হয়ে বসেছিল লতা। উঠোনে তখনো থালায় সাজানো ডালের বড়িগুলি হিমে ভিজছে। আচারের বয়ম দুটো রয়েছে। এখনো উঠিয়ে রাখা হয়নি। আর প্রয়োজন নেই।

লতা একবার নিজের মনে হেসে ফেলে। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে। যদি কেউ টের পেয়ে যায়, এই ভয়। আজ যদি মাসীমা বুঝতে পারেন, তারকবাবু হরিশবাবু শুনতে পান যে, আমি লতা নই, আমি তারকেশ্বরের পক্ষীবিবি? আমিই যদি ফাঁস করে দিই? তাহলে ভদ্রলোকের জমকালো সম্মান কোথায় থাকে?

কিন্তু সে যে অসম্ভব। ওভাবে প্রতিশোধ নেওযা যায় না। বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে লতার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল।

আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু, মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মত শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন। সব পাপ আমার লাগুক। মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসীমার বেরিবেরি সেরে যাক।

বুঝতে পারে এবং স্পষ্টভাবে কল্পনা করে নিতে পারে লতা, ভদ্রলোকের ছেলে প্রসাদের ভদ্র প্রেমের আবেগ কোন্ পথে মুক্তি খুঁজছে। এক বছর দু'বছর পরে এ বাড়ির ভবিষ্যতে এই রকমই একটি রাত্রি লুকানো আছে। তখন লোকে শুধু জানবে, লতা মরে গেছে। বিধবা আভার মাথায় নতুন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে, এই বাড়ির ঘরে ঘরে আভার সংসারপনার চুড়ি শাঁখা বাজার ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ করে।

উনি কি করছেন? ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। বোধ হয় বই পড়ছেন।

বোধ হয় মতিগতি ফিরে গেছে। কিন্তু একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে বেণী দুলিয়ে, চোখে সুর্মা লেপে, এক পাত্র হুইস্কি

নিয়ে বহি কোলের উপর চড়ে বসি, চন্দ্রিত্তিরওয়ালার মুখোদটা দেখি একবার ; কিন্তু ছিঃ !

তা করতে পারলেও যে ভাল ছিল। কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না, কারণ লোকটাকে কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে আজ। জীবনে কোন লুচ্ছাকে ছোবার আগে এত ঘৃণা হয়নি কখনো। তবে, কড়া এক পেয়ালা মদ গিলে নিলে বোধ হয় এ ঘেন্না ভেঙে যাবে। কিন্তু মদ ? গেরস্থের বাড়িতে মদ ? মনে হতেই লতার বুকটা দুরদুর করে ওঠে।

সব সামর্থ্য যেন খসে প'ড়ে গেছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে লতা, শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে। ঘোমটা আর সিঁদুর, শাখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই ছদ্ম মূর্তিটার ওপর বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে। ভাঙতে পারে না এই মূর্তিকে, ভাঙবার চেষ্টাও করতে পারে না, বোধ হয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না। কোন উপায় নেই।

চোখ দুটো একবার আঁচেল দিয়ে মুছে নিল লতা। যাত্রাগানের পালায় রানীগুলো বনবাসে যাবার আগে বোধহয় এই রকম কাঁদে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে। কিন্তু ঐ লোকটার ওপর যে প্রতিশোধ না নিয়ে যাওয়া যায় না। নিস্তব্ধ রাত্রির শূন্যতার মধ্যে একটি প্রতিশোধের মুহূর্তকে শুধু মনে মনে জপতে থাকে লতা।

না, উঁচুদরের প্রেমের ঐ অহংকারের ওপর পক্ষীবিবির ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিয়ে। ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ রায় শুধু অপমানের যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে ; লোকের কানের ভয়ে জোর গলা করে একটা কথাও বলতে পারবে না। বেশ হবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা।

ঘরের ভেতর হঠাৎ পড়া বন্ধ করে প্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোন না কোনদিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন হঠাৎ এই ধরনের একটা শঙ্কায় ভরে উঠল। রাগানো উচিত নয়, বেশ খুশী করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত।

একতাড়া নোট দেরাজ থেকে বের করে প্রসাদ লতার কাছে একটা আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

—এই নাও। আমার ওপর মনে কোন রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি।

লতা হাত পেতে নোটগুলি নেয়। চুপ করে বসে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—কি চুপ করে রইলে যে?

মুখ তুলে তাকায় লতা। প্রসাদের হাতের লণ্ঠনের আলো লতার চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রখর হয়ে জ্বলছে তার চোখের তারা; যেন বিবরের অন্ধকার থেকে ফণা তুলে এক বিষধরী তার জীবনশত্রু একটা জীবের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভয় পেয়ে কম্পিতস্বরে প্রসাদ ডাকে—লতা!

বোধ হয় আলোর ধাঁধাঁনি থেকে দৃষ্টি আড়াল করার জন্যই হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড করে টেনে নিল লতা। আর, কী আশ্চর্য, সত্যিই যেন এক লাঞ্ছিতা গৃহবধূ; ভীরু অভিমানের এক করুণ মূর্তি; আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে লতা বলে—না, তুমি ক্ষতি করনি; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়ল।

॥ জতুগৃহ ॥

নিশাচর | ভবানী মুখোপাধ্যায়

মেঘলা আকাশে কিন্তু একফালি চাঁদ ছিল, মাঝে মাঝে এক পশলা করে বৃষ্টি হয়েছে, তাই হাওয়াটা ঠাণ্ডা, পীচ ঢালা রাস্তায় পথের আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে। রাত নিশুতি, সামনের গির্জার ঘড়ির ওপর চাঁদের আলো পড়েছে, দেখা যাচ্ছে পৌনে একটা। শহরের সমস্ত জনতা যেন কোন যাদু প্রভাবে কোথায় মিলিয়ে গেছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের এই নাচ-গান-হল্লা মুখরিত পাড়াও নীরব হয়ে এসেছে। 'কাফে মনটিকারলো' থেকে এই-মাত্র যে দুটি প্রাণী বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়েছে তারাই যেন এই গ্রহের একমাত্র বাসিন্দা।

রাত্রির এই শান্তিময় মুহূর্তে যার আশ্রয় আছে সে বিশ্রাম করছে সুখ শয্যায়, যে আশ্রয়হীন সেও ফুটপাতের একপাশে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। জেগে আছে পাহারাওলা, এমনই দু চারজন নিশাচর-প্রাণী, আর মনটিকারলোর মালিক কর্তার সিং টাকাকড়ি হিসেব করে লোহার সিন্দুকে চাবি দিচ্ছেন। তার সহকারীবৃন্দ হাই তুলছে আর চাকরগুলো সেই রাতেই বালতি বালতি জল ঢেলে ধুয়ে মুছে ঘর দোর পরিষ্কার করছে।

সরলার মনে হল একটা যেন পাহারাওলা ওদিককার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড লোভ হল তার কানে কানে দৌড়ে গিয়ে বলে আসে যে

অমূল্য সংবাদ সে জানে। লোকটি কিন্তু সহজ নয়। একটা ট্যাকসি যোগাড় করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়েছে সরলাকে। তারপর বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সারা দেহ জরীপ করতে শুরু করেছে। আতংকে কুঁকড়ে আছে সরলা।

সহসা লোকটি প্রশ্ন করে—কোথায় থাক তুমি? বাসা কোথায়?

সরলা মনে মনে ভাবে এই প্রশ্ন কি একান্ত অকারণ—না সবলার মনোভাব বুঝে নিয়েছে। সারা শরীর কাঁপছে সরলার, মনটিকারলোর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় এমনই কাঁপুনি ধরেছিল সারা অঙ্গে। লোকটা এই প্রশ্ন করছে কেন, সমানে দেড ঘণ্টা ধরে লোকটা হল্লা করেছে, তবু সরলা গোডা থেকেই বুঝেছে আসলে একটুও নেশা হয়নি লোকটার। এ একেবারে নিছক অভিনয়। জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে টনটনে।

অতি ক্ষীণ গলায় সরলা জবাব দেয়, বিডন স্ট্রীটের কাছে, আপনি কি মিনার্ভা থিয়েটার জানেন, সেইখানটায়।

—একটু জানি বৈকি। জানি সব।

সরলা আবার ভাবনায় পডল, তাহলে যা মনে মনে ফন্দি করেছিল তা আর হবে না, এদিক সেদিক ঘুরিয়ে থানার সামনে গিযে পডবে এই রকম ভেবেছিল, কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যাবে না।

—তুমি নিশ্চয়ই একা থাক? না আব কেউ আছে?

নার্ভাস ভঙ্গীতে হেসে উঠে সরলা বলে—একাই থাকি, কে আবার থাকবে?

কোথাও এতটুকু দরজা খোলা নেই, এমন কি বৃষ্টির জন্য সব বাড়ির জানালাগুলোও বন্ধ। ফুটপাত থেকে বড বড বাডিগুলোর কোথাও এতটুকু প্রাণেব পরিচয় নেই। সেই চিরপরিচিত পথ, প্রতি রাতেই সে এই পথেই যায়, কখনো রিক্সায়, কখনো ট্যাকসিতে, কোনদিন সঙ্গে কেউ থাকে, কোনদিন কেউ থাকে না। কোথাও লালপাগডির চিহ্নও নেই, সরলা জানত থাকবে না, ওরা পানবিডিব দোকানে বসে ঢোলে। প্রতিদিনই ফেরার পথে সে অস্বস্তি বোধ করে, কিন্তু আজ ··

লোকটা ভীষণ অসভ্য, কিঞ্চিৎ বর্বর। কথাবার্তা কাটা কাটা—ভালোই করেছে সরলা ওকে ভাঁওতা না দিযে, এই সব পথ ঘাট ওর বেশ জানা। ট্যাক্‌সি থেকে নেমে ঠিক গলিতেই নিজে থেকে এগিয়ে চলল।

সিগ্রেটটা মুখ থেকে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—কি হল তোমার ?

সরলা কিছুতেই তার কাঁপুনি দমন করতে পারছে না। তার সারা শরীর কেমন কাঁপছে। সে মৃদু গলায় শুধু বলে—বৃষ্টি হয়েছে কিনা গা-টা শির্ শির্ করছে।

এই কাঁপুনির এই একমাত্র জবাব, এ ছাড়া কি আর বলবে সে। তিনতলা প্রাচীন বাড়িটার সামনে দাঁড়াল সরলা। এ পাড়ার ঘর দোর সদা উন্মুক্ত। কম্পিত হস্তে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ঘরের চাবিটা বার করে নেয় সরলা।

লোকটা মনটিকারলোয় ঢুকতেই কর্তার সিং দাঁড়ি চুমরে ইঙ্গিত করেছিল সরলাকে, অর্থাৎ—একটা শাঁসালো খদ্দের জুটেছে।

কর্তার সিং অনেকদিন এই কারবার করছে, কাজেই এই কথা মনে হওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। লোকটা এসেই আগে কর্তার সিং-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে পাশের টুলটায় পা তুলে দাঁড়াল, তারপর সিগ্রেট ধরানোর সময় সেই প্রায় শূন্য কামরার চারদিকে এক নজরে দেখে নিল। তারপর বেশ চীৎকার করে বলল—এক বোতল থ্রি একস্ বোজা রম। সর্দারজী তুমিও চলে এসো, সবাই মিলে আনন্দ করা যাক্।

সরলাকে ও দেখেছে হোটেলে ঢুকেই, সরলা বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছিল মুখে এক ছোপ পাউডার লাগিয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটা গুছিয়ে নিচ্ছিল।

কৃপাল সিং বোতল নিয়ে এসে খুলতে যাচ্ছিল, লোকটি বলল—আহা। ওভাবে নয়ঃ আমি দেখিয়ে দিই, রমের বোতল খোলা সহজ নয়।

তারপর সরলাকে ডেকেছে, কর্তার সিং-এর ইঙ্গিতে সরলাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে, সে প্রায় দুঘণ্টা হল। তবু এখন নিজের ঘরের দরজা খুলতে সরলার মনে হচ্ছে এ সব যেন বহু যুগের ঘটনা।

'মনটিকারলো' আজ একদম শান্ত ছিল। কর্তার সিং টাই খুলে ফেলে জামাটাও খোলার উদ্যোগ করছিল, নতুন খদ্দের আসায় তা আর হল না, চেলো, ড্রাম ইত্যাদির নিয়মিত বাদক গোমেস, স্মিথ আর ব্রাউন—অনেক আগেই গুডনাইট বলে সরে পড়েছে। আর ক্লার্ক রামবাবু বার বার টাক মাথায় হাত বুলাচ্ছেন, হয়তো হিসাব মিলছে না।

সরলাকে লোকটি প্রশ্ন করল তুমি কি খাবে? রাম চলবে না আরকিছু?

সরলা বলেছিল—ব্রাণ্ডি!

—হা-হাঃ ব্রাণ্ডি! আমি সব মিঞাকেই চিনি, ব্রাণ্ডি বলে রঙিন জল দেবে আর আমি গাঁটের কড়ি খরচা করব, সে হবে না, বরং এই রোজা রাম—একেবারে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। নয়ত—একটা বিয়ার টান! নয়ত কিছুই নয়—'

আবার কর্তার সিং ইঙ্গিত করে। তার অর্থ, যা বলে তাই কর। লোকটি কাপ্তেন।

লোকটি ঠিকই বলেছে—সব মিঞাই সমান। সরলা বীয়ারই নেবে। লোকটি বলল—জায়গা বেড়ে। বেশ করেছে। আবার দেয়ালে ছবিও এঁকেছে। পয়সা লোটবার তাল জানে এরা—কোণের টেবিলেব ও বুড়ো দামড়া দুটো কে?

—খদ্দের?

—খদ্দের? ঠিক তো? না পোষা গুণ্ডা। এরা তাও বাখে।

লোকটা এমন ভঙ্গীতে কথা বলে যে সরলা না হেসে থাকতে পাবে না, এমন এক বিচিত্র মুখ ভঙ্গী করল, পাকা লোক।

লোকটি হঠাৎ বলল—কি নাম তোমার?

—সরলা। লজ্জিত ভঙ্গীতে উচ্চারণ কবে সরলা।

—বা, বেড়ে নাম। সরলা, অবলা, কুলবালা। হিয়াব ইজ্‌ লাক্‌।

তারপর, তারপর আর কি। সরলা যেন অচেতন পদার্থ। সর্বজনসমক্ষে তার আদর-আপ্যায়ণ শুরু হল। আতিশয্যের আধিক্যে সরলাও বিব্রত। কোণের টেবিলের লোক দুটোও সব ছেড়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। লোকটা অদ্ভুত। কেমন যেন 'সমাজ-সংসাব মিছে সব' গোছের ভাব।

সহসা লোকটি প্রশ্ন করে—ওরা কি করে?

সরলা সব জানে। প্রশ্ন করা অন্যায় হয়নি। ওই চশমা চোখে লোকটি প্রফেসার, ওর নাম রায়চৌধুরী। রোজ আসে, আব সঙ্গের লোকটার কাটা কাপড়ের কারবার। সারা সন্ধ্যাটা এখানেই কাটায়!

—অর্থাৎ ফ্রেণ্ড! যাকে বলে গ্লাস ফ্রেণ্ড।

অট্টহাস্য করে ওঠে লোকটি। নিজের রসিকতাতেই এত হাসি। তারপর সহসা বলে—ওঠ। চল এইবার যাওয়া যাক।

—এখন নয়।

—কেন?

—টাইম হয়নি। একটা পর্যন্ত ডিউটি, এখন সবে বারোটা।

কয়েক মিনিট পরে টেবিল ছেড়ে কাউণ্টারের পাশে টানা লম্বা সোফাটায় দুজনে বসল।

সরলা চুপি চুপি বলে—রায়চৌধুরী দেখছে। সাবধান।

লোকটি হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে—কি করব, ওর চশমাটা কেড়ে নেব?

হয়তো তাই করত, কিন্তু গ্লাসটা তখনও ভর্তি, তাই এক চুমুকে শেষ করে আবার ঢালে, তখনকার মত কথাটা ভুলে গেল হয়তো। গ্লাসের পর গ্লাস ওড়াচ্ছে, কিন্তু এতটুকু বিকৃতি নেই। লোকটির বয়স অনেক কম ত্রিশ কিংবা বত্রিশ—মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবছে।

সরলা সাহস করে বলে—কি ভাবছেন এত?

—কিছু না, তুমি বরং একটু কাছে সরে এস।

সরলা ভারী ভয় পেয়েছে, লোকটির ভাবগতিক দেখে ভয় করারই কথা। তার হুকুম না মেনে যেন চলে না।

লোকটি আবার বলে—দেখ সরলা, এই লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় আমি হাঁফিয়ে উঠছি। চল ওঠা যাক।

—কিন্তু আমার যে ওঠার উপায় নেই। হুকুম না নিয়ে নড়বার উপায় নেই।

—হুকুমটা কখন পাওয়া যায়?

—একটার পর, হোটেল খালি হলে।

—তোমার মনিবকে না হয় বলো।

—রাজী হবে না।

—আচ্ছা। আমিই দেখছি।

উঠে পড়ল লোকটা, এখন বেশ পা টলছে, রায়চৌধুরীদের টেবিলের সামনে একটু থমকে দাড়াল, যেন কি একটা আশ্চর্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছে। তারপর বিচিত্র এক ভঙ্গী করে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল। কর্তার সিংকে কি বলল। কর্তার সিং দাড়ি এবং ঘাড় দুই নাড়ছে। অবশেষে লোকটি পকেট থেকে একটি নোট বার করে কর্তার সিং-এর হাতে গুঁজে দেয়।

এই সর্বপ্রথম সরলা লক্ষ্য করল লোকটির গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেন দীর্ঘদিন রেলেই কেটেছে।

—চল—তোমার ছুটি করে নিয়ে এলাম।

—কি বলল কর্তার সিং?

—বলবে আবার কি! আমি জানি কিসে কাজ হয়, টাকায় কি না হয়? বললাম, আমি আর ঘণ্টাখানেক থাকলে বড়জোর দশ টাকার মদ খাব, এই নাও টাকা, টাকা আর মদ দুই বাঁচল।

কাউণ্টারের পাশ থেকে কর্তার সিং আবার সরলাকে ইঙ্গিত করে। তার অর্থ ওর সঙ্গেই যাও।

সরলা সরলভাবে প্রশ্ন করেছিল—আপনি কোথায় থাকেন?

এত অল্প বয়সে হাতে এত টাকা, অতি স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহ হয়েছিল সরলার।

সরলার প্রশ্নে লোকটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেছিল—কেন তোমার বাসায় থাকা যাবে না?

সরলা মধুর ভঙ্গীতে হেসে বলেছিল—যাবে না কেন? তবে আপনি কি থাকতে পারবেন, গরীবের ঘর।

—খুব পারব, তুমি এস তো।

—আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে আসি।

প্রথমে যা ছিল অস্পষ্ট অস্বস্তি পরে তা আরো বেড়ে গেল, খুবই আশ্চর্য! কিন্তু কেন এই ভয়? কিসের আতংক?

আর একটু পরেই এমন ভীষণ শঙ্কিত হল সরলা, মনে হল যেন সে এখনই মরে পড়ে যাবে। নিঃশ্বাস টানতেও পারছে না।

—ব্যাপার কি? আবার থমকে দাঁড়ালে যে?

এই প্রশ্নে আরও ভয়, লোকটিকে জানতে দেওয়া উচিত নয় যে সে ভয় পেয়েছে। সে অতি কষ্টে বলল—না, কিছু নয়, পাটা কেমন ধরে গেছে, অনেকক্ষণ একভাবে বসেছিলাম কি না।

এতক্ষণে সে স্পষ্ট বুঝেছে, ঐ বাঁ হাতের দুটো আঙুলই নেই, বুড়ো আঙুল আর তার পাশেরটা—তাহলে এই সেই দুর্দান্ত গোকুল গুণ্ডা! পুলিস যাকে চারদিকে খুঁজছে, আজই একটু আগে সে হোটেলের টুলে বসে

বাংলা দৈনিকে রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়েছে। স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন—'আশ্চর্য। এই কলকাতা শহরেই গোকুল সুবোধ বালকের মত লুকিয়ে আছে, আমাদের ধুরন্ধর পুলিস বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে—কি বিচিত্র এই দেশ।'

ব্যাগটা যেন ইচ্ছে করেই মাটিতে ফেলল সরলা। লোকটি যখন তুলে দিল, তখন নেওয়ার সময় এক রকম জোর করেই তার হাতটা ভালো করে স্পর্শ করল সরলা। এই সেই। সে ঠিক ধরেছে। পর পর দুটো আঙুলই নেই।

আশ্চর্য। এই গভীর নিশুতি রাত। শহরের সব দরজা বন্ধ, সঙ্গে এই বিচিত্র মানুষটি।

পাশের লোকটিই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠের রহস্যজনক খুনের নায়ক—এর জন্যই পুলিস সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে। আরো কত কি করেছে কে জানে। কদিন ধরে কত গাড়ি থামিয়ে পুলিস আরোহীকে ভালো করে দেখেছে, হাওড়া-শিয়ালদহ দমদম এয়ারপোর্ট সর্বত্র পুলিস এই লোকটির ওপরই নজর রেখেছে। কখনও গোকুল গুণ্ডা কখনও মহীউদ্দীন, আসল নামটাও ঠিক মত কেউ জানে না। কাগজে কাগজে ফিরিস্তি বেরিয়েছে। আকৃতি ও প্রকৃতির সুদীর্ঘ ইতিহাস। পুলিস সন্দেহ করে বালিগঞ্জের সরকারী কোয়ার্টারে দিন দুপুরে পর পর যে ডাট রাহাজানি ঘটছে তা এই আঙুল-বিহীন নৃশংস হত্যাকারীর কীর্তি। তাই পুলিস বন্ধজোড়া ফাঁদ পেতেছে কিন্তু আসামী ফেরার।

সেই গোকুল এখন নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে সরলার বলিষ্ঠ সহযাত্রী।

গোরাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের আলো আঁধারি সিঁড়ির দোতালা। পার হয়ে গোকুল সুর করে বলে ওঠে—আর কতদূরে সুন্দরী?

সরলা ভাল ভাবেই বলে—এইবারেই আমার ঘর। সিঁড়ির সামনেই।

মনে মনে ভাবে—একবার চেঁচাবে নাকি। কিন্তু চেঁচালে কি হবে? পাশের ঘরে থাকেন দাশরথিবাবু। তিনি সরলাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। বাড়িউলীর কাছে অনেকবার ওর নামে নালিশ করেছেন। সাড়া পাওয়া যাবে না।

লোকটি ঘরে ঢুকেই বুশ শার্টটা খুলল, কাঁধ-কাটা গেঞ্জিটা বেশ ময়লা। দু তিনদিন সমানে পরে আছে। হয়তো সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রাত্তির থেকেই, কে জানে!

সরলা পড়েছে, পুলিস বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছে আসামীর বাঁ হাতের ছুটো আঙুল নেই, কপালের ডান দিকে একটা গভীর কাটা দাগ।

এতক্ষণে মনটিকারলোর দরজা বন্ধ করে সবাই চলে গেছে। কর্তার সিং তালাগুলো টেনে টেনে দেখেছে। তারপর বাড়ি ফিরে গেছে। রায়চৌধুরী আর কাটা কাপড়ের কারবারী আজ একটু সকাল সকাল উঠেছে বলতে হবে।

যখন রাত্রি প্রভাত হল, তখনও গোরাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের তেত্রিশ নম্বরের বাড়ির তিনতলার ঘরে আলো জ্বলছে দেখা গেল। কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তায় জল দিচ্ছে, ময়লা সাফ করছে।

সরলা ঘুমিয়েছিল কি? সারারাত চোখের পাতা বুজিয়ে পড়েছিল, হয়তো আধো জাগরণে আধো ঘুমে আকাশ পাতাল ভেবেছে। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে দেখে গোকুল গুণ্ডা তার বালিশের কাছ ঘেঁষে অচৈতন্যের মত ঘুমুচ্ছে, মুখটা কিঞ্চিৎ খোলা।

অতি সন্তর্পণে ওঠার চেষ্টা করে সরলা, প্রথমে এক পা—তারপর আর একটা—

বেলা হয়েছে, নীচে রাস্তায় মানুষজন চলাচল করছে, গলির মোড়ে রাস্তার কলে বালতি বসানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আরেক দিনের শুরু—উজ্জ্বল রঙিন দিন। সরলার কাছে কোন মূল্য নেই এদিনের, অর্থহীন, আনন্দহীন ছায়াঘেরা দিন। পাশে এই বিরাট দুঃস্বপ্ন।

সরলা তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে নেয়, মাথার চুলগুলো ঠিক করে নেয়, তারপর বিছানার দিকে তাকায়, লোকটি তেমনই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দরজা খুলে বেরোবার চেষ্টা করে আবার থমকে দাঁড়ায়, মনে হয় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে সরলা। একরকম দৌড়াচ্ছে। পথে বেরিয়েও তার সেই গতিবেগ থামে না। একেবারে জনতার মধ্যে পৌঁছে তার চাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ কমে।

থানা কোন্ দিকে তা জানে সরলা। একদিন রাতে 'মনটিকারলো' থেকে ফেরার পথে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাহারাওলা। এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছে সরলা যে ভেতরে সায়া পরতে ভুলে গেছে, এখন পাতলা কাপড়ে বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

কি বলবে থানায় গিয়ে? গোকুল গুণ্ডা! আমার ঘরে শুয়ে আছে!

কিংবা কর্তার সিং-এর সঙ্গে দেখা করবে? 'মনটিকারলোর' কাজ পাওয়ার পর মাঝে মাঝে দু চারজনকে এমনভাবে ঘরে নিয়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু এমন একটা বিপদের মুখোমুখি হয়নি সরলা কোনদিন। 'মনটি-কারলোর' এই গোকুলকে দুর্দান্ত বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সরলার এই জীর্ণ শয্যায় যেন সে শিশু, এ কি সরলার স্পর্শের প্রভাব! বার বার মিনতি ভরে সরলাকে বলেছে—

না-না, ঘুমিও না, সরলা, চোখ খুললেই দেখবে আবার দিন। যতক্ষণ না ঘুমবে ততই ভালো, এই জেগে থাকাটাও তো ঘুমের মত, স্বপ্নের মত।

তারপর হঠাৎ নাক ডাকতে শুরু করেছে, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাল করে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে, মাথার বালিশটা ঠিক করে।

সহসা কার সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই চমকে উঠল সরলা, একেবারে থানার সামনে এসে পৌছেছে। সরলার সহসা মনে হয়—এখন যদি উঠে পড়ে লোকটি, তাহলে? কি মনে করবে?

থানার ভেতরে ঢুকতে পারল না সরলা। আবার বাড়ির পথেই ফিরল।

—লোকটার এতক্ষণে পালানো উচিত। হয়তো পালিয়েছে। কে জানে। গলির মোড়ে পানওলার দোকান থেকে একটা পাউরুটি ধারে কিনল সরলা, আর এক প্যাকেট সিগারেট।

কি আশ্চর্য। ওকে সরলা বলেছিল—আপনি কোথায় থাকেন? কোথাও নাকি থাকতে পারে। আচ্ছা রোজ রাত্তির কি এমনই কাটায়—আজ এ বিছানায় কাল ও বিছানায়? কে জানে!

ভাবতেও খারাপ লাগে। সারা শরীরটা শির শির করছে।

সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে ওঠে সরলা। সেই পরিচিত সিঁড়ি।

ফিরে আসাটা বোধ হয় ঠিক হল না। পাশের ঘর থেকে দাশরথিবাবু দরজাটা ফাঁক করে কি দেখছিলেন, সরলাকে দেখেই—দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে দরজা বন্ধ করলেন। তবু যদি নিজের একটা ডেরা থাকত। থাকিস তো তেত্রিশ নম্বর গোরাচাঁদে তার আবার এত ছুঁচিবাই!

ঘরে ঢুকে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে সরলা। স্বাভাবিক ছাড়া আর কি, নইলে কি সে পাঁউরুটি আর সিগারেট কিনে আনতে পারে?

বেশ কষ্ট করে মুখে হাসি টেনে সরলা বলে—এই যে উঠেছেন! কথা ক'টি বলেই হাঁফায়।

শুধু ওঠা নয়, পোশাক-টোশাক পরা হয়ে গেছে, একেবারে রেডি। সরলা কৈফিয়ত-দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে দু চারটে জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম, রুটি নেই, সিগারেট নেই। ভাঁড়ার একেবারে শূন্য।

লোকটি ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন। একটা সিগারেট ধরিয়েছে বটে, তবে মুখ দেখে বোঝা যায় যে সেটা শুধু অভ্যাস বলেই ধরিয়েছে, টেনে আনন্দ নেই।

কি করবে সরলা, ভেতরে ঢুকে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়াবে? কিন্তু যদি চেপে ধরে, গলা টিপে দেয়—তারপর? অথচ এভাবে দোরগোড়ায় বসে থাকাও যায় না।

সরলা সহসা প্রশ্ন করে—কি হয়েছে? হঠাৎ কি হল।

—কেন?

—কি জানি, কেমন যেন লাগছে!

সরলা বুঝল না যদি কিছু অদ্ভুত হয় সে তার নিজেরই অদ্ভুত আচরণ, যেভাবে তাকিয়ে আছে—সেই দৃষ্টিভঙ্গীটাই বিচিত্র।

—তুমি অনেকক্ষণ তো বেরিয়েছ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? লোকটি প্রশ্ন করে।

জবাব দিল সরলা অতি তাড়াতাড়ি, প্রায় তোতলার মত, নিজেই বুঝল সেটা। বলল—দোকানে ভারী ভিড়, তারপর একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা, সাত-সতেরো—সুরবালাকে বিয়ে করেছে শুনছি—

কে কাকে বিয়ে করেছে সে সব কথা শোনার আগ্রহ নেই লোকটির, কথা শেষ হয় না সরলার, সে যেন মরে গেছে। দেহে আর প্রাণ নেই।

গত রাতেও এমনই অবস্থা হয়েছিল। প্রথম এই আঙুলবিহীন মানুষটাকে আবিষ্কার করে এমনই ভয় পেয়েছিল সরলা।

লোকটি এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সরলার দিকে এগিয়ে এল। সরলা তেমনই পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত থেকে রুটি আর সিগারেটের প্যাকেট পড়ে গেল, চীৎকার করে উঠল সরলা।

কতক্ষণ যে এইভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে জানে না সরলা, হয়তো কয়েক সেকেণ্ড, কয়েক যুগও হতে পারে। লোকটি ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর দিকে এগিয়ে এসেছে।

এতক্ষণে সচল হয়েছে সরলা, সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নামতে নামতে সরলা চেঁচায়—খুন! খুন! খুন করলে—

সরলা একরকম নিঃসন্দেহ, লোকটা ওকে খুন করতে উদ্যত, চুলের মুঠি ধরে গুলি করবে—

সরলা প্রাণপণে চেঁচায়—কে কোথায় আছ গো! খুন! খু—

ফুটপাথে এসে দাঁড়াতেই চারদিকের লোক ভিড় করে এসেছে, সবাই এক সঙ্গে প্রশ্ন করছে—হাঁফাতে হাফাতে সরলা বলে, গোকুল গুণ্ডা! আমার ঘরে। বিটের পুলিস এগিয়ে এল, হুইসিল দিয়েছে, ব্যায়াম সমিতির ছেলেরাও দৌড়ে এসেছে।

পরবর্তী বিবরণ পাওয়া গেল সংবাদপত্রের রিপোর্টে। সব প্রথম ওরা সব রাস্তা বন্ধ করে, পুলিসের জন্য অপেক্ষা করেছে। পুলিস আসার পর চার পাঁচজন মিলে ওপরে উঠেছে।

সরলার ঘরে কেউ নেই, শুধু সিগারেটের ধোঁয়া। পাশের খালি ঘরের দরজা ভাঙা। গানের মাস্টার হরিপদবাবু চারতলার ঘর থেকে চেঁচাচ্ছেন আর হাত নাড়ছেন, সব কথা শোনা যায়নি, তিনি ছাদের দিকে আঙুল দেখিয়েছেন। পাশাপাশি সব কটি বাড়ির জানলা দিয়ে ছেলে বুড়ো সবাই সভয়ে লক্ষ্য করেছে।

ইনস্পেক্টর সরলাকে প্রশ্ন করেছিলেন—কি করে তুমি জানলে ঐ গোকুল গুণ্ডা?

সরলা বিজ্ঞের মত বলেছে—আঙুল নেই, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশেরটা—আমি বাড়ি ফিরতেই আমাকে ভয় দেখায়—

লোকটি তার পিছু নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে এসেছিল, এই তার ধারণা।

—কি নিয়ে তেড়ে এসেছিল?

—ঠিক জানি না, তবে পিস্তল মনে হয়।

ফায়ার ব্রিগেডের লোক এসে পাঁচতলা বাড়িটার চিলের ছাদ থেকে অবশেষে লোকটিকে ধরল।

পুলিস প্রশ্ন করেছিল—প্রথম কখন দেখলে ওর আঙুল নেই ?

সরলা বুদ্ধিমতী, বলল—রুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখলাম, আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল।

পুলিস থেকে গরম চা দিয়েছিল সরলাকে। সরলা এক চুমুক দিয়েই একটু কাশল। বলল—ওকি ধরা পড়েছে ?

ইনস্পেক্টর বললেন—হ্যাঁ, ছাদের ওপর থেকে ধরা গেছে, এখনই এসে পড়বে।

লজ্জা হচ্ছিল সরলার। সরলা যদি ওকে বলতে পারত ইচ্ছে করে করেনি। ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না এতটুকু।

কর্তার সিং থানায় এল। সে চুপি চুপি সরলাকে বলল—মাজী, এ সব হাঙ্গাম করলে কেন ?

সরলা উত্তেজিত হয়ে—আমি কি করেছি। আমাকে মারতে এসেছিল যে।

কথাগুলি বলার সময় মুখ চোখ লাল হয়ে গেল সরলার। সত্যি কি তাড়া করেছিল লোকটি। সত্যি কি তাকে মারত।

শোনা গেল যখন ধরা পড়েছিল তখন গোকুলের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, ধরা দেওয়ার সময় শুধু বলেছিল—সেই হারামজাদী কোথায় ?

সবাই এক ভুল করল। সংবাদ পত্রেও লিখল সরলার দুঃসাহসের এবং বুদ্ধির কথা। তার চেষ্টাতেই এতবড় খুনী ধরা পড়েছে এ বড় কম কৃতিত্ব নয়। সরলা কি প্রতিবাদ জানাবে, কি বলার আছে তার ? যদি ধরা না পড়ত দুজনে হয়তো গল্প করেই সারা দুপুর কাটিয়ে দিত।

অনেকদিন পরে যেদিন রায় বেরোল, হাকিম সরলাকে ধন্যবাদ দিলেন। সেই প্রশস্তিতে কোথায় যেন ব্যঙ্গের সুর ছিল। গোকুল উদাস মনে চুপ করে বসে ছিল, তার দৃষ্টি অন্য কোনখানে। আসামী পক্ষের উকীলের দেওয়া টফির ওপরকার সেলোফিন কাগজটা সযত্নে ছিঁড়ছিল গোকুল।

॥ শারদীয় 'নতুন জীবন' ১৩৫৬ ॥

ট্যাক্সিওয়ালা | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বিধবা কি সধবা কি করে বুঝব বলুন।

সরু পাড় কি নিপাড় শাদা শাড়ি এখন অনেকেই পরেন। ওটা ষ্টাইল।

আর চুড়ি না রাখা।

সিঁদুর না পরা।

কি এমনভাবে সিঁদুরের টিপ চুলের অরণ্যে লুকিয়ে রাখবে যে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকলে যদি আপনার মালুম হয় আলপিনের ডগার আঁচড়টি। অনেক সময়ই হয় না।

তাছাড়া মুখখানা প্রায় সব সময়ই বাঁ দিকের পার্টিশন তাক করে ধরে ছিল বলে মেয়েটির সিঁথি নজরেই পড়ছিল না।

চুড়ির বদলে বাঁ কব্জিতে ছোট ছেলেদের মোজার গার্ডারের মত কালো সরু ফিতায় বাঁধা ঘড়ি। ওর তলে রাখা হাতের সাদা ঈষৎ চ্যাপ্টা সরু কব্জির মাথায় তেঁতুল বিচির মত ঘড়িটা দেখতে দেখতে কেন জানি আমি মোটামুটি একটা বয়স আন্দাজ করে ফেললাম। ত্রিশ বত্রিশ? আটাশও হতে পারে।

কি আর একটু কম।

চব্বিশ। বাইশ?

বাইশ হলে খুব কম করে ধরা হত। বস্তুত একদিকে বর্ষার কচি মুলোর মত মসৃণ কোমল কব্জি, আবার অন্য দিকে ওর পর মাংসল ভারি পা দুটো বয়েস সম্পর্কে মনে কেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল। তাই হয়। অনেক সময় কোন মেয়ের চিবুক ও চোয়াল আপনাকে যে বয়সের ইঙ্গিত দেবে, গলা বা ঘাডের দিকে চোখ রাখা মাত্র আপনার সেই অনুমান মিথ্যা মনে হবে। চিবুকে যদি চব্বিশ বছর বয়স লেখা থাকে ঘাডের দিকে তাকান মাত্র আপনার মনে হবে—না আরো বেশী, বত্রিশ।

এই ক্ষেত্রে আমি সে ধরনের একটা গোলমালে পড়েছিলাম। চেয়ারের তলা দিয়ে মেয়েটির চটি খোলা পায়ের যেখানটায় শাদা লেস পরানো সায়াটা উড়ু-উড়ু করছিল (বস্তুত এত জোরে ও ফ্যান্ চালিযে দিয়েছিল যে হাওয়ায় তার কামরার ভিতর ঝড বইছিল) দুবার আমি সে জায়গাটা বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। তামাটে বেশ শক্ত মতন মাংসের একটা ডেলা। অথচ সেই তুলনায় তার হাতটা অনেক বেশি শুভ্র কোমল কচি মনে হচ্ছিল।

সুতরাং হাত যে বযস বলছিল, পা বলছিল তার উল্টোটা। কিন্তু তাহলেও আমি পায়েব বয়সটা বাতিল কবে দিলাম। কেননা ঝড়ো হাওয়ায় মুহুর্মুহু খোঁপা থেকে আঁচলটা যখন খসে খসে পডছিল ওর গলা ও ঘাডের সুন্দর কোমল বাঁক ও রেখাগুলি দেখে চব্বিশ পঁচিশের বেশী বযস হবে না নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।

আমার এতটা দেখার সুবিধা হত না।

আমি অনেকক্ষণ আগেই চা শেষ করে চুপচাপ বসে ছিলাম। একজন কেউ ভিতরে পর্দা খাটানো কামরায় বসে খাচ্ছে হোটেলে (হোটেল রেষ্টুরেণ্ট) পা দিয়েই অনুমান করতে পেবেছিলাম। পর্দার ওপারে একজন আছে কি দুজন আছে প্রথমটায় অবশ্য ঠিক ধরতে পারিনি। এবং ধবতে না পারাটা কাজের কথা নয়—কোন বুদ্ধিমান যুবকই মেয়েটি একলা এসেছেন না সঙ্গে অন্য লোক আছে, না জানা পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকেন না।

আমি চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে চোখ রেখে এপারে বসে আর একটা কিছুর অর্ডার দিতে তৈরি হতে লাগলাম।

পুরুষ-খদ্দেরের গলার শব্দ শুনে কিনা ঈশ্বর জানেন, ও-ঘরের পাখা হঠাৎ বেগবতী হয়ে উঠল। তারপর তো পর্দা কতবার উঠল, কতবার নড়ল, কতবার দরজা থেকে তা সরে সরে গেল। ভিতরের হুকুম পেয়ে কিনা বোঝা গেল না যে ছেলেটা আর একবার ভাত নিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল পর্দাটা দলা পাকিয়ে পার্টিশনের মাথায় তুলে দিলে।

ভাতের পর দেখলাম আবার ডালের বাটি গেল, এক দলা আলু সিদ্ধ।

ডিম মাংস কালিয়া কোর্মা দো-পেঁয়াজি ইলিশ-ভাতের গন্ধে চারদিক ম-ম করছিল। চপ কাটলেট গ্রীল মোগলাই পরটার অর্ডার পড়ছে অন্য দিকে। বেশ বড় রেষ্টুরেণ্ট।

কিন্তু সেই ডিশে ও কামরায় ডাল আর আলু ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করল না লক্ষ্য করে সচকিত হয়ে উঠলাম।

এটা অবশ্য কাজের কথা নয়।

অবস্থা ও রুচিভেদে এক একজন এক একরকম খাওয়া পছন্দ করে। একটা আস্ত সিগারেট শেষ করে আমি একটা চিংড়ি কাটলেট-এর অর্ডার দিলাম। সামনের কামরায় একটি মেয়ে খাচ্ছে আর সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে একটা চেয়ার দখল করে এমনি বসে থাকাটা অশোভন। কাজেই অতিরিক্ত খরচে নামা গেল।

ছেলেটাকে ডাকলাম।

যে উদ্দেশ্যে গলা বড় করে আমি ছেলেটাকে ডাকছিলাম তাও চরিতার্থ হল। পর পর দুবার ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি এদিকে তাকায় ও আমাকে দেখে।

একটি মেয়ে সম্পর্কে আমি এতটা উৎসুক কেন, আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভাবছেন লোকটা অভদ্র ইতর।

আসলে কিন্তু আমি তা না। আমি ট্যাক্সি চালাই। যারা ট্যাক্সি চালায় তারা সব সময়ই চোখ কান সজাগ রাখে। কে কখন ডাকে, কার কখন হঠাৎ ট্যাক্সির দরকার হয় তার ঠিক আছে কিছু।

হ্যাঁ, আমার প্রথমেই মনে হল যেন খাওয়া সেরেই মেয়েটি নিশ্চয় গাড়ি ঘোড়া কিছু একটা ডাকবে।

আপনারা ঠোঁট টিপে হাসছেন।

কিন্তু এটা তো সত্য, যে নিত্য যাত্রী পারাপার করে, কার কখন গাড়ির

দরকার হবে রাস্তায় ঘাটে লোকের চোখ মুখ দেখলে আপনাদের চেয়ে সে একটু আগে বুঝতে পারে।

হ্যাঁ, আট বছর আমি কলকাতা শহরে ট্যাক্সি চালাই। আমার নিজের গাড়ি।

গাড়ি কিনে আমি এই ব্যবসা করছি ঠিক তা না কিন্তু।

বরং গাড়ি চড়ে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যাবে এই মতলবে গাড়ি কেনা হয়েছিল। হাম্বার। এক নম্বরের গাড়ি এটা মশাই আমার।

হ্যাঁ, ওতে চড়ে হাওয়া খাওয়ার মতলবটা আমার চেয়ে আমার বাবার বেশি ছিল।

কিন্তু কেনার এক বছর পরে বাবা মারা যান।

তার পরের বছর আমাদের দেশ ভাগ হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের ছোটখাট জমিদারিটা গেল।

ফতুর, আমি তখন ফতুর। জমানো টাকা কিছুই প্রায় ছিল না। জমিদারিতে ক'বছর ধরেই ঘুণ ধরেছিল।

আর কি, গাড়িখানা সম্বল করে আমার স্ত্রী রমার হাত ধরে হিন্দুস্থান, মানে কলকাতায় বড়মামার বাসায় এসে উঠলাম।

হুঁ, একডালিয়া রোডে।

গাড়িটা এবং বলতে সঙ্কোচ নেই, রমাও প্রায় নতুনই ছিল। গাড়ি কেনার ছ'মাস আগে তো আমি বিয়ে করেছিলাম।

যাক্‌গে, এখন জমিদার-নন্দন চাকুরে মামার ঘাড়ে চেপে তার অন্নধ্বংস করবে তা-ও একলা না সস্ত্রীক, অত্যন্ত নিন্দনীয়। বুঝলাম।

তাছাড়া মামা পারতেনও না।

বুদ্ধি করে বৌকে মামাশ্বশুরের জিম্মায় রেখে আমি গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম।

হুঁ, ট্যাক্সির লাইসেন্স নিয়ে (অবশ্য সরকারী চাকুরে আমার মামাই তদ্বির-টদ্বির করিয়ে চট্ করে লাইসেন্সটা বার করতে সাহায্য করলেন)। বেশ দু'পয়সা কমাতে লাগলাম।

চাকরি, বিশেষ করে অফিসের লেখা-পড়ার কাজের বিদ্যা মশাই, আমার ছিল না বলে রাখছি—জমিদারের বাচ্চা, দুধের সর আর মাছের পেট খেয়ে প্রজাদের চোখ রাঙিয়ে জমিদারি চালাব এই স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছিলাম। তা সে সুখ তো কপালে রইল না।

হুঁ, আমি ও আমার গাড়ি যখন দিবারাত্র কলকাতা শহরে চরতে লাগলাম আর একজন কিছু দূরে একডালিয়া রোডে চুপ করে বসে রইল না। রমা।

পাকিস্তান থেকে সে-ও নতুন এসেছে তাজ্জব শহরে। গাড়িটা যদি একডালিয়া রোডের বাসায় এমনি পড়ে থাকত তো আমার মামা বিকাশ রায়ের বড় মেয়ে টুনি (ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন) ওটাকে ব্যবহার করত। সে কি এক আধ বার। দিনের মধ্যে বিশ বার। সে-বাড়ি উঠেই দু-এক দিনের মধ্যে আমি টের পেয়েছিলাম। নতুন কলেজী হাওয়া গায়ে লেগেছে টুনির। তার ওপর চেহারাখানাও মিষ্টি মতন। তায় আবার সবে লাগছিল ষোলটা বসন্তের হাওয়া। মশাই, ও কি আর ওর মধ্যে ছিল। টুনি বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা আর শেষ করে উঠতে পারছিল না।

অবশ্য বিকাশবাবু চেষ্টা করেছিলেন অনেকদিন থেকেই গাড়ি কিনতে। তা, সে কি আর চাকুরে লোকের পক্ষে চট করে হয় মশাই, তা-ও এই গ্রেডে থেকে।

কাজেই বুঝতে পারছেন টুনি গাড়িটা একবার বাড়ির মধ্যে পেয়ে প্রাণখুলে বেড়াতে শুরু করেছিল। ওটাকে আমার সঙ্গে না নিয়ে এলে কী অবস্থাটা হত?

গাড়ি রেহাই পেল, কিন্তু রমা রেহাই পায়নি। মফঃস্বল থেকে নতুন মেয়ে এসেছে। তা-ও একডালিয়া রোডের মত ফ্যাশানেবল পাড়ায়। তার ওপর রমার চেহারা ওপাড়ার অনেক মেয়ের চেয়েই ভাল—আর এই তো সবে বিয়ে হয়েছে, এখনো ইয়ে—

'বৌদি বৌদি।'

হ্যাঁ, বিকাশ রায়ের বড় ছেলে বেণু রায়। কী পাজি মশাই, যদি দেখতেন। এমনি মুখ দেখলে মনে হবে সাত চড়ে রা বেরোয় না। ভাজা মাছ উল্টে খেতে শেখেনি। আর এদিকে তলে তলে হাড়বদমায়েস।

'বৌদি বৌদি।'

ঐ যে বললাম। টুনি করত আমার গাড়িটার সদ্ব্যবহার, আর বেণু হারামজাদা করতে লাগল আমার স্ত্রী রমাকে ব্যবহার। হ্যাঁ, ঐ যথার্থ শব্দ। বৌদি না হলে চা-খাওয়া হয় না, বাবুর বিছানা ঠিক থাকে না, বৌদি টেবিলের বই গুছিয়ে না রাখলে গোছান হয় না, ধোবার কাপড় এলে সেগুলো

স্যুটকেসে তুলতে ও দরকার মত একটা একটা করে বার করে দিচ্ছে বৌদি। ভাত খেয়ে উঠে বৌদির হাতের মুখশুদ্ধি মশলা মিষ্টি। বাথরুমে যেতে তোয়ালে সাবানের জন্যে বৌদির ডাক।

কেন হবে না মশাই!

রাতদিন দেখছিল সমর্থ সব মেয়ে।

সমর্থ মেয়েরা বেছে বেছে সমর্থ পুরুষকে পাকড়াও করছে। একত্র বেড়ানো, একসঙ্গে সিনেমা দেখা।

আমি তো আগেও কলকাতায় এসেছি। কিন্তু হালে, পাকিস্তান ছেড়ে এসে এবার রকম সকম দেখে বুদ্ধি লোপ। আর একডালিয়া রোডের মত বাবুপাড়া। অবাধ মেলামেশার যেন বান ডাকছিল।

কিন্তু আমাদের সোনার চাঁদ বেণু সুবিধে করতে পারছিল না। বাপের অবস্থা তো আর দশটি ছেলের বাপের মতন না। বুঝতে পারছেন। রাজা জমিদারের মত অবস্থার ঘরের ছেলের সংখ্যা সেখানে অনেক।

আর লুটছিল সব তারাই।

গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, হাতে দুটো তিনটে করে হীরে চুনীর আংটি সব ছেলের।

মশাই, কায়দা করে বাবা বনেদী পাডায় বডমানুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকছিল বটে।

কিন্তু চারদিকের অবস্থা যে অন্যরকম। ছেলে মেয়ে দুটোরই উপোসে কাটছিল। টুনি পাচ্ছিল না একটা গাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আহা কী সব বন্ধু। হাতিবাগান না সিমলা স্ট্রীট থেকে একদিন একটা ছেলে গিয়েছিল ওবাড়ি। ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, গায়ে কাঁধছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবি। শুনলাম ঐ নাকি টুনির লেটেষ্ট। তা যেমন অবস্থার ঘরের মেয়ে এর চেয়ে ভাল ছেলে ও যোগাড় করতে পারত কি?

আর এদিকে ভুগছিলেন বেণুবাবু।

নতুন গোঁফ কামাচ্ছেন। কলেজে একটা পাস দিয়েছেন। আদ্দি মলমলটা যে গায়ে না উঠছে তা নয়, পায়ে হরিণ চামড়ার চটি, বোতামের গর্তে একটা দুটো গোলাপ ফুলও মাঝে মাঝে গোঁজা হয় এবং মাথায় একটু আধটু গন্ধ তেল। কিন্তু ঐ। এর বেশি না। পকেটে পার্সে আর ক'টাকা নিয়ে চলাফেরা করতেন সাব-ডেপুটির ছেলে? এই বিত্ত নিয়ে ওখানকার মেয়েদের

সঙ্গে প্রেম করা। আমার তো মনে হয় কারো চুলের ডগাটি ও ছুঁতে পারেনি ওপাড়ার।

তার শোধ তুলল সে রমার ওপর। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আত্মীয়াও বটে, নারী তো বটেই। আঠারো বছর বয়েসে সবে পা দিয়েছিল রমা। আর, বেণু ওকে পেলে কোথায়—রাস্তায় ঘাটে না, বাড়িতে, ঘরে, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

'বৌদি বৌদি।'

মানে উপোসী বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ পেল। কি, আমি খুব বেশি দোষ দিই না রমার। কি আর তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে ওই বয়েসে, পাড়াগাঁয়ে থেকে লেখাপড়া শিখে চোখমুখ ফুটবে তারও খুব একটা সুযোগ পায়নি। আদুরে বাপের মেয়ে মাঘমণ্ডল ব্রতকরে আর দেয়ালির রাতে হাজার বাতি ও রংমশাল জ্বালিয়ে বড় হতে না হতে টুপ করে একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

তাছাড়াও একটা শয়তান যদি একটি মেয়ের মুখের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্বাস ফেলতে থাকে—

একডালিয়া রোডের বাড়ির শোবার ঘরে, বাথরুমে, বাগানে, ছাদে আধখানা মাথা নষ্ট হয়েছিল রমার। বাকি আধখানা হল বাইরে রেষ্টুরেন্টে, হোটেলে এবং আর কোথায় কোথায় বেণু ওকে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। এদিকে আমাকে থাকতে হচ্ছিল বাইরে বাইরে গাড়ি নিয়ে রোজগারের ধান্দায়। টের পাইনি। কিন্তু যখন টের পেলাম তখন সব শেষ হয়ে গেছে। না, একটা সান্ত্বনা থাকত যদি বেণু ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও ঘর-সংসার পাতত—কিন্তু তা সে করেনি, করার ইচ্ছাও ছিল না। হয়তো এসব রেওয়াজ এই শহরে আজকাল উঠে গেছে। একডালিয়া রোডের বাসায় যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। রমাও সেখানে ছিল না জানতাম। নারকেলডাঙ্গার কাছাকাছি একটা টিনের শেড ভাড়া করে আমি আমার ট্যাক্সি নিয়ে থাকি। তখনই একদিন খবর পেয়েছিলাম রমা নাকি ধর্মতলার কোন একটা বার-এ মদ খেয়ে এক রাত্রে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। বেণু রায়? না, সঙ্গিনী নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে ফুর্তি করার পয়সা তার ছিল না। হাত বদল হয়ে হয়েই রমা সেদিন কার কাছে গিয়ে পড়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন আর আমার স্ত্রী সম্পর্কে কেউ কোন সংবাদ দেয়নি।

তারপর বছর তিন বাদে সংবাদ পেলাম দেরাদুন না কোথাকার

হাসপাতালে আড়াই মাস একটা ঘা নিয়ে শুয়ে থেকে তারপর রমা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

শুনে আমিও শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তারপর, তারপর আমি নারকেলডাঙ্গা থেকে উঠে এসে সার্কুলার রোড ও শেয়ালদার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা টালির শেড ভাড়া করে গাড়ি নিয়ে আছি, হুঁ তেমনি ট্যাক্সিড্রাইভার। তবে রোজগার এখন বেড়েছে। বেড়েছে মানে বেশ বেড়েছে।

না, পূর্ব পরিচয় দিলাম এই জন্যে যে আমার ওপর দিয়ে, হ্যাঁ ভাগ্যের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

আপনারা শুনলে হাসবেন।

হাসবেন এবং দুঃখও করবেন।

এবং এটা খুবই সত্য যে লোকে বলে যে, ঈশ্বর একদিকে কেড়ে নিলে আর একদিক দিয়ে দেয়।

স্ত্রী, জমিদারী গেছে। দেশ গেছে। কিন্তু যেমন দিনকাল। খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে যে আজ এই শহরে আমাকে থাকতে না হত তার বিশ্বাস ছিল কি? হ্যাঁ, আমি টাকা পয়সার কথাই বলছি। দিব্যি আছি। সুখই বলা যায়। আমি, দেখুন ইচ্ছে করলে, রোজ এক বোতল বিয়ার খেতে পারি। দুপুরবেলা আস্তানায় ফিরে গিয়ে সসপ্যানে করে আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শেয়ালদা কি ধর্মতলার কোন হোটেলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা খরচ করে এখন মাংস ভাত চালাই। তবে একটু রয়ে-সয়ে খাওয়া দাওয়া করি আর মদটদও পারতপক্ষে অভ্যাসে আনতে চাই না। আমার পেটের ধাত ছোটবেলা থেকেই একটু আধটু খারাপ। লিভারের জোর কম।

তার সুবিধা হল এই যে, অপব্যয় না করার ফলে দু' চার হাজার টাকা আমি যখন তখন বার করে দিতে পারি। একটা একাউন্ট খুলেছি ব্যাঙ্কে। খাই-খরচা বাদ দিয়ে যে টাকাটা বাঁচে ওখানেই ফেলে রাখি।

এতক্ষণ পর নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন আমি অত লোলুপ দৃষ্টিতে কেন বারবার মেয়েটিকে দেখছি। খাওয়া দেখছিলাম।

হ্যাঁ, কখন খাওয়া শেষ হবে আর বেরিয়ে এসে আমার গাড়িতে উঠবে। আরও ক'টা টাকা পাব। ড্রাইভাররা, বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি চালায়,

তাদের চিন্তাটা সাধারণত এখানেই বয়। অন্তত প্রথম বইতে শুরু করে।—আর তা ছাড়াও আমি গোপন করব না, মেয়েটিকে যখন দেখছিলাম তখন তার হাত, পা, পিঠ, কাঁধ, চুল, গায়ের রং এমন কি কোমরে কতটা মাংস নেই আর বুকে কতটা মাংস বেশি আছে দু চোখ দিয়ে জরীপ করলাম, দূর থেকে যতটা সম্ভব।

হাওয়ার দাপটে যখন খোপা থেকে আঁচলটা পিঠে নামল ও পরে পিঠ থেকে সরে গিযে আর একটা কাঁধের কাছে উড়ু উড়ু করে তখন আমি তার এ-কাঁধটা দেখতে পাই, বুকের এপাশের সুগোল মসৃণতা। তারপরেই অবশ্য ধীরে সুস্থে একটা কাটলেটের অডার দিই। না হলে আর এই গরমে আমার কাট্‌লেট খাওয়ার ইচ্ছা—

কেননা এ-কাঁধের কাপড় সামলাতে এদিকে ও ঘাড় ফেরাতে আমার চোখের সঙ্গে ওর চোখ বেঁধে গেল। ঐ এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে পারলাম গাড়ির দরকার হবে।

কাটলেট শেষ করে আব একটা সিগারেট ধবাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যে খুব একটা লোভ হচ্ছিল বৌটিকে দেখে, তা না।

তাছাড়া, নিজের স্ত্রী, রমার কাছে কামড় খাওয়ার পর স্ত্রীলোকদের আমি একটু এড়িযেই চলি। বেশ আছি একলা আমার টিনের শেডে। খাই-দাই ফুর্তি করি। তা না, জমিদারের ছেলে, দেশের অনেক বড়লোক বন্ধু পেয়ে গেছি এখন এই শহরে। হয়তো অনেকে আগে বড়লোক ছিল না, এখন হযেছে, নিজেদের চেষ্টা বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে। ব্যবসাকেন্দ্রে আমার আনাগোনা একটু বেশি। তাঁদের আমাকে একটু সহানুভূতি করাও বটে। তাঁরা ডাকছেন, তাদের ছেলেমেযেরা ডাকছেন, আত্মীয় এবং বন্ধুরা দরকার হলেই আমার গাড়ি ভাড়া করেন। বালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে গড়পাড়, গড়পাড় থেকে নতুন বাবুপাড়া লিন্‌টন স্ট্রীট, সেখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রিট এবং সেখান থেকে বেরিয়ে ডালহৌসী, কি চৌরঙ্গী কি ধরমতলা। পুরুষ—আমি আপনাদের কাছে যখন কিছুই গোপন করব না তখন বলে রাখি, পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আমাকে বেশি ডাকে। তাই বলছিলাম, ভগবান আমার একদিক নিয়েছেন আর একদিক পূরণ করেছেন। এক এক সময় ভাবি, এক কালে জমিদার ছিলাম, আমার চেহারায়, চলায়

বলায় তার পরিচয় এখনো একটু আধটু লেগে আছে বলে কি তারা আমার ট্যাক্সিতে চাপতে পছন্দ করেন! আমিও আমার চেহারা এবং পোশাক যতটা সম্ভব সুন্দর সুদৃশ্য রাখতে চেষ্টা করি এবং ফি মাসে গাড়িটার রং ফিরিয়ে ওটাকে তকতকে ঝকঝকে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করি না। কেন তা করব না বলুন, আর দশটা ট্যাক্সিও যদি পর পর দাঁড়িয়ে থাকে, বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি, কি যেন নাম—উমা সেন, হাত তুলে ঠিক আমাকেই ডাকবে। লিন্টন স্ট্রীটের সেই রূপসী বৌ, রুবি রায়—যদি কষ্ট করে একটু হেঁটে এসেও আমার গাড়ি ধরতে হয় তো তা করতে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। রাস্তায় আর পাঁচটা ট্যাক্সিওয়ালা বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে শুধু দেখে। গড়পাড়ের অসীমা চ্যাটার্জী, পদ্মপুকুরের তৃপ্তি চৌধুরী, মোহনবাগান স্ট্রীটের মালা রায়, পার্ক সার্কাসের চামেলী, শোভাবাজারের সুমিতা এবং আরও একশটি মেয়ের বাড়ির নম্বর আমার মুখস্থ। বাড়ির নম্বর এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে (যদি কেউ অফিসে কাজ করে তো সেই অফিস এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেখানে যায়) যেখানে যাবে সেই ঠিকানা আমি জানি। মাফ করবেন, আপনি যদি স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে লটবহর নিয়ে হঠাৎ শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে কি কাঁকুড়গাছি কোন আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছে দিতে আমায় ডাকেন, আমি দু হাত তুলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। সময় নেই। আজ শনিবারের দুপুর, সোওয়া বারোটা বাজে, ঠিক একটায় ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের লাল অফিস-বাড়িটার সামনে আমাকে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। সেই অফিসের রেবা সোমকে আমায় শেয়ালদার একটা হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে। আজ রোববার, উঁহু তিনটে বেজে গেছে, এখনই আমাকে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতে হবে সাদার্ন এভিন্যু। ঝাউ গাছের আড়াল করা সেই আকাশী রঙের বাড়ির সপ্তমী বোসকে পৌঁছে দিতে হবে সৈয়দ আমীর আলী এভিন্যুর একটা সুন্দর ফ্লাট বাড়িতে। সোমবারের সকাল, সময় নেই, মধু বোস লেনের মায়া গাঙ্গুলী আমার ট্যাক্সিতে চেপে টালিগঞ্জের একটা বাড়িতে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার সন্ধ্যা সাতটায় সেই মায়াকে নিয়ে ধর্মতলায় যেতে হবে।

হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে। সময়, স্থান, লোক ও পথের দূরত্ব। ঘড়ির কাঁটা ধরে ধরে আমার সে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে হয়।

তাই বলছিলাম, হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাবেন মনে মনে ঠিক করে যদি

হঠাৎ আপনার বুড়ি দিদিমা একদিন হাওড়ার মেল ধরতে চাকর পাঠিয়ে আমার ট্যাক্সি ভাড়া করতে চান তো তিনি নিরাশ হবেন।

অবশ্য মিষ্টি বাক্য বলেই আমি আপনাদের চাকরকে ফিরিয়ে দেব আর আপনার দিদিমার জন্য মনে মনে কষ্টও করব, কিন্তু আপনারা শুনে হাসবেন আজ অবধি কোন বর্ষীয়সীই আমার গাড়িতে চাপল না। তখন, তখন হয়তো আমি আমার সাদা কালো হাম্বার নিয়ে লিন্টন স্ট্রীটে যেতে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে তৈরী হতে আপনাদের পাড়ার রেষ্টুরেণ্টের সামনে গাড়িটা থামিয়েছি। আর আপনার চাকরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে দোকানে বসে চায়ের বাটি সামনে নিয়ে আমি একটি তরুণীকে দেখছি। বনানীকে। তার ফর্সা সুগঠিত বাহু, শক্ত মজবুত খোঁপা এবং ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ উদ্ধত নাক। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হলে সেই নাকের ঘায়ে ও আমাকে কচুকাটা করে দিতে চাইবে। ছবিটা ভাবছিলাম। গোলাপী রং করা গোল প্যাটার্নের বাড়ির অসামান্য সুন্দরী মেয়ে। কলেজে পড়ে। বনানী সেন।

এবং বনানীর মত সবাই দেখতে ভাল। হ্যাঁ, যারা আমার গাড়িতে চাপে। সব মেয়ে, সব বৌ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমি যখন পাশে চুপ করে দাঁড়াই তখন দেখি তাদের চুল দেখি চোখের পালক দেখি ঘাড়ের বাঁক দেখি পিঠ দেখি কোমর। গাড়িতে উঠতে কি নামতে যদি কোন মেয়ের শায়া বা শাড়ি একটু বেশী সরে বা উঠে যায় তো আমি পায়ের রং মাংসল ডিম এমন কি রোমকূপগুলি পর্যন্ত সতর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে চট করে দেখে নিই। প্রশ্ন করবেন, কেন? অভ্যাস। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওপর ওপর দেখা। নখ চুল আঙুল পালক মাংস চামড়া ছাড়া আর কিছু দেখা আমার ইচ্ছাও নেই সময়ও হয় না।

মন?

তাই বলছিলাম ওদের ওদিকটা আমি মাড়াই না। যতদূর সম্ভব চোখ বুজে থাকি, এড়িয়ে যাই। না হলে বনানী কেন আমার ট্যাক্সি যথাসময়ে ওর দরজায় হাজির না থাকলে রাগ করে, বালিগঞ্জের বৌটি মূর্ছা যায়, টালিগঞ্জের মেয়েটি চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয় তার কিছু কিছুটা আমি জানি। কিন্তু জেনে করব কি। আমি যে আগেই আর একজনের কাছে ছোবল খেয়ে আছি।

চুপ থাকি। চোখ বুজে যাই। মিটার মিলিয়ে পয়সা আদায় করে আর

এক সেকেণ্ড কোথাও দাঁড়াই না। আর এক পাড়ার ফেল দিতে শহরের রৌদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বরং মন-টন না দেখে আর দশজন ট্যাক্সিওয়ালার মত নিস্পৃহ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে করি। পৃথিবীতে বোধ করি একমাত্র ট্যাক্সিওয়ালারাই এত কাছে এসে এত নিরাসক্ত চোখে নারীর রূপ দেখে। তাই তাদের হাঁ করে তাকিয়ে দেখাটাও বাড়ির 'জেনানারা' কোনদিন আপত্তি করে না!

আমরা ট্যাক্সিওয়ালারাও সিগারেট মুখে গুঁজে সেই অগাধ রূপের ওঠা-নামা দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ষ্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে যাই। এর বেশি কিছু আমাদের দরকার হয় না।

আর, তা ছাড়াও, আমি, ধরুন এখন যেমন অভদ্রভাবে টেবিল থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বার বার খাবার প্লেট থেকে থুঁতনিটা তুলে বৌটির খাওয়া দেখছিলাম, এমন করার সুযোগ আপনারা সেখানে পেতেন না।

রেষ্টুরেণ্টওয়ালাই আপত্তি তুলে বলত, মশাই বেরিয়ে যান। এটা ভদ্রলোকের জায়গা। এমন ভাবে তাকানো—

সেই স্বাধীনতা আমার ছিল।

সেই সুখ। আর আপনাদের এখন বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না, রোজ অন্তত দেড় ডজন মেয়ের রঙিন শাড়ি শায়া ব্লাউজ অবিশ্বাস্ত রকমের সব সুন্দর খোঁপা বেণী, চোখ, চোখের রং ও হাসি কান্না দেখে আমি নিজের স্ত্রী-বিচ্ছেদের কথা একেবারে ভুলতে পেরে ট্যাক্সিওয়ালার জীবন কায়মনে আঁকড়ে ধরে আছি। বেশ আছি।

হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছি—খুঁটিয়ে বৌটিকে দেখছি। নিশ্চন্ত মনে। তা ছাড়া এইমাত্র হঠাৎ একটা ভিড় হয়ে রেষ্টুরেণ্ট আবার পাতলা ফাঁকা হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের হোটেল রেষ্টুরেণ্টের দস্তুর যা। কোথা থেকে সব লোক ছুটে আসে আবার একসঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। একটিও থাকে না।

আমি দৃশ্যটা তাই উপভোগ করব বলে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসি। খাওয়া দেখি। ছোট ছোট হা। শাদা মুখ শাদা ব্লাউজ। শাদা পাড় ছাড়া কাপড়। একটা শ্বেতপাথরের পুতুলের মত লাগছিল। পুতুল খাচ্ছে।

তা ছাড়া ওর উল্টো দিকের দেয়ালের রংটা পাকা সবুজ। তার ওপর এই দিনেরবেলায়ও মাথার ওপর বত্রিশটা বাল্‌ব জ্বলছে। শরীরের একটা শাদা ছায়া পড়েছিল সামনে টেবিলের কাচে। শরীরটা ছোট। হুয়ে খাওয়ার সময় ছায়াটা আরো ছোট হয়ে টেবিলে পোর্সেলিনের শাদা ডিশটার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল এক একবার।

এবার পায়ের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম শাড়ির আঁচলটা সরে গিয়ে শায়ার খানিকটা বেরিয়ে আছে। ঘোর লাল র। এখন বুঝলাম হাতের মত পা দুটোও খুব ফর্সা। শায়ার লালচে আভা লেগে পায়ের মাংস বাদামি রং ধরে আছে। বয়সের রং না ওটা।

মানে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম, হাত পা আঙুল গলা নাক ভুরু চুল চোখ সব নতুন। একেবারে টাটকা, তাজা। যেন এইমাত্র বাক্স থেকে (বা ঘর থেকে যা-ই বলুন) বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। একটা রেষ্টুরেণ্টে বসে খাচ্ছে।

এক গ্লাস জল দিতে ডাকলাম ছেলেটাকে।

জল খেয়ে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম।

মেয়েটিও সোজা হয়ে বসেছে। জল খাচ্ছে। ওপরের দিকে ওর থুঁতনি। আঁচলাটা আর খোঁপা বা ঘাড়ে লেগে নেই, সরে গিয়ে বাঁ বগলের তলায় উড়ু উড়ু করছিল, ফলে সবটা পিঠ এখন দেখা যাচ্ছিল। আহা, কী পিঠ। যেন ঈশ্বর নিজের হাতে বাটালি চালিয়ে খোদাই করে সেই পিঠ তৈরী করেছে, তারপর ওতে রাঁদা চালিয়েছে।

মেয়েরা খুব পাতলা ব্লাউজ পরে। ব্লাউজের তলায় বডিজের ফিতে দুটো কড়া হয়ে চোখে পড়ে। যেন ওটা দেখানোর জন্যই ওপরের জামাটা। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখে খুশী হলাম। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, টালা, গড়পার, এন্টালি, পার্ক সার্কাস-এর এত মেয়েকে আমি রোজ বয়ে বেড়াই' এমন রেখে-ঢেকে জামা পরতে আর কাউকে দেখিনি। অথচ এতে যে তার পিঠের লাবণ্য মাংসের ছোট নরম ঢেউগুলো বোঝা যাচ্ছিল না তা-ও না। শাদা ষ্ট্রাপ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। এখন দেখলেই মনে হয় শরীরের কোথাও বুঝি অপারেশন হয়েছে। ওটা ব্যাণ্ডেজ। বাদুড়বাগানের শ্যামলী, সাদার্ন এভিন্যুর রেখা, লিন্‌টন ষ্ট্রীটের বনানী, সুবাবর্দী এভিন্যুর শোভা সোম সব, সব এক। আমি, যদি কোন সময় কাপড় সরেও যায়, ওদের পিঠের

দিকে তাকাই না। চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু, গোপন করে লাভ নেই, আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছিল এখন এখানে এই মেয়েটির পিঠটা একবার ছুঁয়ে দেখি।

অবশ্য আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার জীবনে তার সুযোগ কম। পিঠ ধরব কি ভাল করে ওদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না। 'রোক্‌কে', 'জোর্‌সে চালাও', 'আ গিয়া' আর তারপর 'কত উঠল মিটারে ?' ইত্যাদি একটা দুটো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া ছাড়া জেনানাদের সঙ্গে ক'টা আর কথা হয়।

আর তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন এক একজন।

আমরা ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই খালাস। কেবল রাস্তার ক'মিনিটের সম্পর্ক।

কেবল সেদিন, আমার এখানে এই সাত বছরের জীবনে বকুলবাগান স্ট্রীটের একটি বৌয়ের হাত ধরেছিলাম। ভারি নরম হাত। বৌটি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ফুটবোর্ড থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

আর কোনদিন দেখিনি আমার ট্যাক্সিতে উঠতে। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করছিল।

এখন বৌটি স্বামীর বাড়ি থেকে ভরদুপুরে পালিয়ে হাজরার মোড়ের একটা বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে যে প্রেম করছিল আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হর্ন শুনে যেভাবে ছেলেটিও একটা ঘরের পর্দা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে মেয়েটিকে ধরতে এসেছিল। পড়ে যেত বলে তার আগেই আমি যদিও ওর হাতটা ধরে ফেলে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলাম।

না, বলছি এইজন্য যে, আমি সেখানে দাঁড়ানো সত্ত্বেও ছেলেটি বৌটির গলায় হাত রেখে যেসব কথা বলছিল।

কিন্তু তা শুনে তা বুঝে করব কি। আমি করবার কে। চোখ মুছে ফের মেয়েটি গাড়িতে উঠে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরিয়ে নিতে বলেছিল। ডবল টিপ। দুটো বেশি পয়সা রোজগার হয়েছিল। ঐ পর্যন্ত।

আর দেখিনি ওকে।

অবশ্য এরকম ঘটনা আমি আঙুলের কড়ে গুণে আপনাদের শোনাতে চাই না। শোনাই না। আমরা সব দেখে বুঝে চুপ থেকে সিগারেট ধরিয়ে ফটক ছেড়ে চলে আসি। কথাটা উঠছে এইজন্যে যে, হাত ধরেছিলাম।

কিন্তু আমার হাত ধরায় কী এসে যায়। আমার দিকে আর কবার ও তাকিয়েছিল? যে হাত ধরেছিল ফেরার পথে তার মুখ ভেবেই সারা রাস্তা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বৌটি গাড়ির কোণায় মাথা রেখে নিঝুম পড়েছিল। কাজেই আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের হৃদয় মন হাসি-কান্নার মধ্যে উঁকি না দিয়ে থাকাই লাভ।

কী, সেদিন, আমি যতক্ষণ না রিচি রোডের উমা চ্যাটার্জীকে তুলে চৌরঙ্গীর হোটেলের একটা কামরায় পৌঁছে দিতে পারছিলাম ততক্ষণ, সারাটা বিকেল, উনিশ বছরের (কি কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে বৌটির) একটি মেয়ের শরীরের তাপ, খাঁ খাঁ যৌবন, মাংসের মসৃণতার স্বাদ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছি, চিন্তায় বুঁদ হয়ে শিস দিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলাম। মন খারাপ করব কেন।

হ্যাঁ, ট্যাক্সিওয়ালা তার ওপর রমার সেই ঘটনায় হৃদয় নামক জিনিসটাকে গাড়ির চাকার তলায় থেঁতলে থেঁতলে এই শহরের পিচের রাস্তায় আমি যে সাত বছরে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলাম তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

আর এক মেয়ে উমা।

কী চেহারা মশাই। আগুন।

এখনো কলেজে পড়ছে। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুরি করে রোজ হোটেলে সেই ভদ্রলোকের কাছে কেন যায় আমি কি জানি না, জানি, জেনে চুপ থাকি।

চুপ থাকার কারণ কাল আবার ট্যাক্সিটা যখন উমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ধীরে ধীরে চালিয়ে যাব ও হাত তুলে ডাকবে।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট সময় লাগিয়ে একটা নীল কি গোলাপী সিল্কে শরীর মুড়ে চোখে কাজলের পুরু প্রলেপ বুলিয়ে ও আমার ট্যাক্সিতে চাপবে। হুঁ সিনেমায় যাচ্ছে। আজ তিন মাস। সেই হোটেল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকার কামরা। অথচ আর সব ঘরে আলো।

ফুলের মত মেয়ে উমা।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তি, ন্যায় অন্যায়ের চর্চায় মাথা ঘামালে আমার চলছিল কি। হোটেলে পৌঁছে দেওয়া মাত্র একটা দশটাকার নোট। মিটার খরচ পাঁচ, আমার বখশিশ পাঁচ।

টাকাটা পকেটে পুরে লম্বা সেলাম জানিয়ে আর একবার উমার লম্বা ঘাড় মৌচাকের মত মস্ত খোঁপা ও সোনার বর্শার মত সুন্দর লম্বা হাত দুটো দেখে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি। ওই দেখাটুকুনই আমার লাভ।

উপরি পাওনা।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে, এখনো যে আমার ওই মেয়েটির পিঠ ছুঁয়ে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল সেটা নিতান্তই শাদা ইচ্ছা। হাই-এর সঙ্গে ওঠে নামে। এই ইচ্ছাকে আমি কোনদিনই কাজে পরিণত করব না; কোন ট্যাক্সিওয়ালাই করে না। লোকের মার পুলিসের হাঙ্গামা মামলা মোকদ্দমা যাহোক একটা কিছুর কথা ভেবে তারা ভীষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে সিগারেট টানে। সিগারেট টানে আর ঘড়ি দেখে। কখন সময় হবে। কখন সে এসে গাড়ি আলো করে বসবে আর বলবে, 'চালাও।'

আমিও তার অপেক্ষা করছিলাম। খাওয়ার পর আরো একটা সিগারেট শেষ হয়েছে। পুরো পঁচিশ মিনিট এখানে খেয়ে বসে বিশ্রাম করে কাটানো গেছে হিসাব করলাম।

'ওটা তোমার ট্যাক্সি?'

ঘাড় নাড়লাম।

আর অবাক হলাম বৌটিকে দেখে। হ্যাঁ, সুন্দর বলতে সুন্দর। সিঁদুরের রেখাটা অমন সরু করে না দিলে অত সরু চুলের সঙ্গে মানাত না। আর এমন সুন্দর চোখ। লম্বা সরু পালক ঘেরা দুটো দীঘি। জল টলটল করছে, জীবন। ব্লাউজের হাতায় আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে বেরিয়ে আসা কচি সবুজ সোনালী আঙুরগুচ্ছ। শাড়ির পাড় আছে। সূক্ষ্ম জড়ির কাজ। দূর থেকে বোঝা যায় না।

'বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালা আমার ভাল লাগে।' মেয়েটি বলল।

আমি চুপ করে হাসি।

লম্বা স্বর্ণচাপার মত দুটো আঙুল গলিয়ে বৌ বিলের টাকাটা কাউন্টারের ওধারে পাঠায় আর এক হাত দিয়ে মনি-ব্যাগটা বুকের মধ্যে ব্লাউজের ভিতর রাখে।

আমি ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিই। কেননা সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকা অসভ্যতা।

'ভারি সুন্দর গাড়ি তো!'

গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলল। মনে মনে বললাম, তোমার মত সুন্দরী মেয়েরাই তো আমার গাড়ির সওয়ার। ওরা রোজ বেরোয়, বেড়ায়। তুমি, তোমায় তো আর কোনদিন দেখিনি!

'এই ট্যাক্সিওয়ালা।'

ঘাডটা ফেরাই।

'কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করছ না তো?'

আহা, কী দাঁত।

আমার তো মনে হয় ঐ দাঁত দিয়ে যদি সে কামড়াতে চায় তো রাস্তায় সব পুরুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, হাত বাড়িয়ে দেবে, গলা কি আঙুল। কেটে আলগা করে দিক।

আমি দেখছিলাম ওর গাল।

হ্যারিসন রোডের দিক থেকে রোদের লম্বা রেখা ওর গালে গলায় পড়ছিল। ওর পাতলা চামড়ার তলার রক্তের লাল আভা দেখছিলাম। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিল তখন। সামনে রেড সিগন্যাল। এগোবার উপায় নেই। তাই তুজনের কথা বলার সুযোগ হল।

'লোয়ার সার্কুলার রোড বললেন না? ওই তো দক্ষিণ দিক।'

'হাঁ। তারপর বাঁয়ে। মিডল রোড।'

'ও দশ মিনিটে নিয়ে যাব।'

'আবার সেখান থেকে আমাকে এই গাড়িতে ফিরতে হবে। চারটের মধ্যে মাণিকতলায় ফেরা চাই। হরিতকী বাগান লেন।'

'তা হবে, খুব হবে, বিশ মিনিট লাগবে বড় জোর নর্থে ফিরতে।

ঘাডটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আবার সুন্দর চোখজোড়া দেখলাম। দেখলাম আর দরকার হলে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা যে কত ভদ্র মার্জিত গলায় জেনানাদের সঙ্গে কথা বলে প্রমাণ করতে আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'শেয়ালদার রিফিউজি হোটেলটায় খেতে বসে আপনি হঠাৎ যেভাবে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন তখনই বুঝে গেলাম আপনি গাড়ি খুঁজছেন। ট্যাক্সি চাই।'

একটু হাসলাম।

ওর একটু নিশ্বাস এসে আমার গলায় ও ঘাড়ে লাগল। ভাল লাগল। অবশ্য এগুলো আমাদের উপরি-পাওনা। গাড়ি একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেই মেয়েদের গায়ের গন্ধ এসে আমাদের গায়ে পিঠে লাগে। রাস্তা পরিষ্কার দেখে চট্ করে আমি তখন স্টার্ট নিয়েছি।

'চারটের মধ্যে ফিরতে পারলেই হল। ওখানে আমার বেশি দেরি হবে না। যাচ্ছি তো একটা কথা বলতে।'

'কার সঙ্গে ?'

'মার সঙ্গে।'

'ওখানে বুঝি আপনার মা থাকেন ? মিডল রোড কত নম্বর ?'

পাঁচ-এর পি কি সি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তা না পারলেও কার কাছে যাচ্ছে একবার একটা প্রশ্নের ঢিল মেরেই যে জেনে নিতে পারলাম জেনে সুখী হলাম। আমরা ট্যাক্সিওয়ালারা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে আগেই জেনে গেলে একটু বেশি খুশী মেজাজে গাড়ি চালাই তো।

'আর ওখানে বুঝি আপনার শ্বশুরবাড়ি মানে স্বামীর ঘর, হরিতকী-বাগান লেন ?'

কথা না কয়ে থুঁতনি নেড়ে বৌ হাসল। রামধনুর মত বাঁকা ভুরু টান করে ফিসফিসে গলায় বলল, 'ওটা আমার স্বামীর ঠিকানা। তোমরা ট্যাক্সিওয়ালারা চট্ করে বুঝে ফেল।'

'তা কেন পারব না, আমরা কি এ-লাইনে নতুন নাকি। আপনাদের কে কোথায় থাকেন আসা-যাওয়া দিয়ে আমাদের বুঝতে হয়। অনেক সময় ঠিকানা ভুলে যাবার পরও আন্দাজের ওপর আমরা গাড়ি চালাই।'

'হ্যাঁ, শেয়ালদা থেকেই ট্যাক্সি ধরব ঠিক করেছিলাম। ভীষণ খিদে পেল ট্রেন থেকে নেমে। ভুটো খেয়ে নিলাম। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ইস্ কী রান্না !'

'বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি ?'

'হুঁ, কাঁচড়াপাড়া। আমার ছোট ভাই আছে ওখানে। টি. বি.।'

'আজকাল টি. বি-র জ্বালায় প্রাণ ঝালাপালা। চারদিকে কেবল ওই।'

উত্তরে কি বলল ও বোঝা গেল না। কেননা একটু ফাঁকা পেয়ে গাড়ি জোরে চালিয়েছিলাম। তা ছাড়া এলোমেলো হাওয়া ছিল।

আর একটু পর। একটা বাঁক ঘুরতে সামনে প্রকাণ্ড ভেড়ার পাল

পড়ে গেল। রং করা ওদের গায়ের পশম। হাতে সময় আছে, তাড়া-তাড়ি ছুটব বলে পথ পেতে থামকা কতগুলো হর্ন দিয়ে স্টার হাউসের যাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করতে বাধল। বরং যতটা পারা যায় আস্তে, বেশ আস্তে গাড়ি চালিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাই।

'তোমার কি সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ট্যাক্সিওয়ালা। তা হলে গাড়ি থামিয়ে এইবেলা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পার।' বৌ তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'হাতে সময় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ি। স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। রাস্তায় চলতে এ ধরনের সহানুভূতিগুলি আমরা খুব পছন্দ করি।

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আজ রাতটা তা হলে মার কাছেই থাকবেন। ও-বাড়ি?'

'ও মা, কি বলছি, তোমায় ট্যাক্সিওয়ালা? এই গাড়িতেই যে আমাকে মাণিকতলা ফিরে যেতে হবে। চারটের সময় আমাকে হরিতকী-বাগান লেনে নামিয়ে দিতেই হবে।'

কথাটা মনে ছিল না তাই লজ্জায় হাসলাম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমার স্বামী খুব কড়া লোক। কোথাও একলা বেরোতে দেয় না। আজ ও একটু অফিসের কাজে বাইরে গেছে। বিকেলে ফেরার কথা। এই ফাঁকে ওদের দেখে নিচ্ছি। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'অঃ বাবা, আপনি তা হলে ভীষণ লোকের পাল্লায় পড়েছেন। সারাক্ষণ বাড়িতে?'

'সারাক্ষণ।'

চোখ জোড়া ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মেয়েটির।

'আমি যে কী সংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি তা যদি তোমরা বাইরের লোক একটু জানতে ট্যাক্সিওয়ালা, আমি কী ভীষণ লোকের ঘর করছি।'

নতুন করে স্টার্ট দেওয়াতে আমার গাড়ির ইঞ্জিন ধুক্‌ধুক্ করছিল। আমিও সেরকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম ভিতরে।

এই গাড়িতে চড়ে আমার এই ট্যাক্সির হাওয়া লাগিয়ে লাগিয়ে শহরের কত অসংখ্য মেয়ে আমোদ-ফূর্তি লুটছে তা যদি তুমি জানতে বৌ, রোজ—অবশ্য তারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক ঢের বুদ্ধিমতী।

কথাটা বললাম না।

কেননা আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের এসব ব্যাপারে নাক ঢোকাতে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সেই নরম বুক কতটা ওঠে নামে আড়চোখে সেটুকুন দেখে নিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিই, জোরে দুই হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরি। ভেড়ার দল সরে গেছে। ফাঁকা রাস্তা।

'আপনি যখন জানা হয়ে রইলেন তখন মাঝে মধ্যে দুপুরে আধ ঘণ্টা আমার ট্যাক্সিতে করে বেড়াতে বেরোতে পারেন। আপনার স্বামী অফিসে বসে মোটেই টের পাবেন না। কোন্ ফাঁকে কখন আপনাকে তুলে ঘুরিয়ে আবার কলে জল আসবার আগে হরিতকীবাগান লেনে রেখে এসেছি। মিডল রোড যান ইচ্ছা পার্ক সার্কাস যান, সময় মত নিয়ে যাব, আবার ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাড়ি ফিরিয়ে আনব।'

'আচ্ছা দেখা যাবে, সে দেখা যাবে।' বৌ বলল আর আমি আড়চোখে ওর লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বুকটা কতটা কাঁপে তা চুরি করে লক্ষ্য করি।

কেননা কাল হয়তো ওকে আর দেখতেই পাব না, কোনদিনই না।

'এবাড়ি ?'

'না, আর একটু চলো।'

আমি বললাম, 'যদি মন খুব খারাপ লাগে তো আজ রাতটা মার বাড়ি থেকে যান। একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই হল। মার অসুখ।'

'তোমরা যত সহজ মনে করো ট্যাক্সিওয়ালা তত সহজ না। ঘরের বৌয়ের বাইরে মানে স্বামীর ঘর ছাড়া আর কোথাও রাত কাটাতে হলে অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে নামতে হয়। যে-লোক সাত জন্মে শ্বশুর-বাড়ি যায় না, সে ছুটে তক্ষুণি এসে দেখে যাবে কতটা অসুখ, কী রকম অসুখ শাশুড়ীর।'

'বুঝতে পেরেছি,' আমি অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার শরীরটা আপনার স্বামীর কাছে একটা মদ বিশেষ, দামী নেশার মত। কিছুতেই আপনি না থাকলে ভাল লাগে না।'

অল্প হেসে বললাম আর দু'বার ঘন ঘন, ও দেখে ঠিক সে ভাবেই ওর গলার নরম পেশীর ওঠানামা দেখলাম।

সত্যি দামী শরীর বলে আমার এতটা লোভ হচ্ছিল মেয়েটির ওপর, কিন্তু কি করি উপায় কি, কতটা আর করতে পারে একটি যুবতী মেয়েকে একলা

গাড়িকে নিয়ে যখন শহরের ট্যাক্সিওয়ালারা চলে। একটা বাড়ির নম্বর দেখে ওরে আর একটা মোচড় দিয়ে এগোই। 'এ বাড়ি?'

'বেঁধে।'

হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে ও নামল। 'তুমি দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি কথা সেরে আসছি।'

আমি গলা বাড়িয়ে আবার ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম। কেন জানি আমার তখন গরম ফাউলকারীর কথা মনে পড়ে গেল।

মুখটা ফেরানো ছিল। চিবুকের ধারটা দেখে আপেলের টুকরোর কথা মনে পড়ল। আর টুসটুসে আঙুর!

আহা পৃথিবীর সেরা আঙুর ভেবে সারারাত চুষে ছিবড়ে করে ফেললেও রস যাবে না, ভাবলাম।

কিন্তু ভেবে কি আর আমি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলাম। শতকরা নিরানব্বই জন ট্যাক্সিওয়ালার মত ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করে একটু ঘুরিয়ে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে রাখলাম উল্টো দিকে মুখ করে।

হ্যাঁ ওর শরীরের ওপর বেশি লোভ করেছিলাম বলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই দাঁড়াল। দেখুন কী সব ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনে! আমি তো ভাবছিলাম মার সঙ্গেই দেখা করে ও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। চোখে জল। নীল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে!

কিন্তু তা না। শাদা কাঠের গেট-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক চিৎকার করছিল। হ্যাট্‌ পরা! সাহেব মানুষ। যেন এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরছে কি এখন বাইরে যাবে।

তা অত সব চিন্তা করার সময় ছিল না।

আমি কথা শুনছিলাম দুজনার।

ট্যাক্সিওয়ালাদের দাঁড় করিয়ে আপনারা যেমন কথাবার্তা বলেন।

'বাড়িতে আর কোনদিন তোমাকে দেখলে আমি ঠিক গুলী করব, চিত্রা।'

'আমার গ্রাসাচ্ছাদনের যতদিন না সুব্যবস্থা হয় তদ্দিন আমাকে আসতে হবে।'

'না চরিত্রহীন স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিতে আমি বাধ্য নই।'

'বেশ তাহলে আমি কোর্টে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যাও আমি তাই চাই। একটা প্রষ্টিটিউট এসে মোকদ্দমা করে মহীতোষ রায়ের কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করবে। বেশ তো, তাই একবার চেষ্টা কর।'

বলে মহীতোষ রায়, সেই হ্যাটকোট পরা ভদ্রলোক সযত্নে কাঠের গেট্‌টায় একটা তালা পরিয়ে দিয়ে গট্ গট্ করে ভিতরে চলে গেলেন।

চিত্রা ঘুরে এসে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিতে ভিতরে ঢুকল। 'চালাও।'

এ সময়টা আমরা বিশেষ কথাবার্তা বলি না। কিন্তু তবু স্টার্ট দেওয়ার পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল রুমাল দিয়ে চোখটা এখনো টিপে আছে কি না।

'এই ট্যাক্সিওয়ালা।'

খানিকটা অগ্রসর হবার পর, ও আমায় আস্তে ডাকল। ঘাড ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। রুমাল সরে গেছে। চোখের কোণ শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে আছে।

'তুমি তো দাঁড়িয়েছিলে কাছে, কথাগুলো শুনলে?'

কথা বললাম না। সামনে এবার একপাল মোষ। রাস্তাটা কালো হয়ে গেছে।

'ও আমাকে গুলী করে মারবে।'

যেন কিছুই হয়নি, এসব কথার কোন দাম নেই, এরকম একটা ভান সময় সময় আমাদের করতে হয়। গাড়িটা একেবারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অল্প হাসলাম: 'ও কিছু না। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দু'দিনেই মিটে যাবে।'

বললাম, বলতে হয় আমাদের এসব।

কিন্তু দেখলাম সে কথায় বৌটির কান নেই। এক দৃষ্টে রাস্তার ধারের একটা বাদাম গাছের গুড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবছে। জায়গাটাও নির্জন।

মোষেরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

'না মিটবে না, এ ঝগড়া মিটবার নয় তা সে-ও জানে আমিও জানি।' তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট ধরা গলায় ও যেন নিজের মনে

কথাগুলো বলল, তারপর হঠাৎ এক সময় মুখটা ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ট্যাক্সিওয়ালা!'

'কি, বলুন।'

'ও আমায় ঘৃণা করে। কিন্তু আমিও যে ওকে ঘৃণা করি তা কি সে বোঝে না?'

আমি হাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মেয়েটির গলার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শব্দ হতে শুনলাম যে চমকে উঠলাম।

'গুলী করবে, সামান্য ক'টা টাকা চাইতে গেছি বলে তোমার সামনে, একজন ট্যাক্সিওয়ালার সামনে আমাকে অপমান করল, উঃ, কিন্তু, কিন্তু—সে কি মনে করে—'

আমি হতভম্ব হয়ে ওর কাণ্ড দেখলাম।

'কোথায় গুলী করবে, এখানে এই বুকে, এই বুকের মাংস ঝাঁজরা করে দেবে মহীতোষ!' উপেক্ষার হাসি হেসে দ্রুত ব্যস্ত আঙুলে ব্লাউজের সব ক'টা হুক ও খুলে ফেলল। 'হ্যাঁ, তোমায় দেখাচ্ছি, তোমার সামনে অপমান করল কি না, তুমি দেখে রাখ, আমার এই বুক লক্ষ টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা রাখে কি না—সামান্য ক'টা টাকা, সামান্য ক'টা—উঃ, এত অপমান!'

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও বিমূঢ় বা বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে শরীরটাকে শক্ত কঠিন করে আমি ইঞ্জিনের দিকে ঘুরে বসার উপক্রম করতে ও আমার হাত চেপে ধরল। এবার বিব্রত হয়ে পড়লাম। ব্লাউজের মুখটা হা করে আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে দুটো পেশী শক্ত হয়ে উঠে আবার জেলীর মত নরম হয়ে যাচ্ছে।

এতৎ সত্ত্বেও হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ততক্ষণে ও আমার হাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। গরম জল টের পেলাম। কান্নার ঠমকে সেই সুন্দর র‍্যাঁদা করা পিঠ অনেকবার উঠল নামল।

কিন্তু তা দেখবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই আমার ছিল না। তিক্ত গলায় বললাম, 'তা অত ঘৃণা যখন, ওখানে গিয়েই বা কাজ ছিল কি—' বলছিলাম, কিন্তু এমন অস্পষ্টভাবে কথাটা মুখ থেকে বেরোল যে ও শুনল বলে মনে হল না।

হেঁচ্‌কা টান মেরে হাতটা এবার ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা গলায় বললাম, 'ভাল কথা, এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলছেন না তো, সেই হরিতকী বাগান লেনের ঠিকানায় কি ট্যাক্সি—'

আমার কথা শেষ হবার আগে ও চোখে নীল রুমাল গুঁজে মাথা নাড়ল। তারপর রুমাল সরিয়ে নিয়ে অল্প হেসে বলল, 'বেশ্যার আবার ঠিকানা কি, ট্যাক্সিওয়ালা।'

আপনারা ভাবছেন সেই মদির হাসি দেখে আমার বুকের ভিতরটা তির্‌ তির্‌ করে উঠবে, কিন্তু তা হয় না, আমরা হতে দিই না। তৎক্ষণাৎ ব্রেক্‌ কষে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবং মুখের ওপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি, ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারবে?'

'না।'

'তবে এক্ষুণি নেমে পড।' কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে দিই। আর আমার মুখের দিকে তাকায়নি, ঘাড় নিচু করে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোরে গাড়ি চালিয়ে সার্কুলার রোডে উঠে এলাম। তেল না, জল, তাই ট্রাউজারে হাতটা ঘষে তা মুছে ফেলতে অসুবিধা হল না।

॥ ট্যাক্সিওয়ালা ॥

রমণী | সুশীল রায়
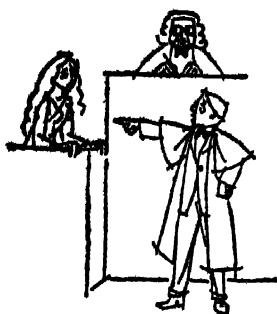
মনোরমা রেণুকা শিবানী ছায়া গৌরী—সকলেই দেখা করতে আসে রোজ। গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে তারা কুশল জিজ্ঞাসা করে বিন্দুর।

বিশেষ কোন কথা বলে না বিন্দুবাসিনী। চুপ করে চেয়ে থাকে এদের মুখের দিকে। অপরাধিনীর মত চেয়ে থাকে সে।

কিন্তু তার কোন অপরাধ আছে বলে সে জানে না। অথচ, তাকে এনে আটক করা হয়েছে এখানে।

'আবার পনেরো দিন বাদে বুঝি দিন পড়ল?' জিজ্ঞাসা করল শিবানী।

বিন্দুবাসিনী উত্তর দিল না। কিন্তু মন্তব্য করল গৌরী, বলল, 'সবাই তো জান ভাই তোমরা। কতদিন বাদে দিন পড়ল, তা তো জানই। অযথা ওসব তামাশা কেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বয়স্কা মনোরমা, শাড়ির পাড় দিয়ে ঠোঁটের পানের দাগ মুছতে-মুছতে বলল, 'কম দিন হল না এ লাইনে। একটি জীবনই কাটিয়ে ফেললাম, কিন্তু এমনটি কখন দেখিনি মাইরি। কতজন এসে আমাদেরই খুন করে গেল। কেউ বা হিংসেয় জ্বলে, কেউ বা গয়নার লোভে। কিন্তু ঘরে এসে নিজে খুন হয়ে গেল—একথা কে বিশ্বাস করবে?'

'তুমি বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু হাকিম ?' ছায়া বলল, 'হাকিম যদি বিশ্বাস না করে তবে তো হয় ।'

'হাকিমের বিশ্বাস তো সাক্ষী-সাবুদের উপর। বিন্দুর তো কোন সাক্ষী নেই।' আক্ষেপের সুরে বলল মাঝবয়সী রেণুকা।

তারা দুঃখ জানাচ্ছে, আক্ষেপ জানাচ্ছে, তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, তারা একটু হা-হুতাশও করছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ করে তাদের এই সহানুভূতি ও সমবেদনা সেই বিন্দুবাসিনী একেবারে নীরব ও নির্বিকার।

গরাদের ওপরে পাথরে-খোদাই-করা একটা মূর্তির মত সে অনড় ও অটল। তার জীবনে ঘটে গিয়েছে এই অঘটন, এর জন্যে অনুশোচনা সে করছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না তার মুখ দেখে। অথচ, মনে-মনে সে মানছে যে পাপ সে করেনি। যে-ব্যবসায় করে তার জীবিকার্জন তাকে লোকে ঐ নাম অবশ্য দেয়, তা দিক ; তা নিয়ে তার কোন নালিশ নেই। কিন্তু যে ঘটনার জন্যে আজ সে এখানে বন্দিনী, সে-ঘটনার জন্যে তার কোন অনুতাপ নেই। এর জন্যে কঠিন সাজা যদি লেখা থাকে তার ভাগ্যে তাহলে কেবল দুর্ভাগিনী বলেই সে মনে করবে নিজেকে। এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এর বেশি সাজা কি তার আর দরকার আছে ? এই তো খুব হল, এই তো খুব হচ্ছে। আর ঐ লোকটা, যার জন্যে সে এই নাকাল, সেও কি সাজা কম দিয়েছে তাকে। বেঁচে থেকে জালিয়েছে, মরে গিয়েও রেহাই দিচ্ছে না লোকটা এই বিন্দুবাসিনীকে।

আর জন্মে শত্তুর ছিল।

আর জন্মে যে শত্তুর ছিল, এ জন্মে সে সোয়ামী হয়ে আসেনি বটে, কিন্তু বিন্দুবাসিনী তাকে বড মান্য করত , লোকটার মান-ইজ্জত নিয়ে বড় হুঁশিয়ার ছিল বিন্দু। যেমন তেমন লোক তো নয় সে, তার ঘরে আসত বলে লোকটা খাটো ছিল না। তার ঘরে আসে বলে কেউ তাকে খাটো মনে না করে, এইজন্যে খুব আড়াল করে রাখত তাকে বিন্দুবাসিনী।

সে যে কি ছিল, আর কে ছিল—এখন তো সবাই তা জেনে ফেলেছে। শিবানী-রেণুকা-ছায়া-গৌরী মনোরমারা তো কাণ্ড দেখে অবাক। লোকটা মারা গিয়েছে শুনে দলে-দলে লোক এল ফুলের মালা নিয়ে, তাদের পাড়াটা মাড়িয়ে দিল তারা ; তাক লাগিয়ে দিল সকলকে। কেউ জানত না যে এমন লোক আসে এই পাড়ায়, কেউ জানত না বিন্দুবাসিনী এতবড় ভাগ্যবতী।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর নাম সকলেই জানেন। তাঁর মৃত্যুর খবরও সকলেই জানেন। আমরা বলছি অধ্যাপক অপূর্বকান্তি মুস্তাফির কথা। এবার বোধ হয় ব্যাপারটা আপনাদের কাছে খোলসা হল।

তাঁর মৃত্যুর যে খবর বেরিয়েছে তাতে অনেক খবর বলা হয়নি তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্যেই। তিনি যে একজন প্রবীণ ও প্রাচীন অধ্যাপক, তাঁর সম্মান যে কেবল ছাত্রমহলেই না, তাঁর সম্মান যে অনেকটা দেশব্যাপীই—একথা নতুন করে বলবার মানে হয় না। এই দার্শনিক ও আত্মভোলা অধ্যাপকের জীবনদর্শন নিয়ে অনেক পত্রিকাতেই অনেক প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তার কিছু কিছু আপনারা পড়ে থাকবেন। যাঁরা তাঁর লেখা বা তাঁর সম্বন্ধে লেখা পড়েননি, তাঁরাও তাঁর নাম জানেন এবং তাঁর নামের ওজন বোঝেন—এইটুকুই আনন্দের কথা।

তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্যে তাঁর মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে যেসব কথা বলা হয়নি, সেই সব কথা ফাঁস করে দেবার জন্যেই যে আজ এই লেখনী ধারণ করা হয়েছে, একথা কেউ যেন না মনে করেন।

আমরা কলম ধরেছি কেবল বিন্দুবাসিনীর কথা বলার জন্যে।

একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে বিন্দু। মামলার বিচারে কি দাঁড়াবে, সেকথা আমরা বলতে পারিনে। কিন্তু বিন্দু এখনো বন্দিনী, সে এখন পুলিসের হেফাজতে। কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা তার বারণ।

রেণুকা-শিবানী-মনোরমারা আসে, পুলিস পাহারায় তারা গারদের এ-পাশে দাঁড়িয়ে দেখা করে যায় তার সঙ্গে। হয়তো কোন কথা তারা বলে, কিন্তু কোন কথার জবাব দেয় না বিন্দুবাসিনী।

সে ভাবে, সে ভাবে তার জীবনের কথা। শিশুকালের কথা তেমন মনে পড়ে না, কৈশোরের কথাও বুঝি ভুলে গিয়েছে সে। সেভাবে তার যৌবন-কালের কথা। কি'করে, কোন্ ঘটনায় বা কোন্ দুর্ঘটনায় সে এসে পৌছল এই জীবনে—যে জীবনকে লোকে ঘৃণা করে অথচ সেই ঘৃণ্যজীবন যারা যাপন করে তাদের উপর লালসা যাদের প্রচুর—এসব কথা বলতে সে আর চায় না। এসব কথা সে বলেছে অনেক, অনেক—অনেক লোকের কাছে, অনেক, অনেক—অনেক রাত্রি জেগে জেগে; সেসব কথার বেশির ভাগই বানানো, যে যেমনটি শুনলে খুশী হয় তার কাছে তেমনটি করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা। তার জীবন দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু তার নিজের কাছে

তার জীবন একটা বিস্ময়। কখনো দুঃসহ কখনো ক্লান্তিকর, কখনো বা অসহ্য ঠেকেছে বটে নিজের জীবনটা ; অথচ তখনই সে ভেবেছে সে যদি তার জীবন কাটাত একটা কুলবধূ হয়ে, তবে লোকের কাছে হয়তো কিছুটা মর্যাদা পেত, কিন্তু তার লোকসান হয়ে যেত বিস্তর।

আর্থিক লোকসানের কথা ভাবছে না বিন্দু। সে ভাবছে অন্ত কথা। সে ভাবছে—জীবনে এত মানুষ দেখা হত না, এত বিচিত্র মানুষ।

অনেক দেখেছে সে, অনেক জেনেছে। দেখতে দেখতে আর জানতে-জানতে তার যৌবনের দিন-কটা প্রায় পার হব-হব করছে, এমনি একদিন রাত্রে তার দরজায় কে যেন টোকা দিল।

খোঁপাটা জড়িয়ে নিয়ে, গায়ের কাপড় একটু সামলে, দরজা খুলে দাঁড়াল বিন্দু।

দরজার ওপারে এক প্রবীণ পুরুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, হাতে লাঠি, কাঁচা-পাকা গোঁফ দিয়ে উপরের ঠোঁট একটু ঢাকা, মোটা চশমায় চোখ-দুটোও ঢাকা।

খুব চেনা চেনা লাগল বিন্দুর এই লোকটাকে। বলল, 'আসুন।'

ঘরে গিয়ে সমাদর করে তাকে বসাল বিন্দু। তার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

তাকিয়ার উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে অপূর্বকান্তি বললেন, 'হাসছ যে!'

'খুব চেনা লাগছে। তাই। এর আগে এ-ঘরে কখনো আসা হয়েছিল ?'

'উঁহু।'

'তবে এ-পাড়ায় অন্ত কোন ঘরে ?'

'না তো।'

তবে এত চেনা লাগার মানে ? বিন্দু অনেকক্ষণ ধরে ভাবল !

অপূর্বকান্তি গলার চাদরটা নামিয়ে বললেন, 'এসো, বসো।'

তাঁর গায়ের উপর গা এলিয়ে বসে পড়ল বিন্দু।

সে আজ বারো বছর আগের ঘটনা।

অপূর্বকান্তিকে অমন চেনা লাগার কারণ বুঝতে বেশিদিন সময় লাগল না বিন্দুর। কাগজে-কাগজে এই মুখটার ছবিছাপা হয়েছে কতবার, কতবার তা চোখে পড়েছে বিন্দুর।

যেদিন পুরো পরিচয়টা বিন্দু জানতে পারল, সেদিন অহঙ্কার যেন তার

ধরে না। তার জীবন তার কাছে বুঝি ধরুই না. তার জীবন তার কাছে যেন মূল্যও হয়ে উঠল।

বিন্দু শাড়ির আঁচলটা ঘাড়ের উপর পেঁচিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনিই তিনি?'

অপূর্বকান্তি হেসে বলেছেন, 'আমিই আমি।'

সে তো বারো বছর আগেরই কথা হল।

অপূর্বকান্তি বলেছিলেন, মনে পড়ে বিন্দুবাসিনীর—তিনি বলেছিলেন, 'তুমি বুঝি কাগজপত্র পড?'

'পড়িই তো! রাতের বেলা তো আসেন আপনারা। সারাটা দিন করি কি? মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক—যখন যা জোটে পাতা ওলটাই।'

'তুমি এমন পণ্ডিত তা জানলে তো আসতাম না হে তোমার কাছে। আমি ফাঁস হয়ে গেলাম?' অপূর্বকান্তি বুঝি আতঙ্কের সঙ্গেই বলেছিলেন।

তাঁর কথা শুনে বিন্দু হেসেছিল, বলেছিল, 'আমার কাছে হোক না ফাঁস। আর কারও কাছে ফাঁস না হলেই তো হল?'

বারো বছর আগের সেই কথা রক্ষা করতে গিয়েছিল বিন্দুবাসিনী। আজ বুঝি সে ফাঁসির আসামী।

এই বারোটা বছর প্রতি রাত্রে অপূর্বকান্তি নিয়মিত এসেছেন। রাত্রি দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর দরজায় তাঁর হাতের টোকা পড়ত। রাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা টেনে দিয়ে বিদায় নিতেন অপূর্বকান্তি মুস্তাফি।

ইদানীং বড় ক্লান্ত বড অবসন্ন আর বড বিষণ্ণ দেখাত অপূর্বকান্তিকে।

'শরীর ভাল না বুঝি?' জিজ্ঞাসা করত বিন্দুবাসিনী।

লাঠিটা দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতে-রাখতে, গলার চাদরটা বিন্দুর হাতে দিতে দিতে অপূর্বকান্তি বলতেন, 'আর কতদিন ভাল থাকবে শরীর। বয়সটা হল কত?'

'ষাট ষাট।' পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বিন্দুবাসিনী বলেছেন, 'ও কথা ভাবতে নেই। বয়সের গাছপাথর নেই, এমন কত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ আর এমন কী বয়স হয়েছে?'

হাসতেন অপূর্বকান্তি। কথাটা যে হাসির, সেজন্যে হয়তো নয়; এ ধরনের কথা এসব তল্লাটে শোনা সহজ না, তবু সেই কথা এমন আন্তরিকভাবে বলায় তাঁর একটু হাসি পেত। হাসি পেত হয়তো নিজের কথা ভেবেই। চোদ্দ বছর আগে বিপত্নীক হয়েছেন তিনি। একটা অভ্যস্ত জীবন থেকে

একটা অভ্যাস সরে যাওয়ায় কেমন ফাঁকি আর ফাঁকা ঠেকত নিজেকে। সেই ফাঁক পূরণ করতে গিয়ে তিনি বুঝি পড়ে গিয়েছেন একটা ফাঁদে। হয়তো এই কথা ভেবেই হাসি পেত তাঁর।

বিন্দু বলেছে, 'নিজের কথা ভেবে আমার হাসি পায়। কত নাম আপনার, কত সম্মান। আর আপনি কিনা আমার কাছে? এটা বুঝি আমার ভাগ্য।'

দুজনেই হয়তো দুজনের ভাগ্য ভাগাভাগি করতে থাকে। এটা আমাদের কাছে হয়তো খুবই হাস্যকর ঘটনা, কিন্তু ওদের কাছে এ ব্যাপারটা কিছুতেই হাসির না।

তেমহলা বাড়ির নীচের তলার একটা ঘর বিন্দুর। অপূর্বকান্তি চলে যাবার পর অনেকদিন মনোরমারা হুটপাট করে এসে ঢুকেছে তার ঘরে দোতলা-তেতলার ঘর থেকে। এসেই জিজ্ঞাসা করেছে, 'কে আসে রে রোজ ওই বুড়োটা। কিসের সোয়াদে অতটা সময় কাটাস তুই ওর সঙ্গে?'

বিন্দু হেসেছে, বলেছে, 'আমিও তো জোয়ান নই রে আর। বয়স কত হল?'

'ষাট, ষাট। বালাই বালাই।' মনোরমা বিন্দুর থুতনিতে হাত দিয়ে বলেছে, 'মেয়েমানুষের আবার বয়স আছে নাকি? যতদিন জীবন ততদিন যৌবন।'

কে এসেছে তার ঘরে তা কেউ জানেনি। এতটা কাল ধরে বিন্দু আগলে রেখেছিল। কিন্তু, তার আক্ষেপ এই, শেষ পর্যন্ত—

হাকিম বললেন, 'কি হল শেষ পর্যন্ত খুলে বল।'

আজ আবার আদালতে হাজির হতে হয়েছে তাকে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে বিন্দুবাসিনী।

ওপাশে সার বেঁধে বসে আছেন জুরির দল। এক পাল বুড়ো। ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে অপূর্বকান্তির কথা মনে হল বিন্দুর। ঠিক অমনি বুড়ো হয়েছিলেন তিনি।

হাকিমের হুকুম শুনে বিন্দু বলল, 'আমি তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। প্রাণে বাঁচাতে পারব না জানি। মানে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

উকিল ধমক দিয়ে বললেন, 'হেঁয়ালি রেখে দাও। কি হল বল।'

'অত মানী লোক। তাঁর মান বাঁচাতে—'

আবার ধমক দিলেন উকিল, কথার সোজাসুজি উত্তর চাইলেন।

বিন্দু বলল, 'বড় অসুস্থ ছিলেন কয়েকদিন থেকে। আসতে আমি বারণ করেছি। কথা শোনেননি। সেদিন রাত্রে ঘরে ঢুকেই হাঁফাতে লাগলেন। পাখার হাওয়া দিলাম। চোখে-মুখে জল দিলাম। একটু পরে দেখি, সাড়া নেই, শব্দ নেই, সব ঠাণ্ডা।'

'অসম্ভব অবিশ্বাস্য।' বাধা দিয়ে উঠলেন উকিল।

হাতুড়ি পিটে হাকিম বললেন, 'বল।'

বিন্দু বলল, 'রাত তখন সাড়ে দশটা। কি করব ভেবে পেলাম না। বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, অমন মানী লোকের মান বাঁচাবার জন্যে কি করব ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে বেজে গেল রাত দুটো। নিশুতি হয়ে এল পল্লী। দোকানের আলো নিবল। আমি ঐ ধড় টেনে তুলে নিয়ে—'

'কেন? হোয়াই?'

'একটু দূরে রাস্তার মোড়ে শুইয়ে রেখে আসার জন্যে—'

'আনবিলিভেব্‌ল। অবিশ্বাস্য।'

বিন্দু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল যে, মারা তো তিনি গেলেনই, কিন্তু তার ঘরে তাঁর মৃত্যু ঘটল—এটা সকলকে জানিয়ে লাভ। তাঁর মত মানুষের কি তাতে মান বাড়বে?

অট্টহাস্য করে উঠল আদালতে জমায়েত জনতা। মনোরমা-শিবানী-রেণুকা-ছায়া-গৌরীর দল কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বিন্দু একটু দম নিয়ে বলল, 'একটুর জন্যে ধরা পড়ে গেলাম। টহলদারি পুলিস আমাকে দেখে ফেলল। যা ফাঁস হবে না ভেবেছিলাম, তা ফাঁস হয়ে গেল ধর্মাবতার।'

উকিল বললেন, 'একেবারে সত্যি কথার মত শোনাচ্ছে, মাই লর্ড। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দি স্টেটমেণ্ট ইজ ফল্‌স্‌ অ্যাণ্ড ফেব্রিকেটেড।'

জুরিদের নিয়ে হাকিম তাঁর খাস কামরায় চলে গেলেন পরামর্শের জন্যে। আমরাও আর অপেক্ষা না করে আদালত ত্যাগ করলাম।

মামলার রায় কি হল, সে কথা আর লিখে লাভ নেই। খবরের কাগজে আপনারা তা দেখেছেন।

। দেশ: ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ ।

জামাই | নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গভর্নমেণ্ট প্রেসের বড় অফিস বাড়িটার সামনে দশটা বাজতে না বাজতেই পানের পুঁটলি নিযে এসে বসল প্রমদা। এত সকালে বাবুরা পান খায় না। অন্য কেউ এসে যে তার জায়গা দখল করে বসবে তেমন আশঙ্কাও নেই। তবু প্রমদা সকাল সকালই আসে। বিক্রী তেমন হোক আর না হোক অফিসের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায বসে থাকে। বযস বছর পঁযতাল্লিশেক হবে। কিন্তু চেহারায আরো বেশি বুড়ি বলে মনে হয়। চুলে পাক ধরেছে। রোগা লম্বা দেহটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। বেশ-বাসের ওপর কোন-রকম লক্ষ্য নেই। চুলপেড়ে শাদা একখানা আধময়লা ধুতি পরনে। গায়ে কোথাও কোন গযনা নেই। অথচ একটু যত্ন নিলে দেহ এখনো সুন্দর দেখায় প্রমদার, লক্ষ্য করলে চোখে-মুখে বিগত যৌবনশ্রীর এখনো কিছুটা আভাস মেলে।

ভাগ্য ভাল। অফিসে ঢুকবার আগে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দুজন যুবক আজ সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পান হবে?'

'হবে বাবা।'

আবার ধমক দিলেন উকিল, কথার সোজাসুজি উত্তর চাইলেন।

বিন্দু বলল, 'বড় অসুস্থ ছিলেন কয়েকদিন থেকে। আসতে আমি বারণ করেছি। কথা শোনেননি। সেদিন রাত্রে ঘরে ঢুকেই হাঁফাতে লাগলেন। পাখার হাওয়া দিলাম। চোখে-মুখে জল দিলাম। একটু পরে দেখি, সাড়া নেই, শব্দ নেই, সব ঠাণ্ডা।'

'অসম্ভব অবিশ্বাস্য।' বাধা দিয়ে উঠলেন উকিল।

হাতুড়ি পিটে হাকিম বললেন, 'বল।'

বিন্দু বলল, 'রাত তখন সাড়ে দশটা। কি করব ভেবে পেলাম না। বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, অমন মানী লোকের মান বাঁচাবার জন্যে কি করব ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে বেজে গেল রাত দুটো। নিশুতি হয়ে এল পল্লী। দোকানের আলো নিবল। আমি ঐ ধড় টেনে তুলে নিয়ে—'

'কেন? হোয়াই?'

'একটু দূরে রাস্তার মোড়ে শুইয়ে রেখে আসার জন্যে—'

'আনবিলিভেব্‌ল। অবিশ্বাস্য।'

বিন্দু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল যে, মারা তো তিনি গেলেনই, কিন্তু তার ঘরে তাঁর মৃত্যু ঘটল—এটা সকলকে জানিয়ে লাভ। তাঁর মত মানুষের কি তাতে মান বাড়বে?

অট্টহাস্য করে উঠল আদালতে জমায়েত জনতা। মনোরমা-শিবানী-রেণুকা-ছায়া-গৌরীর দল কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বিন্দু একটু দম নিয়ে বলল, 'একটুর জন্যে ধরা পড়ে গেলাম। টহলদারি পুলিস আমাকে দেখে ফেলল। যা ফাঁস হবে না ভেবেছিলাম, তা ফাঁস হয়ে গেল ধর্মাবতার।'

উকিল বললেন, 'একেবারে সত্যি কথার মত শোনাচ্ছে, মাই লর্ড। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দি স্টেটমেণ্ট ইজ ফল্‌স্‌ অ্যাণ্ড ফ্রেব্রিকেটেড।'

জুরিদের নিয়ে হাকিম তাঁর খাস কামরায় চলে গেলেন পরামর্শের জন্যে। আমরাও আর অপেক্ষা না করে আদালত ত্যাগ করলাম।

মামলার রায় কি হল, সে কথা আর লিখে লাভ নেই। খবরের কাগজে আপনারা তা দেখেছেন।

। দেশ: ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ ।

জামাই | নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গভর্নমেণ্ট প্রেসের বড় অফিস বাড়িটার সামনে দশটা বাজতে না-বাজতেই পানের পুঁটলি নিয়ে এসে বসল প্রমদা। এত সকালে বাবুরা পান খায় না। অন্য কেউ এসে যে তার জায়গা দখল করে বসবে তেমন আশঙ্কাও নেই। তবু প্রমদা সকাল-সকালই আসে। বিক্রী তেমন হোক আর না হোক অফিসের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকে। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশেক হবে। কিন্তু চেহারায় আরো বেশি বুড়ি বলে মনে হয়। চুলে পাক ধরেছে। রোগা লম্বা দেহটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। বেশ-বাসের ওপর কোন-রকম লক্ষ্য নেই। চুলপেড়ে শাদা একখানা আধময়লা ধুতি পরনে। গায়ে কোথাও কোন গয়না নেই। অথচ একটু যত্ন নিলে দেহ এখনো সুন্দর দেখায় প্রমদার, লক্ষ্য করলে চোখে-মুখে বিগত যৌবনশ্রীর এখনো কিছুটা আভাস মেলে।

ভাগ্য ভাল। অফিসে ঢুকবার আগে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দুজন যুবক আজ সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পান হবে?'

'হবে বাবা।'

'তাহলে দাও দুটো।'

সঙ্গীটি বলল, 'আঃ, আবার আমার জন্যে নিচ্ছ কেন, সুকুমার? আমি পান খাব না।'

সুকুমার বলল, 'আহা, খাও না শুভেন্দু, বেশ ভাল পান।'

শুভেন্দু বলল, 'তাহলে দাও। কিন্তু জর্দা-টর্দা দিও না যেন।'

প্রমদা পান সাজতে-সাজতে যুবক দুটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'জর্দা না খেলে দেব কেন বাবা।'

সুকুমার বলল, 'আমারটায় দাও। ওরটায় দিয়ো না। খাওয়া তো ভাল, জর্দার নাম শুনলেই আমাদের শুভেন্দুর মাথা ঘোরে।'

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ, কি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দাম চুকিয়ে দিয়ে সুকুমার একটু সরে এসে সিগারেট ধরাল।

শুভেন্দু বলল, 'পানওয়ালীদের মুখে অমন বাবা বাবা শুনতে আমার বড় খারাপ লাগে।'

সুকুমার একটু হেসে বলল, 'কি করবে বলো, ওর বাবু ডাকবার বয়স তো আর নেই।'

শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ। কিন্তু বয়স না থাকলেও তাকাবার ভঙ্গিটি প্রায় তেমনি আছে। পান সাজতে সাজতে আমাদের মুখের দিকে কি রকম করে বার-বার চাইছিল দেখলে তো?'

সুকুমার বলল, 'দেখেছি। শুধু তোমার মুখের দিকে নয়, তোমার আমার বয়সী সকলের মুখের দিকেই ও অমনি করে তাকায়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। প্রমদা ওর জামাইকে খোঁজে।'

হাসতে গিয়ে সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'জামাই মানে?'

গলাটা একটু চড়ে গিয়েছিল শুভেন্দুর। সুকুমার তার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আস্তে হে আস্তে। শুনতে পাবে। চল, এবার ভিতরে চল।'

রাস্তা পার হয়ে দুই বন্ধু অফিসে গিয়ে ঢুকল। একদল মেয়ে ঢুকল তারপর। তাদের পিছনে-পিছনে আর-একদল ছেলে। প্রমদা পান-সাজা থামিয়ে তাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর ফের

নিজের কাজে মন দিল। শুনতে সে পেয়েছে। চোখের মত কানও আজকাল তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে প্রমদার। কে কি বলে না-বলে সব সে বুঝতে পারে। প্রমদা সব ছাখে, সব শোনে, সব টের পায়। লোকে ভাবে আগের মত এখনো বুঝি তার মাথা খারাপই আছে। ওদের ভুল। প্রমদার মাথা অনেক দিন হল ফের ঠিক হয়ে গেছে। আজকাল তার সব মনে পড়ে।

মনে পড়ে সেই কৃপানাথ দে-র গলি। দোরের সামনে রাতের পর রাত সেই আগন্তুকের জন্ত অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়ান। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা-বাদল নেই, পথে এসে দাঁড়াতেই হবে। মাস-মাস ভাড়া না পেলে বাড়িওয়ালী ছাড়ে না। পোড়া পেটের তাগিদও কি কম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত না প্রমদাকে। মানদা-মোক্ষদাদের তুলনায় ওর ঘরে লোকজন ঘন-ঘনই আসত। রূপ স্বাস্থ্য বয়স বুদ্ধি দলের মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। নিত্য নতুন ধরনের সাজসজ্জা করত প্রমদা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর লেপে শাঁখা চুড়ি পরে কোনদিন কুলবধূ হত, কোনদিন বা কুমারীর বেণী পিঠে লুটিয়ে পড়ত।

মানদা মুখ ঘুরিয়ে বলত, 'ঢং। তুই থিয়েটারে গেলেই পারিস। এখানে পড়ে মরছিস কেন।'

মালতী বলত, 'সোনাগাছিতে চলে যা। ছ বছর বাদে বড় রাস্তার ওপর বাড়ি তুলতে পারবি। এই এঁদো গলিতে পড়ে মরছিস কেন।'

প্রমদা হেসে জবাব দিত, 'তোদের জ্বলে মরা দেখব বলে।'

তারপর তেইশ বছর বয়সে বকুল কোলে এল প্রমদার। বাড়িওয়ালী বলল, 'এতদিনে তোর দুঃখ ঘুচলো পেরমো। পেট থেকে পড়তে না-পড়তেই যা চোখ-মুখ বেরিয়েছে, তোর চেয়ে লাখো গুণে রূপসী হবে। সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে খেতে পারবি।'

মোক্ষদা বলল, 'একেই বলে ভাগ্যি। আমাদের ঘরে ব্যাটাছেলে পাঠিয়ে ভগমান ওকেই মেয়ে দিলে। দেবে না? সে-ও তো একচোখো পুরুষের জাত। সুন্দর মুখ দেখলে সে-ও ভোলে।'

কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল তা হল না। বকুলের বছর সাতেক বয়স হতে না-হতেই তাকে নিয়ে কৃপানাথ দে-র গলি ছেড়ে চলে এল প্রমদা। সোনাগাছিতে রূপাগাছিতে নয়, বেলগাছিয়ার বস্তিবাড়িতে এসে বাসা বাঁধল।

ঝিয়ের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে। দু-দুবার যথাসর্বস্ব চুরি হয়েছে প্রমদার। একবার হতাশ প্রেমিকের ছোরার মুখ থেকে বেঁচেছে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে প্রমদার। এ-পথ আর নয়। পথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সামনের দোতলা বাড়ির অল্পবয়সী বউটির স্বামী-শাশুড়ী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের ঘরকন্না দেখতে-দেখতে প্রমদা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—তার বকুলকে কিছুতেই সোনাগাছিতে পাঠাবে না সে, বোসেদের বউয়ের মতই একটি সোনার সংসার বকুলকে সে গড়ে দেবে।

বেলগাছিয়াতে এসে সধবার বেশ ছেড়ে ফেলল প্রমদা। পুরুষ সঙ্গে না থাকলে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে অনেক কৈফিয়তের তলায় পড়তে হয়। তার চেয়ে শাদা থান আর শাদা সিঁথিতে আপদ কম। বহুনাথা থেকে একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা। এই বয়সেই সব সোহাগ, আহ্লাদ, সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলতে প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হল। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমদা নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ওর সিঁথিতে সত্যিকারের সিঁদুর তুলে দেওয়ার জন্যে নিজের লোক-দেখানো সিঁদুরের দাগ না-হয় মুছেই ফেলল প্রমদা। তাতে দুঃখ কিসের।

বস্তিতে সবাই গৃহস্থ নয়। আধা-গৃহস্থও কয়েক ঘর আছে। দিনদুপুরে রাতদুপুরে ভুল করে কেউ-কেউ প্রমদার দোরে এসেও হানা দিতে লাগল। কিন্তু ফের কোন ফাঁদে পা দেওয়ার মত মেয়ে নয় প্রমদা। জীবনে তার শিক্ষা কম হয়নি।

কয়েক পা এগিয়েই পাইকপাড়া। সেখানে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঠিকে-ঝির কাজ নিল প্রমদা। বাসন মাজে, বাটনা বাটে, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদলে কোলে তুলে নেয়। আর মনে-মনে স্বপ্ন ছাখে, নিজে ঝি-গিরি করলেও বকুলকে সে এমনি একটি বড়লোকের বাড়ির বউ করে পাঠাবে।

শুধু ঝি-গিরির পয়সায় সংসার চলে না। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রে আগুন লেগেছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটুলি নিয়ে প্রমদা অফিস-আদালতের সামনে গিয়ে বসে। বিক্রি মোটামুটি মন্দ হয় না। অফিসের বাবুরা অনেকেই এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, চুনের বোঁটা হাতে নিয়ে গল্প করে।

একদিন ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার মেয়ে তো বেশ চালাক চতুর দেখছি। লেখাপড়া শিখল কোথায়? ওকে স্কুলে দিয়েছ নাকি?'

প্রমদা লজ্জিত হয়ে বলল, 'না বাবু। বস্তির সামনে নিতাই মুদির দোকান আছে। বই-খাতা নিয়ে সেখানে যায়। পড়াশুনো পেলে বকুল আর কিছু চায় না। দিনরাত বই নিয়ে থাকে। রামায়ণ-মহাভারত ওর মুখস্থ।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুধু রামায়ণ-মহাভারত কেন। ও আরো অনেক বই পড়েছে। ওকে এবার ভাল একটা ইস্কুল-টিস্কুল দেখে ভর্তি করে দাও প্রমদা। মুদির দোকানে ফেলে রেখ না। তোমার মেয়ে দেখতে তো অমনিতেই সুন্দরী। লেখাপড়াটা যদি ভাল করে শেখে ওর বিয়ের জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যে দেখবে সে-ই ওকে পছন্দ করবে।'

প্রমদা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'সে আপনাদের আশীর্বাদ, কর্তা।'

শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে-স্কুল আছে। সেখানে আধা-মাইনেতে বকুলকে ভর্তি করে দিলো প্রমদা। স্কুলে পুরো নাম জিগ্যেস করায় বলল, 'বকুলমালা দাসী।'

পরদিন বকুল এসে বলল, 'আজকাল আর মেয়েরা দাসী লেখে না মা। আমাদের ক্লাসের দিদিমণি রেজিস্টার খাতায় আমার নাম বকুলমালা দাস লিখে নিয়েছেন।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'রেজিস্টার! সে আবার কি রে!'

বকুল হেসে বললো, 'বাঃ রে। রোজ যে নাম ডাকা হয় ক্লাসে। স্কুলে গেলাম কি গেলাম না তার হিসেব রাখার জন্যে নামের খাতা আছে প্রত্যেক ক্লাসে।'

প্রমদা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও।'

ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে চলল বকুল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল। স্কুল ছেড়ে কলেজ।

বস্তির সবাই বলল, 'আর কেন, এবার মেয়ের বিয়ে দাও।'

প্রমদা বলল, 'আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি। কিন্তু মেয়ে যে কথা শোনে না।'

কত সম্বন্ধ এলো, কত সম্বন্ধ হাত-ছাড়া হল, কিন্তু বকুল কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাবে সায় দিল না।

প্রমদা একদিন মেয়েকে ডেকে বলল, 'তুই কি ভাবলি বল দেখি। বিয়ে-থা ঘর-গেরস্থালি করবি নে?'

বকুল বলল, 'না মা, এই বেশ আছি।'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বেশ আছি! তুই দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকবি আর আমি জীবন-ভর পরের বাড়িতে দাসীগিরি করব, রাস্তায় বসে পান বেচব, এই বুঝি তোর ইচ্ছে?'

বকুল কালো ব্যথাভরা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি মা, ও-সব কাজ ছেড়ে দাও।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কেবল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিলে চলবে কি করে শুনি? দু-বেলা অন্ন জুটবে কি করে?'

বকুল বলল, 'আমি ট্যুইশন করব মা, চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব। তবু তোমাকে ও-সব কাজ করতে দেব না।'

তারপর সত্যিই যখন বকুল একটা স্কুলের মাস্টারির খবর আনল, প্রমদা বাধা দিয়ে বলল, 'উহুঁ, তা হবে না। তার চেয়ে তুমি যা করছিলে তাই কর বাপু। পাস-পরীক্ষা শেষ কর। ভাতের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

বকুল বলল, 'কিন্তু রাস্তায় বসে পান বিক্রি করতে তোমাকে আর আমি দেব না মা। কলেজে তো আমার মাইনে লাগে না। প্রিন্সিপ্যাল যে ট্যুইশনটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাতে সংসারের অনেক খরচ আমাদের চলে যাবে। তারপর বি. এ.-টা পাস করে কোন অফিস-টপিসে ঢুকতে পারলে যা আনব, কষ্টেসৃষ্টে আমাদের দুজনের তাতেই চলবে। তোমাকে আর আমি কষ্ট করতে দেব না।'

মেয়ের মুখের দিকে মমতাভরা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রমদা বলল, 'দূর পাগলী। আমার আবার কষ্ট কিসের। তোকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলেছি।'

বি.এ. পাস করবার কিছুদিন বাদেই চাকরি জুটিয়ে নিল বকুল। আগে থেকেই চেষ্টা-চরিত্র করছিল। কলেজের এক প্রফেসরের স্বামী সরকারী অফিসে ভাল চাকরি করেন। সেখানেই কাজ জুটল বকুলের।

পান বিক্রি আগেই বন্ধ হয়েছিল, চাকরি পাওয়ার পর ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঝি-গিরিও আর মাকে করতে দিল না বকুল।

প্রমদা বলল, 'কেন, পেটের জন্যে তুই খাটবি আর আমি খাটতে পারব না? আমার কি গতর গেছে?'

বকুল বলল, 'ও-কথা কেন বলছ, মা। এতকাল তো তুমি আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছ। এবার তুমি বিশ্রাম কর। নিজের ঘর-সংসার ছাখ।'

প্রমদা বলল, 'ঘর-সংসার না ছাই। তোর বিয়ে হবে, জামাই আসবে; কোল ভরে ছেলেমেয়ে আসবে—তবে তো আমার সংসার। তার আগে আমার সংসার কিসের রে?' বলে মেয়ের দিকে তাকাল প্রমদা। একুশ-বাইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু বিয়ের কথায় ওর মুখে রং লাগল না। চোখের পাতা লজ্জায় আনন্দে নেমে এলো না।

বকুল আর কোন কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিল। একটু বাদে সে উঠে চলে যাচ্ছিল, প্রমদা তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাতে তোর তো কোন দোষ নেই; তুই যে আমার পাঁকের পদ্ম, বকুল। সেই দুঃখে তুই কেন বিয়ে করবি নে?'

বকুল বলল, 'আমাব কোন দুঃখ নেই, মা। আমার জন্যে তুমি ভেবনা, আমি বেশ আছি।'

এবার বকুল উঠে গিয়ে কালো মলাটের একখানা ইংরেজী মোটা বই খুলে বসল। দুঃখে বুক ভেঙে যেতে লাগল প্রমদার। মেয়েরা হৈ-চৈ করে, কত আনন্দ আহ্লাদ করে, কিন্তু বকুল সেই এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই ভারি গম্ভীর, ভারি বিষণ্ণ। বকুল প্রথম-প্রথম তার বাপের খোঁজ করেছে, কাকা, মামা, দাদাদের খোঁজ করেছে। প্রমদা মেয়েকে বুঝিয়েছে, তারা কেউ বেঁচে নেই। বকুল তবু অবুঝের মত জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কি অসুখে মরল বাবা? শীলা-লীলাদের মত আমার কি জ্যাঠামণি ছিল? তাঁর কি নাম ছিল মা?'

ধৈর্যের সীমা আছে সকলেরই। প্রমদাকেও একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলতে হয়েছে, 'রাতদিন অত আমি বকতে পারি নে বাপু, যা বলেছি, বলেছি। আর আমি কিচ্ছু জানি নে।'

কিন্তু প্রমদা না জানালে কি হবে, বকুল ক্রমে ক্রমে সবই জেনেছে। বস্তিতে কুট-কচালো লোকের তো অভাব নেই। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, ইশারা-ইঙ্গিতে সবই বুঝতে পেরেছে বকুল। ঝগড়ার সময় প্রতিবেশিনীদের ভাষা আরও স্পষ্ট, আরও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বকুলের খেলার সঙ্গীরা পর্যন্ত খোঁটা দিয়েছে, 'বেশ্যার মেয়ে, তোর বাপের ঠিক নেই! তুই কেন খেলতে আসিস আমাদের সঙ্গে?'

প্রমদা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে গিয়েছে তাদের মারতে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে অকথ্য ভাষায় তাদের বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। 'বকুল ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি মাকে হাত ধরে ঘরে টেনে এনেছে। 'মা, চুপ কর, চুপ কর।'

কিন্তু ক'বছর পরে সেই দুঃখের দিনগুলিও গেছে। নিজের কুল-পরিচয়ের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা বকুল মাকে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার সঙ্গে বস্তির কারো আর ঝগড়া হয় না। কারো সঙ্গে বড়-একটা মিশতে যায় না বকুল। স্কুলে যায়, স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার বই নিয়ে বসে।

প্রমদা মাঝেমাঝে জিজ্ঞাসা করে, 'এত বই তুই কোত্থেকে পাস, বকুল?'

বকুল জবাব দেয়, 'শহরে বইয়ের কি অভাব আছে, মা? স্কুলের মেয়েদের কাছ থেকে আনি, দিদিমণিদের কাছ থেকে আনি।'

প্রমদা বলে, 'বই ছাড়া তুই কি দুনিয়ায় আর কিছু চোখে দেখতে পাস নে? লীলারা কেমন সুন্দর তাদের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে, তোর সঙ্গে বুঝি কারো ভাব নেই?'

'আছে।'

'তবে আনিস নে কেন তাদের?'

বকুল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ভয় করে মা। যদি তারা আমাদের ঘেন্না করে।

প্রমদা হঠাৎ কোন কথা খুঁজে পায় না।

স্কুল থেকে ভালভাবে পাস করে কলেজে ভর্তি হল বকুল। কিন্তু মেয়ের স্বভাব বদলাল না। সেই বইয়ের রাশ, ঘরের কোণ আর নিজের মন নিয়ে পড়ে থাকে। দুনিয়ার আর কিছুতে ওর কোন আসক্তি নেই।

ওর সমবয়সী শীলা লীলা দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে একজন ছেলে কোলে নিয়ে আর একজন পেটে নিয়ে বাপের বাড়ি এলো বেড়াতে। প্রমদার সাজা পান খেয়ে তারা ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করল। শেষে লীলা হাসতে হাসতে বলল, 'মাসীমা, ওই গোমরামুখীকে এবার বিয়ে দিয়ে দিন। ওর যা ভাবভঙ্গি দেখছি, কবে যে ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে তার ঠিক নেই।'

সন্ন্যাসিনী হতে বাকিই বা কি। বকুল গয়নাগাটি কিছু পরে না, অত বড় চুলের গোছ মাথায়, কিন্তু ভাল করে যত্ন নেয় না। মেয়ে তো নয়, এ এক অনাসৃষ্টি।

প্রমদা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বকুল, লীলাকে দেখে তোর কি হিংসে হয় না?'

'হিংসে কেন হবে মা?'

'তুই কি চাস বল তো?'

বই থেকে মুখ তুলে বকুল মৃদু হাসে। 'সেই তো সমস্যা। কী চাইব বল তো?'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলে, 'হাসিস নে বাপু, তোর হাসিতে আমার গা জ্বলে। কী চাইবি, তা-ও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? সোয়ামী, সংসার, গা-ভরা গয়না, কোলভরা ছেলে। মেয়েমানুষে দুনিয়ায় আর কী চায়।'

বকুল বইয়ের দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বলে, 'ও-সব আমি কিছু চাই নে।'

প্রমদা গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'তা চাইবি কেন, পোড়াকপালী, হতচ্ছাড়ী। এ যে রক্তের দোষ, ঘর-সংসার তোর মন চাইবে কেন? কিন্তু তুই চাস নে, আমি চাই। যেমন করে পারি জামাই আমি আনবই।'

বকুল বই নিয়ে মায়ের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে।

রাগে জ্বলে যায় প্রমদা। ইচ্ছা করে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ওই বইয়ের রাশ। বই তো নয়, শত্রু। ওই বইপড়া বিদ্যার জন্যেই মেয়ে তার এমন করে পর হয়ে গেছে। ও কী ভাবে, কী চিন্তা করে, তা প্রমদা বুঝতে পারে না। এমন কি ওর মুখের ভাষা পর্যন্ত যেন আলাদা। অথচ এই মেয়েকে বুকে করেই এই মেয়ের সুখের জন্যই প্রমদা অকালে নিজের সব সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছে। এক এক সময় তার মনে হয়, এর চেয়ে বকুলকে নিয়ে তার সেই কৃপানাথ দে লেনেই পড়ে থাকা ভাল ছিল। বাড়িওয়ালী মাসীর মেয়ে আলতার মত বকুলেরও সেখানে দর থাকত, আদর থাকত। আর বকুলের খাতিরে খাতির বাড়ত প্রমদার। সব আটঘাট, ফিকির-ফন্দী বকুলকে সে শিখিয়ে দিত। যেমন বাড়িওয়ালী মাসী শেখায় তার মেয়েকে। হয়তো তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে চুলোচুলি খুনোখুনি হত, যেমন আলতা আর

তার ঝাঁ বিনী মাগীর মধ্যে প্রমদা হতে দেখেছে। কিন্তু ঝগড়া মিটে গেলে আবার সুখ-দুঃখে কথাও হত দুজনের মধ্যে, একজন আর-একজনের যত্ন করত, মাতাল হয়ে পড়ে থাকলে বিছানায় তুলে দিত, খারাপ অসুখ বিসুখ হলে প্রাণ দিয়ে সেবা করত, মা মেয়ে কেউ কারো কাছে কিছু লুকোত না। কেউ কাউকে ঘৃণা করত না। নিজের রক্তমাংসের মেয়েকে একেবারে নিজের করে পেত প্রমদা। বকুল তখন মা-র কাছ থেকে এমন দূরে-দূরে থাকতে পারত না, মনে মনে এমন করে ঘৃণা করতে পারত না। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে দিয়ে ভারি আহাম্মুকিই করেছে প্রমদা।

কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে অফিসে ঢুকে একমাস বাদে যখন মাইনের টাকাগুলি তার হাতে এনে দিল বকুল, প্রমদার মন অন্যরকম হয়ে গেল। সে যা ভেবেছিল তা নয়। মেয়েটার মনে তাহলে সত্যিই মায়া মমতা আছে।

'এই কি সব টাকা, বকুল ?'

'হ্যাঁ মা, সব।'

'হ্যাঁ রে, সব দিলি ? তোর নিজের কাছে কিছুই রাখলি নে ?'

'না মা, তোমার কাছেই সব থাক।'

এতখানি বিশ্বাস আলতা তার মাকে করত না। নিজের রোজগারের পুরো টাকা তো ভাল অর্ধেক টাকা, সিকি টাকাও সে মাকে প্রাণ ধরে দিত না কোনদিন। তার চেযে প্রমদার বকুল হাজার গুণ ভাল, লক্ষ গুণ ভাল।

প্রমদা এগিয়ে সস্নেহে মেয়ের চিবুক তুলে ধরল, 'হ্যাঁ রে বকুল, আমি কি তোর কাছে রোজগার চেয়েছি, টাকা চেয়েছি।'

বকুল বলল, 'কিন্তু সংসারে টাকারও তো দরকার আছে, মা।'

প্রমদা বলল, 'না কোন দরকার নেই। টাকা আমি যেমন করে পারি আনব। ঝি-গিরি করব, পান বিক্রি করব। টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোর কাছে আমি টাকা চাই নে।'

বকুল মৃদুস্বরে বলল, 'তবে তুমি কি চাও ?'

'কি চাই ? হতভাগী, তা কি তুই এতদিনেও বুঝতে পারলি নে ? আমি আমার জামাই চাই, ঘর-ভরা নাতি-নাতনী চাই। সেই দোতলা

বাড়ির বউয়ের মত আমি তোকে ভদ্র-সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই রে বকুল।'

প্রমদার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

বকুল কোন কথা না বলে আস্তে-আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

তারপর খেতে বসে মাকে আনমনা করার জন্যে নিজের অফিসের গল্প শুরু করল। খুব বড় অফিস। ঠিক যে-তেতলা বাড়িটার সামনে বসে প্রমদা পান বিক্রি করত, সেই বাড়ি। বকুলের মত আরো কত মেয়ে আছে সেখানে। শুধু মেয়ে? না, শুধু মেয়ে না, ছেলেরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। মিলেমিশে কাজ করতে প্রথম-প্রথম খুব লজ্জা করত বকুলের, এখন আর করে না।

প্রমদা অবাক হয়ে বলে, 'বলিস কি? আমাকে একদিন দেখিয়ে আনবি?'

বকুল হেসে বলে, 'বেশ তো যেও একদিন।'

কিন্তু ওই কথাই। সত্যি-সত্যি প্রমদাও যায় না, বকুলেরও তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন গরজ নেই।

তারপর মাস পাঁচ-ছয় চাকরি করতে না-করতেই মেয়ের বেশে-বাসে চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রমদা। বকুল আগে পরত আটপৌরে মিলের শাড়ি, এখন রঙিন তাঁতের শাড়ি পরেই বের হয়। সে রং কখনো সবুজ, কখনো গোলাপী, কখনো হলদে। বকুলের নিজের গায়ের রং গৌর। ওকে সব রংই মানায়। আগে চুলের রাশ ছিল যেন বাবুই পাখির বাসা; এখন বকুল নিজেই বিনুনি করে। সে-বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচে যায়। কোনদিন বা আলগা খোঁপা বাঁধে বকুল। তাতেও ওকে চমৎকার দেখায়। স্নো-পাউডারের দিকে এতকাল মেয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন এক একটি করে সে-সবও আসতে শুরু করেছে। সময় বুঝে নিজের হার চুড়ি আর দুল মেয়েকে বের করে দিল প্রমদা। এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। কিন্তু বকুল কিছুতেই পরেনি।

এবার বলল, 'ওই-সব ডিজাইন আজকাল কেউ পরে নাকি মা?'

প্রমদা মনে-মনে হাসল—ভিতরে-ভিতরে সব জ্ঞানই দেখি আছে মেয়ের।

তার স্ত্রী বিনী মাসীর মধ্যে প্রমদা হতে দেখেছে। কিন্তু ঝগড়া মিটে গেলে আবার সুখ-দুঃখে কথাও হত দুজনের মধ্যে, একজন আর-একজনের যত্ন করত, মাতাল হয়ে পড়ে থাকলে বিছানায় তুলে দিত, খারাপ অসুখ বিসুখ হলে প্রাণ দিয়ে সেবা করত, মা মেয়ে কেউ কারো কাছে কিছু লুকোত না। কেউ কাউকে ঘৃণা করত না। নিজের রক্তমাংসের মেয়েকে একেবারে নিজের করে পেত প্রমদা। বকুল তখন মা-র কাছ থেকে এমন দূরে-দূরে থাকতে পারত না, মনে মনে এমন করে ঘৃণা করতে পারত না। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে দিয়ে ভারি আহাম্মুকিই করেছে প্রমদা।

কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে অফিসে ঢুকে একমাস বাদে যখন মাইনের টাকাগুলি তার হাতে এনে দিল বকুল, প্রমদার মন অন্যরকম হয়ে গেল। সে যা ভেবেছিল তা নয়। মেয়েটার মনে তাহলে সত্যিই মায়া মমতা আছে।

'এই কি সব টাকা, বকুল ?'

'হ্যাঁ মা, সব।'

'হ্যাঁ রে, সব দিলি ? তোর নিজের কাছে কিছুই রাখলি নে ?'

'না মা, তোমার কাছেই সব থাক।'

এতখানি বিশ্বাস আলতা তার মাকে করত না। নিজের রোজগারের পুরো টাকা তো ভাল অর্ধেক টাকা, সিকি টাকাও সে মাকে প্রাণ ধরে দিত না কোনদিন। তার চেয়ে প্রমদার বকুল হাজার গুণ ভাল, লক্ষ গুণ ভাল।

প্রমদা এগিয়ে সস্নেহে মেয়ের চিবুক তুলে ধরল, 'হ্যাঁ রে বকুল, আমি কি তোর কাছে রোজগার চেয়েছি, টাকা চেয়েছি।'

বকুল বলল, 'কিন্তু সংসারে টাকারও তো দরকার আছে, মা।'

প্রমদা বলল, 'না কোন দরকার নেই। টাকা আমি যেমন করে পারি আনব। ঝি গিরি করব, পান বিক্রি করব। টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোর কাছে আমি টাকা চাই নে।'

বকুল মৃদুস্বরে বলল, 'তবে তুমি কি চাও ?'

'কি চাই ? হতভাগী, তা কি তুই এতদিনেও বুঝতে পারলি নে ? আমি আমার জামাই চাই, ঘর-ভরা নাতি-নাতনী চাই। সেই দোতলা

বাড়ির বউয়ের মত আমি তোকে ভরা-সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই যে বকুল।'

প্রমদার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

বকুল কোন কথা না বলে আস্তে-আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

তারপর খেতে বসে মাকে আনমনা করার জন্যে নিজের অফিসের গল্প শুরু করল। খুব বড় অফিস। ঠিক যে-তেতলা বাড়িটার সামনে বসে প্রমদা পান বিক্রি করত, সেই বাড়ি। বকুলের মত আরো কত মেয়ে আছে সেখানে। শুধু মেয়ে? না, শুধু মেয়ে না, ছেলেরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। মিলেমিশে কাজ করতে প্রথম-প্রথম খুব লজ্জা করত বকুলের, এখন আর করে না।

প্রমদা অবাক হয়ে বলে, 'বলিস কি? আমাকে একদিন দেখিয়ে আনবি?'

বকুল হেসে বলে, 'বেশ তো যেও একদিন।'

কিন্তু ওই কথাই। সত্যি-সত্যি প্রমদাও যায় না, বকুলেরও তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন গরজ নেই।

তারপর মাস পাঁচ-ছয় চাকরি করতে না-করতেই মেয়ের বেশে-বাসে চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রমদা। বকুল আগে পরত আটপৌরে মিলের শাড়ি, এখন রঙিন তাঁতের শাড়ি পরেই বের হয়। সে রং কখনো সবুজ, কখনো গোলাপী, কখনো হলদে। বকুলের নিজের গায়ের রং গৌর। ওকে সব রংই মানায়। আগে চুলের রাশ ছিল যেন বাবুই পাখির বাসা, এখন বকুল নিজেই বিনুনি করে। সে-বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচে যায়। কোনদিন বা আলগা খোঁপা বাঁধে বকুল। তাতেও ওকে চমৎকার দেখায়। স্নো-পাউডারের দিকে এতকাল মেয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন এক একটি করে সে-সবও আসতে শুরু করেছে। সময় বুঝে নিজের হার চুড়ি আর দুল মেয়েকে বের করে দিল প্রমদা। এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। কিন্তু বকুল কিছুতেই পরেনি।

এবার বলল, 'ওই-সব ডিজাইন আজকাল কেউ পরে নাকি মা?'

প্রমদা মনে-মনে হাসল—ভিতরে-ভিতরে সব জ্ঞানই দেখি আছে মেয়ের।

বকুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হাসছ যে।'

প্রমদা বলল, 'হাসলাম আবার কই। বেশ তো, ও-সব ডিজাইন পুরনো হয়ে গিয়ে থাকে, হালের নতুন ডিজাইন গড়িয়ে নে।' দুবার বলার পর নিমরাজী, তিনবারের বার পুরোপুরি রাজী হয়ে গেল বকুল।

তারপর ক্রমে মেয়ের চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে আরো অনেক কথা টের পেল প্রমদা। এ কেবল শাড়ি বদল নয়, মেয়ের ঘর-বদলের দিনও এসেছে। বকুল আজকাল আর শুধু মনে-মনে বই পড়ে না, সুর করে ছড়া আওড়ায়। ছড়া বললে বকুল ভারি রাগ করে। ও বলে, কবিতা। বেশ, না হয় কবিতাই হল। তুই যা বলে খুশী হোস তাই বল। এতদিন বইয়ের শুকনো পাতা ছাড়া কোন দিকে মেয়ের লক্ষ্য ছিল না। এখন গোছায়-গোছায় নিয়ে আসে রজনী গন্ধার ডাঁটা। একদিন চোখে পড়ল, বকুলের খোঁপায় লাল গোলাপ ফুল গোঁজা।

ও যখন ছোট ছিল এক বিছানায় শুত প্রমদা। কিন্তু বড় হওয়ার পর মেয়ে নিজেই আলাদা বিছানা করে নিয়েছে। কিন্তু সে-বিছানাও প্রমদা নিজে পেতে দেয়। মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে মেয়ের বিছানার কাছে সেদিন একবার দাঁড়াল প্রমদা, তারপর আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'বকুল, আমার কাছে আর লুকোসনি। বল না সে কে?'

'কার কথা বলছ, মা?'

'তুই যাকে ভালোবেসেছিস। তোকে যে ভালোবেসেছে।'

'কি বাজে বকছ। আমাকে আবার কে ভালোবাসবে?'

প্রমদা একটু হাসল, 'আচ্ছা বকুল, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি।'

বকুল তরল সুরে বলল, 'তুমিই আমার পেটে হয়েছ, মা। লক্ষ্মী খুকু, যাও, এখন ঘুমোও গিয়ে। রাত অনেক হয়ে গেছে।'

প্রমদা হাসি চেপে নিজের বিছানায় গিয়ে শোয়। আজ গোপন করল, কিন্তু কদিন আর তার কাছ থেকে সব গোপন রাখতে পারবে বকুল। কালই হোক, পরশুই হোক, বলতে তাকে হবেই।

অনেক রাত অবধি সেদিন প্রমদার ঘুম এলো না। বার-বার মনে পড়তে লাগল সেই প্রথম মানুষটির কথা। সে বলেছিল প্রমদাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। প্রমদা বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল, মানুষের সব কথাই বুঝি

সত্যি। প্রমদা ভারি বোকা ছিল তখন। তারপর ক্রমে বয়স বাড়ল, জ্ঞান, বুদ্ধি বাড়ল। প্রমদা চিনতে শিখল মানুষকে। এমন অবিশ্বাসী জীব দুনিয়ায় আর দুটি নেই। তার কথা মানেই মিছে কথা। কিন্তু এমন শুভদিনে এ-সব কি অলুক্ষণে কথা মনে আনছে প্রমদা। তার চেয়ে বকুলের যে-বর আসবে তার কথা ভাবুক। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। তার অল্প বয়স, কিন্তু অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি। যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। এতকাল তপস্বিনী থেকে বকুল কি আর যাকে তাকে পছন্দ করেছে। সে কি প্রমদার তেমন মেয়ে।

আর একদিন মেয়েকে প্রমদা অনুরোধ করল, 'তার নামটা আমাকে বল না, বকুল।'

বকুল ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কি যে বল, মা। কার নাম আবার বলব ?'

প্রমদা একটু হাসল, 'নাম ধরে ডাকতে তোর লজ্জা করছে, আচ্ছা তাকে তুই আপিসের পর একদিন আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি তার কাছে থেকেই সব জেনে নেব।'

বকুল একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তাকে কি এ-সব জায়গায় আনতে পারি মা ?'

প্রমদা বলল, 'খুব বড়লোক বুঝি ? তবে থাক, এই বস্তির মধ্যে তাকে আর এনে কাজ নেই। এবার একটা ভাল ঘর-টর দেখে উঠে যেতে হবে। আর এই নোংরা বস্তির মধ্যে আমরা পড়ে থাকব না।'

বকুল যেন নিজের মনেই বলল, 'শুধু বাড়িঘর বাদলালেই বা কি হবে।'

প্রমদা একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ, নিজের মা বদলাতে না পারলে বুঝি তুই আর তাকে আনবি নে! আমাকে এত ঘেন্না তোর! কেন কী করেছি আমি? জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তুই আমাকে মদ খেতে দেখেছিস, না কোন পুরুষের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে দেখেছিস, যে এত ঘেন্না করবি তুই আমাকে ? হায়, হায়, দুধ-কলা দিয়ে এতদিন কি সাপই আমি পুষেছি রে! এর চেয়ে তখন যদি বিনী মাসীর কথা শুনতুম, বিক্রি করে দিতুম, সে-টাকা আমার আখেরে লাগত।'

বকুল বলল, 'চুপ কর মা। ঘরে-ঘরে সবাই কান পেতে রয়েছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে তোমার কথা।'

প্রমদা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'শুনুক, আমার বয়ে গেল।'

ঘর-সংসারের কাজ সেরে খানিক বাদে প্রমদা মেয়ের খোঁজ নিতে এসে দেখল, বকুল তার ছোট্টো টেবিলখানির উপর মাথা নুইয়ে চুপ করে রয়েছে। পিঠ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে কালো চুলের রাশ। প্রমদা আস্তে-আস্তে সেই চুলগুলির উপর হাত রাখল। পরের বাড়িতে বাটনা বেটে-বেটে ক্ষয়ে গেছে, ফেটে গেছে আঙুলগুলি। বকুলের মসৃণ চুলের রাশের ওপর নিজের খরখরে, খসখসে হাতখানা রেখে একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রমদা। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, ‘বকুল, তুই কাঁদিস নে। সত্যি, আমি তোর মা হওয়ার যুগ্যি নই মা, আমি যুগ্যি নই।’

বকুল হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ছোট মেয়ের মত প্রমদাকে আঁকড়ে ধরল, ‘ও-কথা বলো না, মা।’

জল-ভরা ঝাপসা চোখে আর দুটি ছলোছলো কালো চোখের দিকে তাকাল প্রমদা. তেমনি আস্তে-আস্তে বলল, ‘সতি বকুল, আমি তোর মা নই। আমার কথা তার কাছে তুই বলিস নে। বলিস, তোর আসল মা তোর ছেলেবেলায় মরে গেছে। সে ঠিক তোর মতই ছিল, তোর মতই লেখাপড়া জানত, ভদ্দরলোকের ঘরে থাকত, ভদ্দরলোকের সঙ্গে মিশত। আমি তোর মা নই বকুল. সে-ই ছিল তোর আসল মা। আমি কেবল তোকে পেলে-পুষে বড় করেছি।’

বকুল ধরা গলায় বললে, ‘কোথায় বড় করেছ, মা। আমি সেই ছোটই রয়ে গেছি।’

প্রমদা নিজের কথাই বলে চলল, ‘তাকে আমার কথা বলে দরকার নেই, তাকে আমার সামনে এনে দরকার নেই তোর। শুধু একবার আড়াল থেকে আমাকে দেখাস। এখানে আনতে হবে না। আমি তোর অফিসের সামনে বসে পান বেচতে-বেচতে একবার শুধু তার মুখখানা দেখে নেব।’

বকুল বলল, ‘ছিঃ, মা। আবার ও-সব কথা বলছ। আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব। সে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমাকে প্রণাম করবে। সে মোটেই অহংকারী নয় মা। সে বড় ভাল।’

‘সত্যি!’ প্রমদা একটু হেসে মেয়ের দিকে তাকাল। দুজনেরই চোখে জল, ঠোঁটে হাসি।

বকুল লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ‘হ্যাঁ মা, সত্যি। অত ভাল আমি আর কাউকে দেখিনি।’

প্রমদার দুটি কান যেন মধুতে ভরে গেল। আর তার কিছু জানবার দরকার নেই। নাম নয়, ধাম নয়, অবস্থার কথা নয়। মানুষ ভাল হলেই সব হয়। ভালোবাসলেই সব পায়।

কিন্তু তারপর ফের মাস দুই যেতে না-যেতেই দেখা গেল, বকুলের আবার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ওর মুখে হাসি নেই। গলা ছেড়ে কবিতা পড়া বন্ধ হয়েছে। চুল বাঁধায়, রঙিন শাড়ি পরায় তার ফের সেই ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। কদিন বাদে গয়নাগুলিও বকুল খুলে ফেলল।

প্রমদা এবার রাগ করে বলল, 'তোর কি হয়েছে রে?'

বকুল বলল, 'কি আবার হবে?'

প্রমদা বলল, নিশ্চযই ঝগডাঝাঁটি হযেছে।'

বকুল চুপ করে রইল।

প্রমদা এবার হেসে বলল, 'যত ভাল ছেলে আর ভাল মেয়েই হোক, দুজনে কাছাকাছি এলে ঝগডা দু-চার বার হবেই। সেই দোতলার বউটিকেও দেখতুম। সোযামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত যেমন ভাব ঠিক তেমনি ঝগডা। ঝগড়া শুনে মনে হত ওরা বুঝি কোনদিন জীবনে কেউ আর কারো মুখ দেখবে না। কিন্তু দু-দণ্ড যেতে না-যেতেই আবার তাদের মধ্যে বেশ মিলমিশ হয়ে যেত। বিয়ে-করা বউ, বিযে-কবা সোযামী, একজন আর-একজনকে ফেলে যাবে কোথায়। তোরা এবাব বিয়ে করে ফ্যাল বকুল।

মুখ নিচু করে বকুল বলল, 'তার আর উপায় নেই, মা।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'সে কি বে। বিয়ে করার উপায় নেই কেন? সে কি জাতের কথা তুলেছে? তাকে বলিস, তুই বামুনের মেয়ে। আমি যা-ই হই, জাতে সে বামুনই ছিল। পৈতে ছিল গলায। বামুনের চেয়ে তো উঁচু জাত কিছু আর নেই। তার মেয়েকে সবাই বিয়ে করতে পারে।'

বকুল তেমনি নতমুখে বলল, 'বামুন কায়েতের কথা নয় মা, তার ঘরে বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আমাকে সে আর বিয়ে করতে পারে না।'

প্রমদা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'গোডা থেকে তুই সব জানতিস?'

বকুল বলল, 'না। আমিও তাকে সবকথা জানাইনি, সে-ও আমাকে সব কথা বলেনি। কিন্তু তারকথা যে এত মারাত্মক সে আমি ভাবতে পারিনি, মা!'

প্রমদা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু বিয়ে করেছে, করেছে; ছেলেমেয়ে আছে, আছে। তোর কাছে তাকে আসতেই হবে। অমন কত সুন্দরী গরবিনী বউয়ের স্বামী, কত সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ের বাপকে আমি ঘর ছাড়িয়েছি, আর তুই একজনকে ছাড়াতে পারবি নে? খুব পারবি। কি করে পারতে হয় আমি তোকে শিখিয়ে দেব।'

বকুল বলল, 'ছিঃ, মা, চুপ কর।'

আস্তে-আস্তে সেখান থেকে উঠে চলে গেল বকুল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের সেই যাওয়ার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে প্রমদা দ্রুতপায়ে তার পিছনে-পিছনে গেল। তারপর খপ্ করে মেয়ের একখানা হাত শক্ত করে ধরে কঠিন স্বরে বলল, 'বকুল, আমার দিকে তাকা। আমার চোখের দিকে চেয়ে কথা বল।'

কিন্তু বকুল আর মুখ তুলল না।

প্রমদা মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের এক কোণায় নিয়ে এলো। দোর-জানলা সন্তর্পণে বন্ধ করে গলা নামিয়ে বলল, 'পোড়ারমুখী, নিজের এমন সর্বনাশ কেন করতে গেলি। তুই-না লেখাপড়া শিখেছিস!'

বকুল তেমনি চুপ করে রইল।

প্রমদা বলল, 'আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুই আমার পেটের মেয়ে আমার চোখে এই তিন মাস ধরে ধুলো দিয়েছিস, আমার কাছে কেবল মিছে কথা বলেছিস। কেন এমন সর্বনাশ করলি বকুল? কেন না জেনে শুনে নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিলি। ভেবেছিলি সব দিলেই বুঝি সব পাবি। ওরে পোড়াকপালী, যারা অমন করে নেয়, তারা কিছুই দেয় না, কিছুই দেয় না।' চাপা কান্নায় গলা ধরে এলো প্রমদার।

কিন্তু বকুলের চোখে একফোঁটাও জল নেই।

সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও মা, যেতে দাও আমাকে।'

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাবি তুই মুখপুড়ী, দুদিন বাদে যে আর তুই বেরুতেও পারবি নে। তোকে ঘরেই বা কদিন আমি লুকিয়ে রাখতে পারব। আমার সেই বিনী মাসী এখনো বেঁচে আছে। তোকে তার কাছে রাখব। সে সব ফিকির-ফন্দী জানে। ডাক্তার-বদ্যির বাবা। চল আমার সঙ্গে।'

বকুল শঙ্কিত হয়ে বলল, 'না মা, সেখানে আমি এক মুহূর্তও টিকতে পারব না।'

প্রমদা বলল, 'ঈশ্, কি আমার সতীসাধ্বী রে। না টিকতে পারবার কি হয়েছে। সে তোকে নিজের মেয়ের মত রাখবে।'

বকুল বলল, 'না। আমার জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজে করব।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কী ব্যবস্থা করবি তুই! এ-সবের কী তুই জানিস! ব্যবস্থা করতে-করতে বুড়ী হযে গেলাম। তবু এখনো আমাদের গা কাঁপে।'

বকুল মৃদু হাসল, 'আমার গা কাঁপে না, মা। তার সব চিহ্ন আমি মুছে ফেলব।'

প্রমদা বলল, 'সেই হাডহাভাতে আঁটকুডোর ব্যাটার নামটা এবার বল। সব খরচ তার কাছ থেকে আদায করব, সহজে না দেয় আদালতে নালিশ করব। কি নাম তাব?

বকুল বলল, 'তার নাম মুখে আনার মত নয়, মা। এতদিন যখন শোননি, আজও সে-নাম তোমার শুনে কাজ নেই।'

প্রমদার কোন পবামর্শই বকুল নিল না। অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিল। গয়না বিক্রি করল। মোটা-মোটা বইগুলি সব বিক্রি করে ফেলতে তার চোখে জল এলো।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রমদার পায়ের ধুলো নিয়ে বকুল বলল, 'আসি মা।'

প্রমদার মনে পড়ল, বকুল বলেছিল, তার পায়ের ধুলো আর-একজন এসে নেবে। প্রমদা ভেবেছিল ওবা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেবে। সেদিন আর এলো না। আজ না আসুক, একদিন আসবেই। যেমন করে পারুক, বকুলের বিয়ে দেবেই প্রমদা। বয়সের মেয়ে। শরীর সারতে ওর আর কদিন লাগবে।

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস? কত দূরে?'

বকুল বলল, 'দূরে নয়, মা। এই শহরের মধ্যে। খুব ভাল ডাক্তারখানা। ভারি যত্ন করে। টাকা পেলে তারা সব করে।

প্রমদা বলল, 'আমাকে ঠিকানা দিয়ে যা। আমি তোকে দেখতে যাব।'

একটু ইতস্তত করে এক টুকরো কাগজে মাকে ঠিকানাটা লিখে দিল বকুল।

প্রমদা সেই কাগজখানা হাত পেতে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া।'

তারপর বাক্সর ভিতর থেকে একটা পুরনো কবচ এনে বকুলের বাহুতে যত্ন করে বেঁধে দিয়ে বলল, 'এটা পরে থাকিস, বকুল। আমাদের সেই বিনী মাসীর দেওয়া কবচ। আপদে-বিপদে সকলেই এতে ফল পেয়েছে। তুই তো বিনী মাসীর কাছে গেলি নে। ও-সময় কিন্তু তার নামটা স্মরণ করিস। ধন্বন্তরী আমাদের বিনী মাসী। পুরো নাম বিনোদিনী দাসী। মনে থাকবে, বকুল?'

বকুল একটু হেসে বলল, 'থাকবে।'

দুদিন বাদে সেই গোপন ডাক্তারখানার লোকই রাত্রির অন্ধকারে গোপন সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো। বকুলকে বাঁচানো যায়নি।

মাস-কয়েকের জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রমদার। পোড়া অফিসের ঘরে-ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে দাবি করত, 'কে আমার মেয়েকে খুন করেছ, বাপের বেটা হও তো বলো। তাকে ফিরিয়ে দাও।'

গোলমালে কাজের ক্ষতি হয়। অফিসের দারোয়ান পাগলীকে জোর করে বের করে দিয়েছে। তারপর থেকে কিছুতেই তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয়নি।

বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকতে-ঠুকতে মাথা ফের ঠিক হয়ে গেছে প্রমদার। পাইকপাড়ার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আবার সে ঠিকে-কাজ নিয়েছে। দুপুরবেলায় পানের পুটলি নিয়ে অফিসের সামনে আগের মত ফের বসতে শুরু করেছে। তার বকুলের অফিস।

পান বিক্রি করতে-করতে প্রমদা প্রত্যেকটি যুবকের মুখের দিকে তাকায়। তার ঝাপসা চোখে আর জ্বালা নেই। সে জানে, কোনদিন সে শোধ নিতে পারবে না। শোধ নিতে আর চায়ও না প্রমদা। কি হবে শোধ নিয়ে। যে গেছে তাকে কি আর ফিরে পাবে। শোধ নিতে চায় না প্রমদা। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। বকুল যাকে ভালোবেসেছিল তার মুখখানা কেমন। শুধু একবার দেখবে।

॥ বসন্ত পঞ্চম ॥

ব্রাত্য । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এতদিন হাটে বাজারে পোস্টার পডছিল, এবার শুরু হল বাডির দেয়ালে দেয়ালে।

ভদ্র এলাকা শেষ হতে মই ঘাডে লোক এসে এ পাড়ার মাটির দেয়ালের ওপর পোস্টার আটকাতে আরম্ভ করল। মাঝখানে ছবি, ওপরে নিচে বড বড় লাল অক্ষরের মিছিল।

আর দিন তিনেক, তারপর ভদ্রলোক এসে পড়বেন। গাঁয়ের যাতে উন্নতি হয়, গাঁয়ের মানুষের দুঃখ কষ্ট ঘোচে সেই চেষ্টায়।

উঠানে গোবর জল ছিটাতে ছিটাতে প্রথমে সোনালীর নজরে পড়ল। বালতি রেখে পোস্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পা উঁচু করে দেখল কিছুক্ষণ তারপর ঘরের দাওয়ায় উঠে গলা ছাডল, ব্যস আর আমাদের দুঃখ কষ্ট কিছু থাকবে না লো। শহর থেকে বাবু আসছেন। কোঁচায় খুঁটে চোখের জল মোছাবেন।

কথা শেষ করে সোনালী মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করল।

এক সময়ে জমজমাট ছিল, এখন ভাঙা হাট। কিছু মরেছে অসুখে, কিছু ছিটকে পড়েছে এদিক ওদিক। সম্বল ছ সাত ঘর। সাত সকালে সোনালীর হাঁকডাকে সবাই বেরিয়ে এলো।

কি লা সোনালী, তোর বেলা পাড়া মাথায় তুলেছিল যে ?

সোনালী বিন্দুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে দেয়ালের দিকে আঙুল দেখাল, সোনালী আবার কি করবে। ওদিকে যে নুটিশ লটকে দিয়ে গেছে।

নোটিশ। কিসের নোটিশ। সবাই গিয়ে জড় হল। বাড়িওয়ালী মাসী থেকে বিন্দু, সোহাগী, রাধারাণী, পারুল এমন কি বুড়ী দামিনী পর্যন্ত।

অনেকেই পড়তে পারে না। যারা পারে তারা অন্য সকলকে বুঝিয়ে দিল। সোহাগী ক্ষেপে অস্থির।

—ও সব চালাকি বুঝি আমরা। ভাল করতে আসছে না ছাই। ও সব ভোটের ফন্দি। তোদের বোকা বানাতে পারে, আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

গজগজ করতে করতে সবাই যে যার ঘরে ফিরে এলো। সোনালীর যত সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। হৈ-চৈ করে মানুষের কাঁচা ঘুম নষ্ট।

সবাই চলে যাবার পরও পারুল দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এদিক ওদিক চেয়ে ছবির আরো কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু মাংস লেগেছে গালে, বয়স একটু বেড়েছে, তাছাড়া আর কোন তফাত নেই। সেই রকম বড় বড় চোখ, চাপা ঠোঁটের গড়ন, এমন কি ভ্রূর পাশের কাটা দাগটা পর্যন্ত। স্বদেশী বাবু। দেশের দুঃখ দূর করার জন্য কোমর বেঁধেছিল, আজ বুঝি গাঁয়ের দুঃখ দূর করতে এখানে আসছে।

সারাটা দিন পারুল ছটফট করল। কেমন একটা অস্বস্তি। মানুষকে বলবার নয়, বোঝাবার নয়। নিজেই কি ছাই বুঝতে পারছে। দাঁতের গোড়ায় কাঁটা ফুটে থাকার মতন, জিভ লাগতেই খচখচ করে উঠল।

বছর দশেক, কি আর একটু কমই হবে। গুমট গরম। ঘামে বিছানা ভিজে একশা। দুদিন খদ্দেরের বালাই নেই। আকাল পড়েছে। গরমে পারুল ঘর আর বার করছে। ছিটে ফোঁটা ঘুম নেই চোখে।

কুঁজো থেকে ঘটি ঘটি জল গড়িয়ে নিজের গলাতেই শুধু ঢালল না মুখে চোখেও ঝাপটা দিল। কপালে, কানের দু পাশে। শেষকালে ঝাঁপ খুলে বাইরের দাওয়ায় এসে বসল।

সামনে মাতঙ্গী নদী। একেবারে দাওয়ার কোল ঘেঁষে। ঘুটঘুটে

অন্ধকার। দু হাত দূরের জিনিস নজরে ঠেকে না। বাতাস নেই। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। মাতঙ্গী পুকুরের সামিল।

আচমকা ছুপ ছুপ শব্দ হতেই পারুল চমকে মুখ তুলল। জলের আওয়াজ। একটু দূর থেকে কি একটা ভেসে ভেসে আসছে। জলে মৃদু আলোড়ন। চোখ কুঁচকে দেখল কিছুক্ষণ। বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারুলের সাহস হল না। ফিরে ঝাঁপ সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল।

একটু দাঁড়াও।

চমকে পারুল মুখ ফেরাল। জলজ্যান্ত মানুষ। গা মাথা বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। ভিজে চুল কপালের ওপর। খুব ক্লান্ত গলার স্বর।

চেঁচাতে গিয়েও কি ভেবে পারুল চেঁচাল না। খুব কাছাকাছি। দেখতে কোন অসুবিধা নেই। বড় বড চোখ, অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চোর ছ্যাঁচড় পাজী বদমাইস নয়—ভদ্রলোক। আহা, কি বিপদে পড়ে হয়তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আজ রাতের মতন একটু আশ্রয় দেবে? একটা রাতের মতন?

কে আপনি? দরজায় পিঠ রেখে পারুল ঘুরে দাঁড়াল!

নাম বললে তো চিনবে না। এ গাঁয়ে আমি থাকি না। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই। পুলিশ তাড়া করেছে। এখনি এসে পড়বে।

পুলিশ? ভদ্রলোকের ছেলে, তা পুলিশ কেন পিছনে?

জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই কিন্তু পারুল বাধা পেল।

ভিতরে এস। সব বলব। পারুলের পাশ ঘেঁষে লোকটার দরজার কাছ বরাবর দাঁড়াল।

অসহায় গলা, কাতরোক্তির সামিল। ঝাঁপ খুলে পারুল সরে দাঁড়াল। মুখে বলল, 'একটু দাঁড়ান, পিদ্দিমটা জ্বালি।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে পারুল কি ভেবে প্রদীপ নয় হ্যারিকেনটাই জ্বালাল। খদ্দের না এলে হ্যারিকেন জ্বালায় না, প্রদীপেই কাজ চালায়। কেরোসিন পাওয়াই দায়। ভোর থেকে লাইন দিয়ে এক ছটাক মেলে, তাও আগুন ছোঁয়া দাম।

চোর বদমাইস নয়, স্বদেশী। পারুল সব শুনল। একেবারে কোণের দিকে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে ভদ্রলোক বলল। অল্প কথায়। তাও পারুলের পীড়াপীড়িতে।

স্বদেশী। একটু একটু করে পারুলের মনে পড়ল।

চণ্ডীতলার মাঠে মেলার দিন এই সব স্বদেশীবাবুরা জড় হয়েছিল। সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সবাই। হাত জোড় করে। দয়া করে বিলিতি জিনিস কিনবেন না কেউ। বিলিতি কাপড়-চোপড়, বিলিতি খেলনা কিছু ছোঁবেন না। সন্ধ্যার দিকে শুকনো পাতা জড় করে আগুন জেলে দিয়েছিল। পারুল, সোহাগী, বিন্দু সবাই ছুটে গিয়েছিল সেদিকে। শুধু শুকনো পাতাই নয়, বিলিতি কাপডও ছিল তাব মধ্যে। দোকান লুট করে স্বদেশীবাবুরা দেশলাই ধরিয়ে দিয়েছে তাতে। পেট্রল ছড়িয়ে।

এ রকম গুণ্ডামী করলে তো পুলিশ পিছনে লাগবেই।

হ্যারিকেনের ম্লান দীপ্তি, কিন্তু দেখতে কোন অসুবিধা হল না। শান্ত নিরুত্তেজ চেহারা। কতই বা বয়স। একেবারে ছেলেমানুষ। তিন কুলে কেউ নেই নাকি। এমন করে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়েছে?

পুলিশ পিছু ধাওয়া করেছিল আমাদের নৌকার। আমি ঝাঁপিযে জলে পড়েছি। পিছন পিছন হয়তো তাড়া করে আসতে পারে এখানে। তুমি বাঁচিও আমাকে। কোথাও না হয় লুকিযে রেখে দাও।

একটানা এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগল ভদ্রলোক। এক নাগাড়ে সাঁতার কেটে এতটা পথ এসে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ঠোঁট চেপে দম নিচ্ছে।

মিষ্টি হাসল পারুল।

পানের ছোপ লাগা লালচে ঠোঁট উল্টে বলল, কোন ভয় নেই। মোহিনীমাসীর আওতা থেকে ব্যাটাছেলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এমন পুলিশ এখনও জন্মায়নি। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

কথা শেষ করে পারুল বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘরের ঝাঁপ ভেজিয়ে। চুপি চুপি পরামর্শ করেছিল বাড়িওয়ালী মাসীর সঙ্গে। খদ্দেরের জন্যে মাসী সব করতে পারে। তবে বকরা দিতে হবে পারুলকে। ওসব স্বদেশীবাবুর ট্যাঁক একেবারে ফাঁকা। সে খোঁজ পারুল নিয়েছে!

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! পারুল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তেমন কাঁচা মেয়ে পাওনি মাসী। ঘরে ঢোকামাত্র পাওনা আদায় করে নিয়েছি। তুমি শুধু পুলিশ ঠেকাও, বকরা কাল ভোরে হাতে হাতে দিয়ে দেব।

মাসী খুশীতে ডগমগ। হাসি আর ধরে না মুখে। ব্যস, ব্যস, নির্বিঘ্নে

ঝাঁপ বন্ধ করে দিল শিকল। মাসী রইল ঘাঁটি আগলে। যমের সাধ্য নেই, তাকে ডিঙিয়ে যাবে।

গোলমাল শুরু হল গভীর রাতে।

মাসী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। জানলার ফাঁকে ফাঁকে সার্চ লাইটের জোর আলো। চোখ ধাঁধানো।

দেয়াল ঘেঁষে ভদ্রলোক চুপচাপ বসেছিল। বিছানা পেতে দিয়েছিল পারুল। বিছানা আর কি। একটা শতছিন্ন সতরঞ্চ আর আধ ময়লা বালিশ। নিজে শুয়েছিল চৌকাঠ বরাবর। মেঝে মুছে নিয়ে তার ওপর।

আচমকা গায়ে হাত লাগতেই পারুল ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ভদ্রলোক অন্ধকারে গুঁড়ি দিয়ে গায়ের ওপব এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঠেলছে দু হাত দিয়ে।

কি, কি হল?

বাইরে আলো আর লোকের গলার শব্দ। বোধ হয় পুলিশের লোকই এসে পৌচেছে।

নিভন্ত হ্যারিকেন। মানুষ চেনার উপায় নেই। কিন্তু অসহায় কাতর কণ্ঠস্বর। পারুল উঠে বাইরে গেল।

দুজন জলপুলিশ। স্টীমলঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে। একেবারে অচেনা নয় পারুলের। রাতবিরেতে এখান দিয়ে যেতে যেতে কাউকে দেখতে পেয়ে রসিকতার টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছে, হাল্কা পরিহাসও করেছে দু একবার। মাঝে মাঝে উৎকট সুরে গানও গেয়েছে। কখনও সখনও পারুলও মস্করা করেছে। শুধু পারুল কেন, সোহাগী, রাধা, সুশীলা সবাই। হেসে বলেছে, স্টীমলঞ্চে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে নাকি গো? ও পুলিশবাবুরা?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে পারুল গিয়ে দাঁড়াল, কি ব্যাপার, মাঝরাতে এত হৈ-হল্লা কিসের?

পারুলকে দেখে একজন মুচকি হাসল, আরে এক বাবু ভাগিয়েছে। এ তরফে এসে উঠেছে নাকি? ধরতে পারলে বহুত ইনাম মিলবে। বাবু ডাকু আছে।

এসেছে রে মুখপোড়া, পারুল মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, মাঝ রাত্তিরে সাগর পেরিয়ে নাগর এসেছে। বলে দুদিন একটা মানুষের দেখা নেই। কি করে

হয়ে রাতজী নদীর ধার দিয়ে সোজা শহরের দিকে পা চালাল। একটু দূরে যেতেই পারুল আর দেখতে পেল না।

সেই এক লোক, তাতে আর পারুলের কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ একেবারে ঘুচল আসল মানুষটাকে দেখে আসবার পর।

পলাশডাঙ্গার মাঠ ভিড়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাঁশ দিয়ে পুরুষ আর মেয়েছেলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর ঝলমলে চাঁদোয়া। তলায় চেয়ারের সার। সব চেয়ে মাঝখানের চেয়ারে ভদ্রলোক গিয়ে বসল।

বাঁশের বেড়া ধরে পারুল আর সোনালী দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে একেবারে পাশ কাটিয়ে গেল ভদ্রলোক। বড জোর হাত খানেকের তফাত। চোখ কুঁচকে পারুল ভাল করে দেখল। সেই বাবু, আর কোন সংশয় নেই। একটু বয়স বেড়েছে কেবল, কপালের দু পাশে চুলের ফাঁকে ফাঁকে রূপোলী ইশারা। সেদিনের মতন আগুন নেই চোখে। দৃষ্টি অনেক স্তিমিত।

মিটিং শেষ হবার আগেই পারুল চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালীও। দেশোদ্ধারের বড় বড কথা। কানে গেলেও একটি বর্ণ মানে বুঝতে পারল না। অবশ্য অত বড় একটা দেশসেবকের বক্তৃতা ওদের মতন অশিক্ষিতা নারীরা বুঝতে পারবে, এমন আশাও ওরা করেনি। পুলিশের নজর এড়িয়ে বাঁচতে চেয়েছিল বাবু। ভালভাবেই যে বেঁচেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে।

বাঁশের আগায় তেরঙা নিশান তুলল, ফুলের মালা পরল গলায়, জেলার হাকিমের পাশাপাশি বসে সারা গাঁয়ের হাততালি কুড়াল। এর বেশী আর কি চাইবে মানুষ।

দিন দুয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

প্রথম খবর আনল জবা। কোন গাঁ থেকে ছটকে এসে নতুন আস্তানা বেঁধেছে। শক্ত সমর্থ শরীর। চেহারার টানে খদ্দেরের আনাগোনার কমতি নেই। আগের রাতে রাজীবলোচন এসেছিল ওর ঘরে। বুড়ো উকীল তিনকড়ি সেনের পাকা মুহুরী। দুনিয়ার খবর নখের ডগায়। জানে না এমন বিষয় নেই। সে-ই বলে গেছে।

ভোর ভোর জবা পারুলের ঘরের শিকল নাড়ল।

ও পারুলদি, গা তোল। কি সর্বনেশে খবর শুনলাম গো?

বার দুই তিন। তারপরই পারুল ধড়মড় করে উঠে পড়ল, কিরে জবা?

জবা বলল। পা মুড়ে পারুলের কাছাকাছি বসে। গাঁ থেকে ওদের নাকি উচ্ছেদ করা হবে। কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করে দেবে সবাইকে। নোংরা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। আকাশে বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে ওরা দেশের সর্বনাশ করছে।

প্রথমটা পারুল বিশ্বাস করেনি। যত আজগুবি কথা। রাজীবলোচনের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

কিন্তু জবা পারুলের গা ছুঁয়ে বলল, একটি বর্ণ মিথ্যা নয় দিদি। সেই জন্যেই বুঝি শহর থেকে ললিত মজুমদার এসেছে। গাঁয়ের মাতব্বরদের ডেকে শলা-পরামর্শ হচ্ছে।

ললিত মজুমদার? বিস্ময়ে পারুল চোখ তুলল।

হ্যাঁগো, ওই যে? দেয়ালের ওপর লাগানো পোস্টারের দিকে জবা আঙুল তুলে দেখাল।

ওই ললিত মজুমদার, সে রাতের আশ্রয় পাওয়া বাবু।

আর কথা বাড়াল না পারুল। জবা উঠে যেতে ঝাঁপি খুলে আংটিটা বের করল। মিনে করা আংটি। আগের সেই উজ্জ্বলতা নেই, কেমন বিবর্ণ, ফ্যাকাসে।

এই আংটি নিয়ে দেখা করলে হয় না বাবুর ডেরায়। পুরনো কথা মনে করিয়ে দেওয়া যায় না। দশ বছর আগে ঘুটঘুটে অন্ধকার এক রাতের কথা। সে রাতে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল পারুল, আর আজ সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না পারুলদের। আগাছার মতন নির্মম ভাবে উপড়ে ফেললেই হল বুঝি। এতদিনের আস্তানা গুটিয়ে যাবেই বা কোথায়? কোন্ জাহান্নামে?

পারুল মন ঠিক করে ফেলল। ব্যবস্থা পাকাপাকি হবার আগেই দেখা করা উচিত।

রাজীবলোচন বাড়তি খবর আনল।

স্কুল-বাড়িতেই ললিত মজুমদার আস্তানা গেড়েছে। তবে পাত্তা পাওয়াই মুস্কিল। হরদম লোকজন যাওয়া আসা করছে। চুনো পুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল। শলা-পরামর্শ, ফন্দি ফিকির। মতলবের আর অন্ত নেই। মাটি

কেটে কেটে সড়ক তৈরী, নদীতে বাঁধ, রাস্তায় মোড়ে টেপাকল। হরেক রকম ব্যাপার। আর ওপর গাঁ থেকে রোগ তাড়ানোর প্রশ্ন তো রয়েইছে। রোগ তাড়ানো আর বদ মেয়েছেলে তাড়ানো—দুইই।

পারুলের একলা যেতে সাহস হল না। জবাকে সঙ্গে নিল।

উঠতি বয়স, কাঁচা পয়সা হাতে আছে, কাজেই জোরও রয়েছে বুকে। আর কিছু না পারুক, ভিড় ঠেলে এগোতে তো পারবে। তারপর পারুলের আঁচলে বাঁধা আংটি তো রইলই।

স্কুল-বাড়ির কাছ বরাবর গিযেই দুজনে দাঁড়িযে পড়ল। গোটা তিনেক মোটর, বেশ কয়েকজন লোকও ঘোরাফেরা করছে এদিক ওদিক।

ও পারুলদি। দাঁড়িয়ে পড়ল জবা। ফ্যাকাসে মুখের রং। পায়ের আঙুল দিয়ে আঁকি বুকি কাটল মাটিতে।

কি হল? জোর করে পারুল নিজের গলার আওয়াজ চড়াল।

আমি দাঁড়াই এখানে, তুমিই যাও ভাই।

জবা একটু এগিযে পেয়ারা গাছের ছাযায় বসেই পড়ল।

আ মলো, অত ভযটা কিসের, বাঘ ভালুক তো আর নয়। মানুষ তো বটে। তা ছাড়া, আমরা তো আর ভিক্ষে চাইতে যাচ্ছি না। স্পষ্ট কথা বলব, ভয কিসের অত?

কিসের যে ভয় তা পারুল নিজেই জানে না। তবু কেমন ভয ভয় করল। পিছনে ফেলে আসা এক রাতের পরিচযের ওপর ভর করে দিনের আলোয় মুখোমুখি দাঁড়ান যাবে তো মানুষটার। স্বল্প মূল্যের এক আংটির জোরে বুকে জোর আনা কতখানি হাস্যকর তা বুঝেই ভিতরে ভিতরে পারুল একটু মিইযে গেল।

কিন্তু এতখানি এগিয়ে এসে আর বুঝি পিছনো যায় না। হাসি টিটকিরিতে তাহলে পারুলকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না।

জবার হাত ধরে পারুল টেনে তুলল। হেসে বলল, হায রে, পুরুষ মানুষকে এত ভয? আমার আঁচলে বাঁধা শেকড আছে, সাপের নাকের কাছে ধরতেই দেখবি ফণা গুটিয়ে আসবে।

দরজার মুখেই বাধা। লাঠি হাতে পাইক পথ আটকাল। ভিতরে লোক আছে, যাবার হুকুম নেই। অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক আছে, অপেক্ষাই করবে। এতদূর এসে আর ফিরে যাবে না। পারুল আর জবা উঠানে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘণ্টাখানেকেরও বেশী। লোক আসা যাওয়ার যেন আর কামাই নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনেই বিরক্ত হয়ে উঠল। আঁচল দিয়ে দাওয়া মুছে বসে পড়ল। আঁচলের গিঁট খুলে জবা পানের ডিবা বের করল। দোক্তার মিশেল। তবু খানিকটে প্রাণ বাঁচল।

জবা কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল। পাইকটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবু খালি হয়েছেন এইবার। দেখা করতে হয় তো গা তুলতে হবে।

চৌকাঠ বরাবর গিয়ে পারুল কাপড় দিয়ে মুখটা মুছে নিল। ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছে কপালে। পা দুটোও বেশ কাঁপছে।

সারা ঘর জুড়ে সতরঞ্চ। মোটা মোটা কয়েকটা তাকিয়া এদিক ওদিক ছড়ানো। ঠিক মাঝখানে ভদ্রলোকটি পা মুড়ে বসে। সামনে কাগজ পত্রের রাশ। পাশে গোটা দুয়েক ছোকরা কি সব আলাপ করছে ঝুঁকে পড়ে।

পায়ের আওয়াজ হতেই ভদ্রলোক মথ তুলে চাইল।

পারুল আর জবা সামনে গিযে বসতে পাশের ছোকরা দুটি উঠে বাইরে চলে গেল।

কি বলুন?

জিভ দিয়ে পারুল ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। আস্তে আস্তে বলল, আমরা পূবপাড়া থেকে আসছি।

পূবপাড়া। ভ্রূ কুঁচকে ভদ্রলোক কি ভাবলে দু চার মিনিট, তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই যেন মাথা নাড়ল, ওঃ, বলুন কি বলতে এসেছেন।

আমাদের নাকি উঠিযে দেবার কথা হচ্ছে? এ গাঁ থেকে সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত?

ভদ্রলোক সোজা চাইল পারুলের দিকে। সারা মুখে হিজিবিজি আঁচড়। আগের দিনের কমনীয়তার বদলে রুক্ষ কর্কশ ভাব।

হ্যাঁ কথা হচ্ছে, আর যাতে ওঠাতে পারি সেই চেষ্টাতেই আমার এখানে আসা।

কিন্তু আমরা তা হলে যাব কোথায়? কি ভাবে চলবে আমাদের!

সে দেখার কথা তো আমার নয়, অসম্ভব নির্মম ঠেকল ভদ্রলোকের কণ্ঠ।

ঘৃণ্য ব্যবসা যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টা করতে আমি দৃঢ় সংকল্প। ভদ্রলোক কথা শেষ করে তাকিয়ায় হেলান দিল।

ব্যবসা বন্ধ হলে আমাদের উপায়? না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে সবাইকে।

হয় তো হবে। চোরেরাও তো ঠিক একই কথা বলতে পারে। কিন্তু তাদের ব্যবসা করতে দেওয়া নিশ্চয় উচিত নয়?

মুখের ওপর সবেগে চাবুক পড়লেও বোধ হয় পারুল এতটা বিস্মিত হত না। যন্ত্রণায় এত নীল হয়ে উঠত না মুখের শিরা উপশিরা। চমৎকার উপমা। চোরের সঙ্গে তুলনা। কিন্তু সে রাতে চোরের মতন এদেরই একজনের ঘরে লুকিয়ে থাকতে বাধেনি মর্যাদায়, লজ্জা হয়নি।

কোন কথা না বলে পারুল আঁচলের গিঁট খুলল। মোক্ষম অস্ত্র। এখনি মুখচোখের চেহারা পাল্টে যাবে ভদ্রলোকের। পুরনো দিনের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জীর্ণ একটা কঙ্কাল বের হবে চোখের সামনে। নিজের অতীত কীর্তিকলাপের কঙ্কাল।

এ আংটিটা চিনতে পারছেন?

পারুল আংটিটা সতরঞ্চের ওপর রেখে ভদ্রলোকের দিকে চোখ তুলে চাইল।

ললিত মজুমদার হাত দিয়ে আংটিটা তুলে ধরল। বিস্ময় ঘনিয়ে এল দুটি চোখে। ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ আপনি কোথায় পেলেন? এ আমার আংটি।

পাইনি কোথাও। আংটির মালিকই দিয়েছেন আমাকে। চোখ ফেরাল না পারুল।

আর ভয় নেই। ওষুধ লেগেছে। আংটি যখন চিনেছে, তখন মানুষও চিনবে। একটু একটু করে সে রাতের সব কথা মনে পড়বে। শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হাত শুধু নয়, বুকও কেঁপে উঠবে।

আপনাকে দিয়েছেন? ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারিত হল। মনের মধ্যে ললিত মজুমদার ডুবুরী নামিয়েছে। কি খুঁজছে। অতীতের স্মৃতিমন্থন। গরল না সুধা কি ওঠে ঠিক নেই।

কিন্তু পারুল হতাশ হল।

ললিত মজুমদার মাথা নাড়ল। কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না। ফেলে

আসা জীবন যে কত জায়গায় কাটাতে হয়েছে তার আর হিসেব নিকেশ নেই।

ললিত মজুমদারের হিসেব নিকেশ নেই, কিন্তু পারুলের ঠিক হিসেব আছে। একটি কথাও সে ভোলেনি। থেমে থেমে সব বলল। সে রাতের কাহিনী।

ললিত মজুমদার স্থির হয়ে শুনল। একটি আঁচড় পড়ল না মুখে। একটু ভাঁজ নয়।

পারুলের কথা শেষ হতে ধীর গলায় বলল, আজীবন আমি সত্যের পূজারী। বিপদের মধ্যে পড়েও সত্যের আশ্রয় ছাড়িনি। কাউকে মিথ্যা কথা বলতে শুনলেই অস্বস্তি লাগে।

মিথ্যা কথা। পারুল টান হয়ে বসল। আজ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতে পেরেছে বলে বুঝি সে রাতের সব কথা মিথ্যা হয়ে গেল?

উচ্ছেদ হবার ভয়ে পারুল বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছে এটাই প্রতিপন্ন করতে চায়।

পারুল গলার আওয়াজ চড়াল, এর একটি বর্ণ যদি মিথ্যা হয়, তবে আমি—

কঠিন শপথ করার মুখে পারুল থেমে গেল।

হাত তুলে ললিত মজুমদার তাকে বাধা দিল, আপনার কথা মিথ্যা তা তো আমি বলিনি। আপনাব প্রত্যেকটি কথা সত্য। আমার সব মনে পড়েছে। তেঁতুলগাছি থেকে নৌকায় ফেরবার মুখে পুলিশে তাড়া করেছিল। গোকুল আর আমি দুজনে দুদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তারপর সাঁতার কেটে কেটে আপনাদের বস্তিতে এসে ঠেকেছিলাম। সব ঠিক। কিন্তু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যা কেন বললেন আপনি? মিথ্যা বলা মহাপাপ। যে কোন কারণেই হোক।

অনেকক্ষণ পারুল কিছু বুঝতে পারল না। মানুষটা ঠিকই আছে, কিন্তু তার কথা বলার ধরনটা কেমন দুর্বোধ্য।

সে রাতে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়াই বুঝি উচিত কাজ হত! শাড়ি জড়ানো অবস্থায় বাইরে বের করে দেওয়া।

কথাগুলো মনে মনে আউড়ে পারুল বলেই ফেলল। শুকনো খটখটে গলায়।

কথা শেষ হবার আগেই ললিত মজুমদার ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তাই উচিত হত। সত্যভ্রষ্ট মানুষ পশুর সামিল। ইহকাল পরকাল দুইই তার খতম! তখনকার শাসকদের চোখে আমি অপরাধী, আইন এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমাকে লুকিয়ে রাখা মানে আসামীকে লুকিয়ে রাখা। পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া, একই কথা। যে অন্যায় আপনারা করছেন, তার ক্ষমা নেই।

হেলে তুলে ললিত মজুমদার ঠিক হয়ে বসল। তাকিয়া চেপে আরো কায়েমী আসনে। পলাশডাঙ্গার মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার সুর আনল গলায়। অবিকল সেই ভঙ্গী।

মাপ করবেন, আমার অন্য কাজ রয়েছে। আপনাদের আদর্শের বালাই নেই, কিন্তু আমাকে আদর্শচ্যুত করবেন না।

ললিত মজুমদার ওঠবার আগেই পারুল উঠে দাঁড়াল। জবাও। এক তিল এখানে বসবার ইচ্ছা পারুলের নেই। উঠে দাঁড়াবার আগে সামনে রাখা আংটিটাও হাতে তুলে নিল।

ললিত মজুমদার আংটিটার দিকে হাত প্রসারিত করতেই পারুল ভাল করে আঁচলে গিঁট দিল। অল্প হেসে বলল, সে রাতে ভুল করেছিলাম পুলিশের হাতে মানুষটাকে ধরিয়ে না দিয়ে, এ আংটি অন্য মানুষের হাতে তুলে দিয়ে, আজ আবার নতুন করে ভুল করব না।

॥ পঙ্করাগ ॥

রাত্রি | নবেন্দু ঘোষ

টগর সাজিতে বসিল।

ঘণ্টাখানেক পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিযাছে, আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, পূবের আদ্র´ বাতাসে একটু শীত বোধ হয়। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সময় হইয়াছে।

সময় হইযাছে বৈকি। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ বরং একটু দেরি হইযাছে, টগর আজ বেশীক্ষণ ঘুমাইযাছে। পান্না আসিযা বার দুয়েক তাহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে উঠে নাই। হঁ্যা, সময় হইযাছে বৈকি।

বহুদিনের পুবাতন ষ্টোভের উপর চায়েব পাত্রটা চডাইয়া দিযা টগর সাজিতে বসিল।

সেই পুরাতন সাজ। সাত বৎসর প্রত্যহ সে একই ধরনের সাজ করিয়াছে। জড়ির পাডওয়ালা নীল শাড়ি, গিল্টি করা গহনা, ললাটে একটি খয়েরের টিপ, চোখের কোণে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পায়ে আলতার ঘন প্রলেপ, সস্তা পাউডার আর 'দিলবাহার' এসেন্স।

সাজসজ্জা শেষ হইলে টগর দেওয়ালে বিলম্বিত বড় দর্পণটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক আছে। নিত্যকার রাত্রি জাগরণে চোখের কোণে

কথা শেষ হবার আগেই ললিত মজুমদার ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তাই উচিত হত। সত্যভ্রষ্ট মানুষ পশুর সামিল। ইহকাল পরকাল দুইই তার খতম! তখনকার শাসকদের চোখে আমি অপরাধী, আইন এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমাকে লুকিয়ে রাখা মানে আসামীকে লুকিয়ে রাখা। পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলা আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া, একই কথা। যে অন্যায় আপনারা করছেন, তার ক্ষমা নেই।

হেলে তুলে ললিত মজুমদার ঠিক হয়ে বসল। তাকিয়া চেপে আরো কায়েমী আসনে। পলাশডাঙ্গার মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার সুর আনল গলায়। অবিকল সেই ভঙ্গী।

মাপ করবেন, আমার অন্য কাজ রয়েছে। আপনাদের আদর্শের বালাই নেই, কিন্তু আমাকে আদর্শচ্যুত করবেন না।

ললিত মজুমদার ওঠবার আগেই পারুল উঠে দাঁড়াল। জবাও। এক তিল এখানে বসবার ইচ্ছা পারুলের নেই। উঠে দাঁড়াবার আগে সামনে রাখা আংটিটাও হাতে তুলে নিল।

ললিত মজুমদার আংটিটার দিকে হাত প্রসারিত করতেই পারুল ভাল করে আঁচলে গিঁট দিল। অল্প হেসে বলল, সে রাতে ভুল করেছিলাম পুলিশের হাতে মানুষটাকে ধরিয়ে না দিয়ে, এ আংটি অন্য মানুষের হাতে তুলে দিয়ে, আজ আবার নতুন করে ভুল করব না।

॥ পঙ্করাগ ॥

রাত্রি | নবেন্দু ঘোষ

টগর সাজিতে বসিল।

ঘণ্টাখানেক পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, পূবের আর্দ্র বাতাসে একটু শীত বোধ হয়। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সময় হইয়াছে।

সময় হইয়াছে বৈকি। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ বরং একটু দেরি হইয়াছে, টগর আজ বেশীক্ষণ ঘুমাইয়াছে। পান্না আসিয়া বার দুয়েক তাহাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে উঠে নাই। হ্যাঁ, সময় হইয়াছে বৈকি।

বহুদিনের পুরাতন ষ্টোভের উপর চায়ের পাত্রটা চড়াইয়া দিয়া টগর সাজিতে বসিল।

সেই পুরাতন সাজ। সাত বৎসর প্রত্যহ সে একই ধরনের সাজ করিয়াছে। জড়ির পাড়ওয়ালা নীল শাড়ি, গিল্‌টি করা গহনা, ললাটে একটি খয়েরের টিপ, চোখের কোণে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পায়ে আলতার ঘন প্রলেপ, সস্তা পাউডার আর 'দিলবাহার' এসেন্স।

সাজসজ্জা শেষ হইলে টগর দেওয়ালে বিলম্বিত বড় দর্পণটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক আছে। নিত্যকার রাত্রি জাগরণে চোখের কোণে

কালিমা ছায়া ঘন হইয়াছে, অলক্ষ্যে সময় তাহার ললাটে দুর্বোধ্য রেখায় কি যেন লিখিয়াছে, দেহ হইয়াছে ঈষৎ মেদবহুল, বক্ষ আর কটিদেশ আগেকার মত আকর্ষণীয় নয়, তবু চলিবে। এখনও আরও কিছুদিন চলিবে।

চায়ের জল টগ্‌বগ্‌ করিতেছে।

'আমায়ও এক কাপ দে ভাই'—মানদা আসিয়া দাঁড়াইল। মানদা প্রৌঢা, স্থূলাঙ্গী, মুখে বড় বড় বসন্তের দাগ, রংটা শ্যামবর্ণ। এককালে তাহার চেহারা ভালই ছিল, আর ব্যবসাও চলিত ভাল, কিন্তু আজকাল—।

'বস ভাই'—টগর বলিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে সে প্রশ্ন করিল, 'শশী কোথায় মানদা?'

মানদা ঠোঁট উল্টাইল, 'সে হারামজাদার কি আর কোন জ্ঞানগম্যি আছে—কাল রাত থেকেই তো উধাও।'

টগরকে একটু চিন্তিত বোধ হইল, 'আজ মুখপোড়া গেল কোথায় কে জানে।'

মানদা মুচকি হাসিয়া বলিল—'জানিস, হতভাগা তোকে ভালবাসে?'

টগর হাসিল। ভালবাসা। বহুদিন পূর্বেকার কথা—সুধীর নামক একটি সুদর্শন যুবক বিমলাকে ভালবাসিত। সেই বিমলা আজ টগর হইয়াছে—আর সুধীর?

চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মানদা বলিল, 'যাই ভাই, আমিও তৈরী হইগে।'

মানদা চলিয়া গেল। এখন আর তাহার সেদিন নাই, একটি লোকও তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় না, আর সকলের দাসীবৃত্তি করিয়াই সে আজকাল বাঁচিয়া আছে, তবুও অন্যান্য সকলের মত সেও সাজিয়া গুজিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়ায়, পথগামী লোকদের প্রতি কটাক্ষ হানে, রসিকতা করে, অশ্লীল কথা বলে। রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা যেন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

টগর বসিয়া রহিল। শশীর ভালবাসা। এবার আর সে হাসিল না। ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া উঠিল, পাউডারে অবলিপ্ত ললাটের রেখাত্রয় আবার পরিস্ফুট হইল, চোখের কোণের কাজলের রেখার উপর একবিন্দু জল টলমল করিতে লাগিল। ভালবাসা! সে কবেকার কথা—।

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মেঘলা দিনের আলো।

সেই আলো যেন হঠাৎ অন্ধকারে পরিণত হয় আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়াছবির মত কতকগুলি ছিন্নভিন্ন ছবি ভাসিয়া যায়, কতক-গুলি পুরাতন কথা পুনর্জীবন লাভ করে।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, তোমায় আমি ভালবাসি।'

বিমলা লজ্জায় অধোবদন হইল।

বাহিরে সূর্য অস্ত গিযাছে। আকাশের মেঘে মৃত সূর্যের শোণিত চিহ্ন।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, তুমি আমাব'—

বিমলা বলিল, 'আর তুমি আমার।'

গলিতে ভিড় বাড়িতেছে। বিসর্পিল গলি।

গলির মোড়ে কানাইয়ের মাংসের দোকান। পূবের ঠাণ্ডা বাতাসে মাংসের তরকারীর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

সুধীরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ বিমলা।

সুধীর বলিল, 'বিমলা, চল—পালিয়ে যাই।'

বিমলা বলিল—'চল'—

তাহার পব এক নগব। সেখানে স্বপ্নভঙ্গ। পাখী উড়িল। মাতৃত্বের ভারে বিমলাকে ভারাক্রান্ত করিযা একদিন সুধীর অদৃশ্য হইল। তারপর নূতন নূতন লোলুপ মুখ আব ক্ষুধিত দৃষ্টির মাঝে একটি শিশুর কান্না শোনা গেল। তারপর—

'কি লো, গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিস, ভাই?'

চমক ভাঙিল। বুঁচী। সন্ধ্যাব অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিয়াছে, গলির বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মানুষেব ভিড বাড়িয়াছে। তাহাদের হাসির শব্দ আর কোলাহল শোনা যায়।

'বলি কি ভাবছিস্ লা পোড়ারমুখী?'

টগর হাসিল—'তোর কথা রে বুঁচী।'

বুঁচী নিজের গোলমুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটাইয়া বলিল, 'ধাঃ মাইরি—ইয়াকি করিস না। বল না ভাই—

কোন সে পুরুষশ্রেষ্ঠ হরিয়াছে
চিত্ত তব দেবেন্দ্রযোগ্য?—

বুঁচী কোন থিয়েটারে একবার এক সখীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিল। তাহার অভিনয় প্রথমবারেই শেষবারে পর্যবসিত হইয়াছিল, যেহেতু সে

ষ্টেজে নামিয়া একটি কথাও বলিতে পারে নাই, অনেক লোক দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু ষ্টেজে যে কথা তাহার বলা হয় নাই তাহা প্রায়ই বেশ সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া মাঝে মাঝে টগর পান্না প্রভৃতিকে কারণে অকারণে শোনায়।

টগর হাসিল। বেশ মেয়ে এই বুঁচী।

বুঁচী আবার বলিল—'কি, বলি কোন মনচোরের কথা ভাবছিলে ?'

মনচুরি! সে ভুল একবার হইয়াছিল। সে কবেকার কথা! তাহার পর 'পুরুষশ্রেষ্ঠ' নয়, বহু পুরুষ আসিয়াছে, নিত্য নূতন। বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়। সুস্থকায় আর ব্যাধিগ্রস্ত। এখনও আসে, নিত্য তাহার চতুর্দিকে তাহারা ভিড় করে, গুঞ্জনধ্বনি তোলে। টগরের নয়, বিমলার মন একবার চুরি গিয়াছিল বটে। কিন্তু সে হতভাগী তো আর বাঁচিয়া নাই।

'বুঁচী'—

'কি প্রাণেশ্বর ?'

'আর বাজে কথা বললে চলবে না।'

'কেন হৃদয়বল্লভ ?'

'সবাই চলে গেছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

বুঁচীর জ্ঞান হইল, 'তাই তো! চল্ চল্'—

ফটকের সামনে গিয়া তাহারা দাঁড়াইল। ল্যাম্প পোষ্টের আলোতে তাহাদের দেহ আর পোষাক আর গিল্টির গহনাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। আলোর ইন্দ্রজাল।

রাত্রি হইয়াছে। তাহাদের জীবন আরম্ভ হইল।

তাহারা সকলে দাঁড়াইল—এক বাড়িতে তাহারা পাঁচজন থাকে।

মানদাও দাঁড়াইয়াছে! রক্তের মধ্যে অভ্যাসটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

পান্না হাসিয়া বলিল, 'মাইরি টগর, তোর রূপের দিন দিন খোলতাই হচ্ছে!'

টগর নিরুত্তরে হাসিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল রাধার দিকে। এককোণে সে গম্ভীরভাবে একটা সাদা শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। টগর বিস্মিত হইল।

'রাধা'—সে ডাকিল।

রাধা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

'তুই এলি যে, আজই না তুই পথ্যি করেছিস ?'

রাধা শুষ্ককণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ'—

'কেন এলি তবে ?'

'টাকা চাই, বাড়িউলি আজ আমায় অনেক কথা শুনিয়েছে।'

টগর আর কি বলিবে ?

রাধা চলমান জনতার দিকে দুইটি বড় বড় চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোগ ভোগের পর তাহার শীর্ণ আকৃতি অধিকতর শীর্ণ হইয়াছে, কালো রং মিশ্‌কালো হইয়াছে, গাল ভাঙিয়া গিয়াছে আর মাথার চুল কিছু উঠিয়া গিয়াছে। রাধার বুকে নাকি কি এক দুর্বোধ্য ব্যাধি হইয়াছে, জীবনের আশা খুব কম, শ্বাস প্রশ্বাস লইতে তাহার আজকাল বড় কষ্ট হয়। পরেশ ডাক্তার তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়াছে।

প্রেতিনীর মত মাংসহীন, লিক্‌লিকে একটি বাহু দিয়া দরজার পার্শ্বদেশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাধা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। টাকা চাই।

কনক বলিল—'সত্যি তুই শুয়ে থাক্‌গে লো রাধা, এখনও আরও কয়েকদিন তোর জিরোন উচিত।

রাধা নড়িল না, কথাও বলিল না।

'বিবিসায়েব, গোলামের সেলাম নাও।'

একটি কালো ও মোটা লোক। গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা।

পান্না একগাল হাসিয়া আগাইয়া গেল—'মর মিনসে, কত ঢংই জান, চল ভেতরে।'

লোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পান্না তাহাকে ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

গলিতে ভিড় ক্রমে বাড়িয়া উঠে। নানারকমের এসেন্স, পাউডার আর দেহের গন্ধ। নানারকমের মুখ, পোষাক আর কথা। হাসি আর পানের পিচ আর সিগারেটের ধোঁয়া।

'ঐ মেয়েটা মন্দ নয়।'

'কোন্‌টা ?'

'ঐ যে কোমরে হাত দিয়ে—আহাহা, শরীরের গঠনটা দেখছিস !'

একটি যুবক এদিক ওদিক একবার ত্বরিতগতিতে দেখিয়া লইয়া টগরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

'শোন'—সে বলিল।

'আমায় বলছেন ?' টগর হাসিল।

বুঁচী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'মর ছুঁড়ী—আর কাকে না ?'

যুবকটি ঘামিয়া উঠিয়াছে। সে এ গলিতে নবাগত।

'কি কথা, বলুন'—টগর নিপুণ কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিল।

'ভেতরে চল।'

'সে কি ? দরদস্তুর !'

'সে পরে হবে।'

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেবল রাধা হাসিল না।

নিজের ঘরে গিয়া টগর বলিল, 'বসুন।'

যুবকটি সলজ্জভাবে বসিল। পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সে ঘন ঘন টানিতে লাগিল।

'পান খাবেন ?' টগর প্রশ্ন করিল।

'না।'

একদৃষ্টে যুবকটি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বারংবার তাহার নাসিকা স্ফীত হইতে থাকে। সুদর্শন, সুকুমার যুবক। টগর মনে মনে হাসে। নূতন পথিক।

'কতদিন এ পথে এসেছ ?'

টগর শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে বলিল, 'ওসব জেনে কি করবেন—দেবদাস হবেন নাকি ?'

যুবক অপ্রতিভ হইল—'না-না, মানে'—

'থাক ওসব কথা, বাতি নিভিয়ে দেব ?'

সিগারেট বারান্দায় নিক্ষেপ করিয়া শয্যায় বসিয়া যুবক কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'দাও !'

'আগে দুটো টাকা দিন।'

দুইটি টাকার আওয়াজ। অন্ধকার হইল।

অন্ধকারে উষ্ণ রক্তের মত্ত ইতিহাস। নিবিড় আলিঙ্গনে টগরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, দেহগ্রন্থিগুলি টন্‌টন্ করে।

বারান্দায় সিগারেটটা নিভিতে চলিয়াছে।

আলো জলিল।

যুবকটির মাথা নত। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অবিন্যস্ত চুলে একবার হাত বুলাইয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

'একটা সিগারেট দিন তো'—টগর বলিল।

যুবকটি তাহার দিকে চাহিল না, কেবল নিরুত্তরে একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া টগর বলিল, 'বসুন।'

'না'—পাপের অবসাদ তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

'আমার জীবনকাহিনী শুনবেন না?'

যুবক মাথা নাড়িল।

'কালকে আসবেন তো?'

যুবক লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

টগর হাসিল। সে জানে ঐ যুবক আবার একদিন আসিবে। এখন তাহার মাথা নীচু হইয়াছে বটে, কিন্তু দেহভ্যন্তরস্থিত নিস্তেজ শিরাগুলি যখন আবার উষ্ণ রক্তের স্রোতোবেগে উদ্দাম হইয়া উঠিবে, মন তখন আবার বদলাইবে, সে আবার আসিবে।

বাতাসে কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। পাশের ঘরে পান্না হাসিতেছে। ওপাশের বড বাড়িটায সুকেশী গান ধরিয়াছে। মহানগরীর বুকে রাত্রি গভীর হয়।

আয়নায় মুখ দেখিয়া, খোঁপা ও বেশ ঠিক করিয়া লইয়া টগর সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

এমন সময়ে আসিল শশী।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠিয়া রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে হাসিল, 'তোকেই খুঁজছিলাম টগর।'

টগর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'কেন, কি দরকার আমার খোঁজে, এখন বুঝি খিদে পেয়েছে?'

'না—তা নয়, দুটো পয়সা চাই।'

'ওপরে চল্।'

টগরের পিছনে শশী ঘরে ঢুকিল।

ঘরের আলোতে শশীর চেহারা এইবার পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। একটি সরু পাড় ময়লা শাড়ি পরনে, গায়ে একটা অর্ধছিন্ন পাঞ্জাবি, মাথায় একরাশ ফাঁপিয়া ওঠা রুক্ষ চুল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহ তাহার অতিমাত্রায় দীর্ঘ, অস্বাভাবিক শীর্ণ, হাতের শিরাগুলি স্ফীত, ললাটে মুখের মাংসহীন দুইটি গালের উপর গরুর মত একজোড়া ড্যাবডেবে ও ক্লান্ত চক্ষু।

পয়সা দিতে গিয়া শশীর দিকে ভাল করিয়া চাহিল, হৃদয়ে একটা ব্যথা মোচড় খাইয়াও উঠিল। হতভাগা শশী। কবে কোন্ এক বেশ্যার গর্ভে এই গলির এক অন্ধকার ঘরে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার আর মনে নাই, উদ্দেশ্যহীন ছন্নছাড়া জীবনের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়া সেই কথা সে ভুলিতে চায়। কোথায় যায়, কোথায় কখন থাকে, কি খায়, কিছুরই ঠিক নাই।

'বলি আজ খেয়েছিস তো?' টগর প্রশ্ন করিল।

ক্ষুদ্র শিশুর মত মাথা দুলাইয়া শশী বলিল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া টগর বলিল—'আচ্ছা শশী'—

'এ্যাঁ'—

'কেন মরতে এখানে থাকিস বল্ তো—অন্য কিছু করতে পারিস না?'

শশীর শান্ত ও ক্লান্ত দৃষ্টিতে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, 'এখানে যে নাড়ীর টান আছে।'

'না শশী, বাজে কথা নয়।'

শশী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তোদের মায়া ছাড়তে পারি না।'

'কেন?'

শশী তাহার উত্তর দিল না, হঠাৎ একটা কথা যেন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে এমনিভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'আজ গণেশের ওখানে একটি ভারী অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হল টগর, বয়স বেশী নয় কিন্তু তার জ্ঞান! সে আমায় বললে'—সে থামিল।

'কি বললে?'

'তার আগে একটা কথার উত্তর দে তো?'

'কি?'

'এই জীবন কি তোর ভাল লাগে ?'

টগরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল, মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, 'না, বাঁচতে হবে তো, অন্য আর কি উপায় আছে ?'

শশী মাথা নাড়িল, লোকটি সেই কথাই বললে যে এমন একটা দিন আসবে যখন তোদের এ জীবনের আর দরকার হবে না, মানুষ আর সমাজ একদিন ভেঙে পিষে নতুনভাবে তৈরী হবে।'

শশীর কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতে থাকে, কথা শেষ করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

টগর ঠিক কথাগুলি বুঝিতে পারে না, তবুও তাহা কেমন যেন ভাল লাগে। সমাজ আর মানুষ। ঠিকই তো। মুহূর্তে তাহার সারা অতীত আবার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু এই অতীতের স্মৃতিতে কোথায় যেন একটা পীড়াদায়ক যন্ত্রণা লুক্কায়িত আছে, টগর তাহা সহ্য করিতে পারে না। জোর করিয়া হাসিয়া সে বলিল—'আচ্ছা এবার নীচে চল্।'

শশী হঠাৎ তাহার দিকে আসিয়া দ্রুতকণ্ঠে, উত্তেজিতভাবে বলিল 'টগর'—

'কি ?'

'চল্ না কোথাও বেরিয়ে পড়ি, এই কুকুরের জীবন, এই গলির ভ্যাপসা দুর্গন্ধ আর অন্ধকার ছেড়ে চল্ না কোথাও চলে যাই। যাবি ?'

টগর হাসিল, 'তা আমাকে এত দয়া কেন রে মুখপোড়া, আরও তো কত লোক রয়েছে—বুঁচী, মানদা, পান্না—তাদের বল্‌গে না।'

'তোকে যে ভালবাসি।'

'কি।' মানদার কথাগুলি টগরের মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ভালবাসার ছবিগুলি চোখের সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল, 'ভালবাসা। যা যা শশী দূর হ, বেশ্যাকে ভালবাসতে এসেছেন, বলি কত টাকা আছে রে তোর হারামজাদা ?'

শশীর বড় বড় চোখ দুইটি যেন এবার ফাটিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম হইল, 'নাই বা থাকল টাকা, টাকাওয়ালাদের মত রাতের বেলায় এসে এক ঘন্টার জন্য তো তোকে ভালবাসি না আমি, আর বেশ্যার ছেলে আমি, বেশ্যাকে ভালবাসব না তো কাকে ভালবাসব ?'

টগর বিরক্ত বোধ করে, 'পথের কুকুর মাথায় উঠেছিস্ না? প্রেমের কথা শোনাতে এয়েছেন বাবু, বলি ভাত যে গিলিস, আজ কটা লোককে এনেছিস্ রে মুখপোড়া? যা যা দূর হ সুমুখ থেকে।'

মুহূর্তে শশীর মুখের রূপান্তর ঘটিল, আবার পূর্বেকার সেই নিরীহ পশুর মত ক্লান্ত ভাব ও দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, 'ঠিকই তো, বাইরে যে একটা বুড়োকে দাঁড করিয়ে এসেছি।'

টগর একটু চুপ করিয়া বলিল, 'যা—নিয়ে আয়।'

'যাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শশী চলিয়া গেল। কেবল যাওয়ার সময় একবার কি ভাবিয়া টগরের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল। ঘরের আলো তির্যক গতিতে সিঁডির উপর পডিয়াছে, তাহাতে সিঁড়িটা সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হয় নাই। সেই আধো আলো, আধো অন্ধকারে শশীর গরুর মত ড্যাবডেবে চোখের মধ্যে যেন কি একটা ভাষা। টগর বুঝিয়াও বোঝে না। ভারী অদ্ভুত এই শশী, একেবারে পাগল।

টগর বিছানায় গিয়া বসিল। ঘরের ভিতর বর্ষাকালের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। বাহিরে নক্ষত্রহীন অন্ধকার আকাশে মেঘরাশি আবার পুঞ্জীভূত হইতেছে। টগর ভাবে। ভালবাসা। শশীর ভালবাসা। সুধীর আর বিমলা।

সন্ধ্যাবেলায় অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিতে করিতে যেখানে ছেদ পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে সে আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল—

—এক নগর। সেখানে হঠাৎ একদিন একটি শিশুর ক্রন্দনে বিমলার নেশা ভাঙিল, সে বুঝিতে পারিল যে পশ্চাতের জীবনে ফিরিবার আর কোনও উপায় নাই। এদিকে মধুলোভী মুগ্ধ ভ্রমরদের ভিড বাড়িয়া চলিল। ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে কদর্য পিপাসা আর প্রলোভন। ওদিকে পাপের বোঝাটি দিবারাত্র ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বিমলা বড মুস্কিলে পড়িল, সে কি করিবে? অবশেষে সে একদিন নিজের পাপকে ভুলিতে চাহিল। এক মত্ত মুহূর্তে সে ঐ শিশুটির কোমল গলদেশ নিপীডন করিয়া তাহাকে এই পৃথিবী হইতে বিদায় দিল। যন্ত্রণায় বেচারীর দেহটি কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল মাত্র আর কিছু নয়। তারপর দূরে এক জঙ্গলে, মাটির নীচে তাহার কচি দেহ চাপা পড়িল। হায়, বিমলা ভুল করিয়াছিল!

পাপ দূর করিতে গিয়া সে তাহাকে আরও কায়েমী করিয়া তুলিল, অজ্ঞাত নিয়তির আকর্ষণে সে থামিল এই গলিতে। তাহার পর এই গলির অন্ধকারে বহু মানবের আলিঙ্গনে নিপিষ্ট হইয়া বিমলা হইল টগর। সে কবেকার—

পদশব্দ।

একজন বৃদ্ধ আসিল। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। সুভ্যদেহ, শীর্ণকায়, মাথার চুলগুলি কাঁচাপাকা, ছোট ছোট চোখে সর্বদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, পরনে কোঁচান ধুতি, পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর।

'আসুন'—টগর বলিল।

বারান্দা হইতে শশী একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল,

বৃদ্ধ হাসিল, 'আসুন কিগো, এসেছি।'

'বসুন।'

বৃদ্ধ বলিল, 'তোমার নামই টগর বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—

'বেশ বেশ, তা বাছা শশী মিথ্যে কথা বলেনি—তুমি দেখতে মন্দ নও।

টগর হাসিল, 'পান খাবেন?'

'নিশ্চয়ই, অনেক পান তো খেলাম, তোমার হাতেরটাও খেয়ে দেখি। দেখ যেন গুন্ কর না ভাই।'

বৃদ্ধ রসিক।

টগরও রসিকতা করে, 'গুন্ করলেই বা ভয়ের কি, আমি কি বাঘ?'

'বাঘ! কে বলে তা? তোমরা বাঘের চেয়েও বড—তোমরা হচ্ছ বাঘের মাসী।'

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ দেওয়ালে বিলম্বিত কালীর পটের উপর দৃষ্টি পড়ায় তাহার হাসি থামিয়া গেল, দৃষ্টি নত হইল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে বলিল, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও তো'—

'কেন?' টগর বিস্মিত হয়, 'এত তাড়াতাড়ি, গল্প করবেন না?'

'নেভাও বলছি।'

অন্ধকার।

'ঘরে মায়ের ছবি রেখেছ কেন?' বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল।

'আমরা কি মায়ের সন্তান নই?'

'না, তা বলছি না—কিন্তু মায়ের ছবির সামনে ভয় হয়।'

'তবে ফিরে যান।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধ টগরকে নিকটে টানিয়া লইল। লোল চর্মের স্পর্শ।

'পাগল, এখানে যারা আসে, তারা কি ফিরবার জন্য আসে?'

টগর মৃদু হাসিল, 'ছবি না রাখলে কি মা এসব কাজ দেখতে পান না?'

'না—তা নয়—তবে'—

'কেন তবে এই ফাঁকি, পাপ করছেন আবার নিজেকে ভুলও বোঝাচ্ছেন!'

বৃদ্ধ নিবিড়ভাবে টগরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'ও বাবা, তুমি যে অনেক বড় বড় কথা জান মাইরি।'

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া শশী যেন কি ভাবিতেছে। বেশ্যার ছেলে শশী।

আলো জ্বলিল।

বৃদ্ধ ম্লান হাসিয়া বলিল, 'নেশা কাটলে যেমন সব বিস্বাদ মনে হয় এখন তেমনি মনে হচ্ছে। ভাবছি—কেন এসেছিলাম?'

'কেন এসেছিলেন?'

'তা কি জানি—মনকে সামলাতে পারি না। ঘরেতে আমার বৌ ছেলে-মেয়ে নাতি নাত্‌নী সবই তো আছে তবু তোমাদের এখানে একবার না এসে পারি না—কেন?'

'আমাদের ভালবাসার টান'—টগর হাসিয়া বলিল।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িল, 'তোমাদের ভালবাসা। সে তো মিথ্যা—অভিনয়।'

সে নীচে নামিয়া গেল।

মিথ্যা—অভিনয়। বিমলার ভালবাসা কি মিথ্যা ছিল।

রাধা তখনও একই ভাবে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। একটি লোকও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে না।

মানদাও একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল, টগরকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—'তোদেরই ভাগ্যি মাইরি।'

'কেন?'

'একটা যাচ্ছে তো আরেকটা আসছে।'

টগর মৃদু হাসিল।

'বুঁচী, পান্না, কনক—এরা বুঝি ঘরে?'

'হ্যাঁ।'

মানদা সাগ্রহে রাস্তার দিকে তাকায়। কেহ কি মুগ্ধ হইল? একদিন কিন্তু তাহার দ্বারে লোকেরা হুমড়ি খাইয়া পড়িত। সেই যে এক মারওয়াড়ী, কি বিরাট ভুঁড়ী ছিল তার। সে একদিন আসিয়া মানদার পা জড়াইয়া ধরিয়া কত সাধিয়াছিল তাহার সহিত যাইতে, কিন্তু সে যায় নাই। আর আজ? নিজের মুখের বসন্তের দাগগুলির উপর মানদা হাত বুলায়।

রাধার দিকে চাহিয়া টগরের মনটা কেমন যেন করে। মোলায়েম স্বরে সে ডাকিল—'রাধা।'

রাধা ক্লান্তভাবে তাহার দিকে চাহিল।

'তোর টাকার দরকার তো একটা টাকা নিস আমার কাছ থেকে, তুই এখন ভেতরে যা ভাই।'

রাধা নিরুত্তরে মুখ ফিরাইযা লইল।

রাত্রি বাড়িতেছে। রাত্রির কালো ধমনীতে তাহার কালো আত্মার স্পন্দন। গলিব মধ্যে ভিড। নানা মুখ আর নানা কথা, হাসি আর ইঙ্গিত, মদ আর পানের পিচ্, অদৃশ্য বীজাণুর হাসি আর কানাইয়ের দোকানের মাংসের গন্ধ। হ্যাঁ, রাত্রি বাড়িতেছে।

আবার শশী আসিল।

'আর একটাকে এনেছি'—সে বলিল।

তাহার পশ্চাতে একটি লোক টলিতেছিল। তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, অত্যাচারে গাল ভাঙিযা গিযাছে, রক্তাভ দৃষ্টিতে অর্থহীন চাহনি। চেহারাটা তাহার ভালই, দেখিয়া অবস্থাপন্ন ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়।

'নিযে আয়'—বলিয়া টগর সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে জড়িতস্বরে লোকটি বলিল, 'অত হন্‌হন্ করে যেও না ভাই, মুখখানা একবার দেখাও'—

টগর থামিল, লোকটির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'দেখুন না কত দেখবেন।'

লোকটি টলিয়া টলিয়া দেখিতে দেখিতে হাসিল, 'বেশ মুখ।'

লোকটিকে টগরও দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তাহার

সারা দেহের রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিল, প্রতি কোষে উপকোষে হিংস্রতার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, দুই হাত বাড়াইয়া কঠিনভাবে লোকটির গলা টিপিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'শশী!'

শশীর লম্বা ছায়া সিঁড়ির ধাপে পড়িল।

'এ হারামজাদাকে বের করে দে।'

'কেন?'

'বের করে দে বলছি।'

লোকটির নেশা ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাচীরে হেলান দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, 'তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?'

টগর অদ্ভুত হাসিয়া বলিল, 'চিনে দরকার নেই আর, এ গলিতে আর কোনদিন যেন তোমার মুখ না দেখা যায়।'

'তুমি কে?'

'আমি টগর—বেশ্যা—আবার কে।'

'না, ঠিক করে বল তুমি কে?'

টগর গর্জন করিয়া উঠিল, 'শশী— হতভাগা আমার কথা কি তোর কানে যায়নি…বের করে দে এ কুকুরটাকে।'

শশী লোকটির হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

তবুও লোকটি আকুলকণ্ঠে বলিল—'তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?'

শশী আবার তাহাকে ধাক্কা দিল।

টগর একটা সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িল।

দুইটি কাবুলীওয়ালাকে লইয়া রাধা উপরে চলিয়া গেল। তাহার টাকা চাই—আজই।

হঠাৎ টগর উঠিল, দ্রুতপদে দ্বারপার্শ্বে গিয়া গলির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল। লোকটি টলিতে টলিতে গলির মোড়ে অদৃশ্য হইল। সুধীর অদৃশ্য হইল। হইবে না তো কি—টগর তো বিমলা নয়। বিমলা তাহাকে ভালবাসিত, টগরের সে শত্রু।

মানদা প্রশ্ন করিল, 'ফিরিয়ে দিলি কেন রে?'

নিরুত্তরে টগর নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল। মুহূর্তে কি যেন হইয়া গেল। না দুঃখ, না ক্রোধ, না হতাশা, এমনি একটা অবর্ণনীয় ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সে নিঝুমের মত পড়িয়া রহিল আর অতীতের ছবিগুলি

একের পর এক ভোজবাজীর মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। কেবল একটি দূর দূরান্তরের কোন এক জঙ্গলের মাটির বাধাকে ভেদ করিয়া একটি রুদ্ধশ্বাস কচি শিশুর কান্না ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরে মেঘগর্জন শোনা গেল।

পাশের ঘরে কাবুলীওয়ালা দুইটি তাহাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব রসিকতা করিয়া হাসিতেছে। রাধা।

শশী আসিল।

'খাবি না টগর?'

'তুই খেয়েছিস?'

'তুই আগে খা।'

টগর উত্তর দিল না।

বারান্দায় বসিয়া শশী বলিল, 'পুরনো দিনের কথা ভাবিস না, এমনি হয়, অথচ কত কথাই না ভেবেছিস এই অপদার্থ লোকটার বিষয়ে।'

'ওসব কথা ছাড় দেখি।' টগর তিক্ত হইয়া উঠিল।

শশী ম্লান হাসিল, 'আচ্ছা তবে খেয়ে নে চারটি।'

টগর উঠিল। দিনের রাঁধা ভাত একটি পাত্রে কিছু দিয়া বলিল, 'নে খা।'

শশী খাইতে বসিল।

পাশের ঘরে রাধা একটু গোঙাইয়া উঠিল।

টগর খাওয়া দেখে। একগাল ভাতের চাপে শশীর দক্ষিণ গালটা ক্ষণেকের জন্য মাংসল বলিয়া মনে হয়। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় সে খাইতেছে তাই আরামে তাহার চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইয়া আসে। টগরের মমতা বোধ হয়। শশী নাকি তাহাকে ভালবাসে! ভালবাসা!

টগর হাসিল, 'কি রে এখনও আমায় ভালবাসিস?"

খাওয়া থামাইয়া শশী তাহার দিকে চাহিল, কোনও উত্তর দিল না, কেবল তাহার গরুর মত ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। পরে একটু মৃদু হাসিয়া সে বলিল, 'খেয়ে নে তুই এবার।'

টগর নিজের থালা টানিয়া লইল।

বাহিরে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে বাতাস।

কাবুলীওয়ালা দুইটি উত্তেজিতভাবে কি বলাবলি করিতে করিতে তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

'এক গেলাস জল দে তো শশী।'

'দিই।'

হাত ধুইয়া শশী টগরকে জল দিল। একটি বিড়ি ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সে পরে বারান্দার উপর গড়াইয়া পড়িল।

'ওকি রে, খালি মাটিতে শুবি!'

শশী রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'শরীরটাও মাটির তা জানিস, একদিন তা মাটিতে মিশে যাবে—বাউলের গান শুনিসনি?'

মাটি।

ঝঙ্কার দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে টগর বলিল, 'বেশী কথা বলিস না হারামজাদা—ওঠ বলছি! খেয়ে নিই, একটা মাদুর আর বালিস দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

মানদার চীৎকার শোনা গেল—'ওরে তোরা শিগগির আয়—ও বুঁচী—ও টগর, শিগগির আয়—রাধা নড়ে না যে।'

'এ্যাঁ!' টগর উঠিয়া দাঁড়াইল।

'তুই খা না, আমি দেখে আসি'—শশী রাধার ঘরের দিকে গেল।

কি হইল রাধার? টগর আর খাইতে পারে না।

শশী ফিরিয়া আসে না।

বুঁচীর কান্না শোনা যায়, 'ও ভাই রাধা—রাধা।'

টগর যন্ত্রচালিতের মত গিয়া রাধার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। মলিন শয্যার উপর রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু কাবুলীওয়ালা দুইটি অকৃতজ্ঞ নয়, তাহারা একটি টাকা তাহার মাথার নিকটে রাখিয়া গিয়াছে।

ঘরের ভিতর ভিড় জমিয়া গেল। পাশের বাড়ির কমল, মতি প্রভৃতি আর বাড়িউলী আসিল। অনেক জেরা, অনেক চীৎকার, জল ঢালা আর পাখার বাতাস। রাত্রি গভীর হইতেছে।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া গিয়া টগর ভাবে। রাধার নিস্পন্দ দেহটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেই একটা দুর্নিবার বিবমিষা পাকস্থলীতে পাক খাইয়া উঠিল। সে বমি করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে বৃষ্টি জোরে আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি অন্ধকার। এ গলির অন্ধকার আর তাহাদের অন্ধকার জীবনের মত।

বেশ্যার ছেলেটা মমতায় ভাঙিয়া পড়ে। টগরের মাথায় জল ঢালিয়া

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া শশী বলিল, 'এবার ঘুমো টগর—ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে? আচ্ছা—' চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টগর আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। বিমলা। মাটি। 'টগর তোমায় যেন চিনি—তুমি কে?' রাধার মাংসহীন দেহ আর রক্ত। টগর কি করিবে?

শশী মেঝেটা ধুইয়া বাতি নিভাইয়া বারান্দায় গিয়া শুইল।

রাত গভীর হইতে থাকে। বৃষ্টি থামে না, একটানা সুরে অবিরাম পড়িতে থাকে। কালির মত কালো আকাশ।

হঠাৎ টগর বিছানা হইতে উঠিল, বাতিটা আবার জ্বালাইয়া শশীর নিকট গিয়া তাহার দেহে ঠেলা দিয়া বলিল, 'শশী!'

শশী জাগে না, সারা দিনের ঘুম তাহার চোখে।

'ও শশী—শশী?'

'এঁ্যা—কে?'

'আমি।'

'কে—টগর?'

'হ্যাঁ।'

'কি হল?'

'চল।'

'কোথায়?'

'এই না আজ সন্ধ্যাবেলা বলেছিলি কোথায় নিয়ে যাবি আমায়, এই কুকুরের জীবন থেকে আমায় না তুই মুক্ত করতে চাস?'

শশীর ঘুমভরা চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, টগরের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে কি না তাহাই সে কেবল ভাবিতে লাগিল।

'নিয়ে চল শশী—ও শশী—তুই না আমায় ভালবাসিস?' টগরের কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মত কাতরতা, সে যেন বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্তে শশীর চেহারা বদলাইয়া যায়, গরুর মত ড্যাবডেবে ও নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটিতে মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলিয়া উঠে।

টগরের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া সে প্রশ্ন করিল, 'সত্যি বলছিস টগর—না মিথ্যে কথা?'

দুই হাতে টগর এবার শশীকে আঁকড়াইয়া ধরিল, ফিসফিস করিয়া

বলিল—'সত্যি—সত্যি, এক্ষুনি চল শশী, দেরি করলে আর হয়তো হবে না।'

টগরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া শশী ভারী মিষ্টি হাসিয়া বলিল—'চল তবে।'

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি।

রাস্তায় নামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহারা দুইজনে চলিল।

'বড় বিষ্টি—না?' টগর বলিল।

শশী মাথা নাড়িল, 'হ্যাঁ—তাতে কি।'

চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে অনুভব করিয়া টগর আবার বলিল, 'রাত অনেক হয়েছে—আর বড় অন্ধকার—না শশী?'

বেশ্যার ছেলেটা গভীর অনুরাগের সহিত টগরকে আরও নিবিড়তর সামীপ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, 'হোক না, ভয় কি, আমি তোকে আকাশের সূয্যি এনে দেব।'

রাত্রি গভীর। কেহ জাগিয়া নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম আর আকাশটা যেন কালো কালি। তবু—ভয় নাই, বৃষ্টি থামিবে, লোকেরা জাগিবে, রাত্রিও শেষ হইবে, বেশ্যা টগর আর বেশ্যার ছেলে শশীর জীবন নূতন দিনের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ আলো পশ্চাতে ফেলিয়া আসা গলিতে কোনও দিন ছিল না, থাকিবেও না সেখানে তো, চিরান্ধকার রাত্রির চিরন্তন বিলাস।

। এই সীমান্তে ।

মাশুল | আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শীতের ধোঁয়াটে রাত্রি। কন-কনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের ভেতর সেঁধোয়। আবছা অন্ধকারে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত। লক্ষ্য, ফুটপাথের ওধারে জীর্ণ তিনতলার বাড়িটার দিকে। দাঁতের ফাঁকে অর্ধ-দগ্ধ চুরুট জ্বলে-জ্বলে নিভে গেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত।

যাবে?

যাবে না?

যাবে?

কিন্তু এরই নাম মুক্তি? নয়ই বা কেন। উষ্ণ ঘন পিচ্ছিল বিস্মৃতি...। মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কোথায় নেই এই দেনা-পাওনার বোঝাপড়া। সঞ্চয়ের তবিল স্ফীত নয় বলেই তো আজ এই নিঃসঙ্গ শীতের রাতেও ওর প্রতীক্ষায় বসে নেই কেউ।

অযোগ্যতা...?

যোগ্যতার মাপকাঠিতে দুনিয়া চলে? ওই যে তিনতলার ছোট ঘরে আছে মেয়েটি, যে-কোন আগন্তুকের প্রতীক্ষায়, কোন্ যোগ্যতার অভাব ছিল তার! সুশ্রী নম্র বুদ্ধিমতী...। কিন্তু বিধিলিপি এমন কেন?

পানের দোকানের পাশে ছোট অপরিসর গলির মধ্য দিয়ে প্রবেশপথ।

আশেপাশে ভদ্রলোকের বসতি। এমন কি এ বাড়ির পাঁচ মিশালি বাসিন্দাদের মধ্যেও গরীব গৃহস্থ আছে দু-চার ঘর। ভুল করে কোন আগন্তুক যদি তাদের দরজায় ঘা দেয়, আধ-বয়সি গৃহস্থ বউ দরজা খুলে নিস্পৃহ মুখেই জানিয়ে দেবে ভুল জায়গায় এসেছে।

দু-তিন দিনের যাতায়াতে বাড়িটার আনাচ-কানাচ চেনা হয়ে গেছে জয়ন্তর। ভাঙা সিঁড়ি ধরে সোজা উঠে যাবে তিনতলায়। সামনের সরু অন্ধকার বারান্দার এক কোণে রেলিং ঘেঁষে বসে আছে বুড়ি ঝি। বয়সের ভারে দেহ সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। আফিং খেয়ে ঝিমোয় সারাক্ষণ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা মাত্র তার নুমড়ানো শিরদাঁড়া সোজা হবে। অন্ধকার ভেদ করে ঘোলাটে দুটো চক্ষুকোটর সংবদ্ধ হবে আগন্তুকের মুখের ওপর। আস্তে আস্তে দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে আবার। বিড বিড করে বলবে, ভিতরে যান, ঘরে আছে—।

ব্যতিক্রম ঘটল। এই দারুণ শীতে স্যাঁতেসেঁতে সরু বারান্দায় বুড়ি বসে আছে ঠিকই। কোলে কম্বল জড়ানো পুঁটুলির মত একটা কি। অন্ধকারে জয়ন্ত ঠাওর পেল না। বুড়ি তেমনি মুখ তুলে দেখলে ওকে, বলল, বাইরে গেছে, ঘরে গিয়ে বসুন।

অপ্রত্যাশিত নিরাশা। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না জয়ন্ত। বুড়ি আবার বলল, সামনের দোকানে গেছে, এক্ষুনি আসবে, ঘরে গিয়ে বসুন—।

প্রায় আদেশের মত শোনায়। ওই একটি মাত্র ঘর তিনতলায়। ভিতরে প্রবেশ করে জয়ন্ত দরজাটা ভেজিয়ে দিল আবার। বুড়ির দৃষ্টির নাগালের কাছে থাকাটাও অস্বস্তিকর। সুপরিচ্ছন্ন ছোট ঘর। ধপধপে বিছানা পাতা। দেয়ালের গায়ে গোটা কতক দেবদেবীর মূর্তি। ঘরের অধিবাসিনীর ফটোও আছে একটা। নাম নীলা।

বসে আছে জয়ন্ত। খুশীর আমেজ লাগছে যেন। একটু বিরক্তিও। যেন নিজের ঘরটিতে বসে আছে সে, আর তারই নিতান্ত আপন কেউ বলা নেই কওয়া নেই নিশ্চিন্ত মনে বাইরে ঘুরছে কোথায়। এত শীতে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করাও তো বিচিত্র নয়।

লঘু পদধ্বনি। কণ্ঠস্বরও শুনল একটু বাদেই, মা গো কী শীত বাইরে, একি! এই ঠাণ্ডায়…

বুড়ির শীতল কণ্ঠে বাধা পেয়ে থেমে গেল!—একজন বাবু বসে আছে ঘরে।

জয়ন্ত উৎকর্ণ। অনুচ্চ কণ্ঠের তর্জন শোনা গেল, পারিনে আর, যেতে বলে দিলে না কেন—!

বুড়ি ততোধিক শান্ত—জয়ন্তবাবু অনেকক্ষণ বসে আছে, ঘরে যা—।

মর্যাদাটুকুর অর্থ স্পষ্ট ও নগ্ন। আফিংখোর বুড়িঝিও জয়ন্তর দুর্বলতার খবর জানে। বাদানুবাদ দূরে থাক, গেল বারে কত দিল না দিল ভালো করে না দেখেই সে পালিয়েছিল। একটু আগের খুশীর ভাবটুকু কেটে গেল। বিকৃত হাসি দেখা দিল মুখে, প্রতিমুহূর্তের অভ্যর্থনা এখানে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় জেনেই তো আসা।

আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করল মেয়েটি। দরজা আবজে দিল। গায়ের গরম আলোয়ানটা আনলায় রাখল। মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল তারপর।

জয়ন্ত দেখছে। অভিসারিকার বেশ নয়, সাদাসিধে আটপৌরে শাড়ি, ব্লাউজ। দোকানে যাওয়ার কথাটা বুড়ি বানিয়ে বলেনি হয়তো।

অনেকক্ষণ বসে আছেন তো?

জয়ন্ত স্থির, শান্ত। দেনা-পাওনার সম্পর্কটা আজ ভুলবে না কিছুতে। বলল, ঝি যেতে বলে দেয়নি, তুমি বললেও তো পার।

তার পাশ ঘেঁষে বসল নীলা। বলল, বাবা, এও কানে গেছে! কিন্তু আপনার নাম শুনে তো আর কিছু বলিনি—।

অন্যদিনের মত আজ আর গল্প জমল না। জয়ন্তর ভাবুক মনের তাল কেটেছে। শুধু তাই নয়, নীলাকেও অন্যমনস্ক দেখছে কেমন। অন্যদিন ও অনভিজ্ঞ অতিথির বিপর্যস্ত হাবভাব লক্ষ্য করেছে নিঃশব্দ কৌতুকে। আজ নিজের অজ্ঞাতে বন্ধ দরজার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে বারবার। হঠাৎ জোর করেই একটা হাই তুলে নীলা বলে ফেলল, ঘুম পাচ্ছে ·।

মুহূর্তে দু'চোখ জ্বলে উঠল জয়ন্তর। এও তো যেতে বলারই নামান্তর। অর্থাৎ যত শিগগির পার টাকা দিয়ে বিদেয় হও। কিন্তু আজ জয়ন্তও করবে দোকানদারী।

নির্মম দৃঢ় নিষ্পেষণে সে কান পেতে শুনতে চাইল ওর বুকের উষ্ণ স্পন্দন। বদলে বাইরে থেকে হঠাৎ কানে এলো শিশুর সুস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে নীলা চমকে উঠল যেন।

কী—?

নীলা জবাব দিল, কিছু না।

পরক্ষণে আবারও। এবারে কাতর কান্না। বাইরে বুড়ি ঝির তাকে থামাবার চেষ্টা। ঘরে দুই সবল বাহুর মধ্যে নীলার অস্বস্তি।

জয়ন্ত উঠে বসল—বাইরে কাঁদছে কে?

নীলা থতমত খেয়ে গেল কেমন।

কে কাঁদছে বাইরে?

মেয়ে।

কার মেয়ে?

আমার।

জয়ন্ত নির্বাক! দুই চোখে নির্বোধ বিস্ময়। বুড়ির কোলে পুঁটলির দৃশ্যটা মনে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে ঘরের মধ্যে জায়গা হয়নি।···একটি মাত্র ঘর।

কত বড় মেয়ে?

দেড় বছর··।

অন্য দিন তো দেখিনি?

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, নিচের তলায় একজন ভাড়াটের কাছে থাকত··।

জয়ন্ত সমস্ত দেহে কি একটা শীতল পদার্থ যেন ওঠানামা করছে। গম্ভীর মুখে আদেশ দিল, ঘরে নিয়ে এসো।

নীলা হকচকিয়ে গেছে আগেই। উঠে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে গেল। জয়ন্ত কান পেতে শুনল, বুড়ি ঝি ফিস ফিস করে বলছে—জ্বরে গা পুড়ে গেল কতক্ষণ আর ঘুমুবে।

নীলার অন্যমনস্কতা, ঘুম পাওয়া, কান্না শুনে চমকে ওঠা, সব কিছুর অর্থ সুস্পষ্ট হল এতক্ষণে। হাসি পাচ্ছে জয়ন্তর। নির্মম, নিষ্করুণ হাসি। মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধ বিধাতার সকলের বড় আশীর্বাদ···সকলের বড় অভিশাপও নয় কেন?

মেয়ে কোলে নীলা ফিরে এলো। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বসল চৌকির ওপর। জয়ন্ত চেয়ে আছে বিস্ফারিত নেত্রে।···একমাথা অবিন্যস্ত কোঁকড়া চুল, শীতে আর জলো হাওয়ায় গাল দুটো ফেটে দগদগে লাল হয়ে গেছে!

পাতলা বিবর্ণ দুই ঠোঁট থেকে থেকে কেঁপে উঠছে থরথর করে। নইলে আর পাঁচটি শিশুর মতই সুন্দর।

জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হয়ে পড়েছে আবার; বুকের সর্দিতে প্রতিটি শ্বাসের ঘড় ঘড়ানি শুনতে পাচ্ছে জয়ন্ত। ওর বুকের ভেতরটাও কে যেন নিংড়ে দুমড়ে একাকার করে দিল হঠাৎ। বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ দিয়েছ কিছু?

আনতে গিয়েছিলাম, দোকান বন্ধ।

অনুচ্চকণ্ঠে জয়ন্ত ধমকে উঠল, এ তো আর তোমার দোকান নয় যে সারা রাত খোলা থাকবে, আগে কি করছিলে?

নীলা শান্ত মুখে তাকাল তার দিকে—আগে টাকা ছিল না।

আর সাড়া শব্দ নেই। জয়ন্ত নির্বাক নিস্পন্দ।...মৃতকল্প শিশুর জায়গা তখনো ছিল বাইরের অন্ধকারে ওই স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়, বুড়ির কোলে। এই একটি মাত্র ঘর ওষুধের টাকা জুগিয়েছে। কিন্তু দোকান তখন বন্ধ। দরজার দিকে চোখ পড়তে জয়ন্ত দেখল, বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। ঘরে ঢুকল। খানিক নীরব থেকে ঘরের পরিস্থিতি অনুভব করল যেন। টানা গলায় নীলাকে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে, দে নিয়ে যাই।

নীলার বিব্রত দুই চোখ পড়ে সামনের মানুষটার দিকে। কপালের কাছটায় দপদপ করছে জয়ন্তর। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল চৌকি ছেড়ে। জ্বলন্ত দৃষ্টি বুড়ির মুখের ওপর। বুড়িও চেয়ে আছে তার দিকে। নির্বিকার, নিস্পৃহ। মড়ার মত ঘোলাটে চোখ দুটো যেন হেসেও উঠল একবার। খুক খুক করে কাশতে কাশতে বাইরে চলে গেল বুড়ি।

অকস্মাৎ একটা সন্দেহ সজোরে নাড়া দিল জয়ন্তকে। তাকাল নীলার দিকে।—ওই বুড়ি কে?

নীলা ভয় পেয়ে গেছে। শুকনো মুখে চকিতে দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একবার।

কে, ও?

মা।

ঘর ফাটিয়ে আবার হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে জয়ন্তর। ঠিকই অনুমান করেছিল। নীলা বসে আছে মূর্তির মত। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা দেখছে জয়ন্ত।...বিশ বছর, পঁচিশ বছর পরের একটা সম্ভাবনা ভাসছে।

সামনের তাজা নারী দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। তার বদলে বসে আছে পলিতকেশ লোলচর্ম এক জরাজর্জর বৃদ্ধা, কোলে তার নতুন কোন আধমরা শিশু, মাথার ওপরে ছাদ নেই, ভিজে স্যাঁতসেতে শীতের হাওয়া—সামনের দরজা বন্ধ।...নগ্ন প্রত্যাশার উল্লাসে সেখানে ধক ধক, ধক ধক করছে এক আদিম নর-দানবের জলন্ত হৃৎপিণ্ড—নির্মম, নৃশংস, মাংস-লোলুপ :

॥ মহুয়া কুণ্ডা ॥

স্মৃতির দুর্গ | গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কুমারনাথ যে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে, এমন 'আকাশ কুসুম কল্পনা' কোনো কল্পনাতেও আনেনি। উদয় দত্ত আরও একটু বেশি স্বপ্নবাদী বলে সে কুমারনাথের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে হাজির থেকে দস্তুরমত হৈ-হুল্লোড় করবার পরও বিশ্বাস করতে পারছে না যে সত্যিই এ ঘটনার অঘটন সম্ভবপর হয়ে গেছে। জুতো জোড়াকে দ্বিতীয় দফা পালিশ ঘষতে ঘষতে সে আপন মনে হেসে উঠল, বাঃ বেশ মজা তো—কুমারের বিয়েটা উড়িয়ে দিচ্ছি, অথচ তার বৌভাতে যাবার জন্যে আধঘণ্টা জুতোই চকচকে করছি। হাসির বেশ বেশিক্ষণ রইল না। উদয় আরও খানিকক্ষণ বিনামা-বিলাস করে খুশী মনে উঠে দাঁড়াল—জুতোর গায়ের চামড়াটা আয়নার মত ঝকঝকে হয়েছে এবার। কবে যে ওর মগজে ঢুকেছিল, 'A man is judged by his shoe' তা মনে নেই, তবে এই বাণীটুকু মন থেকে মুছতে পারে না। এখন তবু নির্দিষ্ট আয় তার আছে, জুতোতে তালি না লাগিয়েও পদমর্যাদা বজায় রাখতে পারে—যখন জীবন ধারণের জন্য প্রতিমুহূর্তে জোড়াতালি দিতে হত সে আমলেও উদয় হাফসোল দেওয়া জুতো পরত না। উদয় দত্ত বেশ বড়

মুখে বলে, 'পদমর্যাদাটা' ফালতু কথা নয়, দস্তুর মত আচার-আচরণেও প্রতিফলিত হওয়ার মত মূল্যবান কম্যাণ্ডমেণ্ট।

জুতো পালিশ হয়ে যাওয়ার পর ধূমপান করা চলে। হাতে পাকানো সিগারেট টানতে টানতে আবার কুমারনাথের কথাই মনে পড়ল! আড়চোখে জুতোর পালিশটা পরখ করে উদয় মাথা নাড়ল—নাঃ অবিশ্বাস করার কোন মানে হয় না। বিয়ে না করলে হয়তো কুমার ছোকরার জীবনের সঙ্গে আদর্শের সঙ্গতি বজায় থাকত। অথবা যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে বলে সবাই জানে, তাকেই যদি কুমার বিয়ে করত তাহলে এই একটা দুঃসাহসিক কাজের নজীরেই সে আদর্শের দিক দিয়ে অনেক বড় হয়ে যেত। তা হতো বৈকি। আর সেটাই কুমারনাথের মত বেয়াড়া ছেলের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ হত। কুমারনাথকে বেয়াড়া বললে খাটো করা হয়, আবার উদয় বা নিশিকান্তের মত নিতান্ত সাধারণ ভাবলেও ভুল করা হয়। ওর সঙ্গে আর কারুর ষোল আনা মিল নেই। তাই ওকে ঘিরে অনায়াসে অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা করা চলে।

যে যা-ই হোক কুমারনাথের চরিত্রের সঙ্গে গৃহপালিত সুবোধ বালকোচিত বিয়ে বেহদ্দ বেমানান হলেও বাস্তবে এটা ঘটেছে। অতএব উদয়কে আজ কুমারনাথের বৌভাতে যেতে হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে উদয় দৌড়ল ডাইং ক্লিনিং-এ। পাঞ্জাবি না পরে গেলে নেমন্তন্ন বাড়িতে কেমন বেখাপ্পা লাগে নিজেকে।—'ধোপ দুরস্ত' দোকানটার নাম। পাড়াতে এই একটিই ধোলাই ঘর। কথার ঠিক রাখার গরজ দোকানদারের নয। আর্জেণ্ট কাচতে চার-পাঁচদিনও লেগে যেতে পারে। এবং সব ব্যাপারে দোকানদার যোগেনবাবু খুব সিধে কথার মানুষ—মুখের ওপরই বলে থাকেন—'দিচ্ছেন বটে আর্জেণ্ট, দেরি হলে তো আমাকেই দুষবেন মশাই। আমি বলি কি অর্ডিনারীই দেওয়া ভাল, তাতে কাপড়ের লঙ্গিবিটি বাড়ে। আমার নয় দুটো পয়সা লোকসানই হবে—তা বলে এই মাগ্গি গণ্ডার বাজারে—।' আজও সেই দশা হল, উদয়কে ব্যাজার মুখে খালি হাতেই ফিরতে হলো।

পথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক এক নজর দেখে নিয়ে সে টুক করে হরিপদ মুখুজ্জের বৈঠকখানাতে ঢুকল। হরিপদ মানি প্ল্যাণ্টের গ্লাসের জল পাল্টাচ্ছিলেন, মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—কি মনে করে হে বিজয়বাবু!

হরিপদকে উদয় আদৌ পছন্দ করেন না। কতকটা রুক্ষস্বরেই বলল অন্যদিকে তাকিয়ে—বিজয় নয়, উদয়—বুঝলেন। হ্যাঁ, এই আংটিটা রেখে দশটা টাকা দিতে পারবেন ?

—কই মালটা হাতে দাও, পরখ করে দেখি !

আলগা হাতে আংটির ওজন পরখ করে বললেন—'তোমাদের না দিলে কি পাড়াতে বাস করতে পারব! তা ছাখো বাবু, সেবারের মত সুদের পয়সা হজম করে দিও না।'

উদয় হাসতে হাসতে বলল—সে টাকা তো আমি নিইনি, নিয়েছে কুমার! তা আপনি যে তেমনি পঞ্চাশ মণ সাবানের ডিউটি মুফ্‌তি ফাঁকি মারলেন, সে তো কুমারের দৌলতেই।

—না, না, তা নয়। এমনি বলছিলুম হে। তা সেই—তোমার কুমারবাবু বুঝি বদলি হয়ে গেলেন। ছাখো দেখি ফ্যাসাদ, বলা নেই, কওয়া নেই, হুট্‌ করে নতুন একটা ইনস্‌পেক্টার হামলা করে গেল। তোমাদের আক্কেল থাকলে বদলির খবরটা দেওয়া কর্তব্য ছিল।

—আমায় জলদি দিন, তাড়া আছে। সন্ধ্যেতে একটা নেমন্তন্ন—

পরম বিজ্ঞ হাসিতে রেখাবহুল মুখখানা তুলে একবার তাকিয়ে হরিপদ বললেন—কোথায় নেমন্তন্ন—ট্যাকা-ফ্যাকা নিয়ে চললে যে সোনাগাছিতে বুঝি!

টাকাটা এখনো হস্তগত হয়নি. এ অবস্থায় খামোখা ঝগড়া বাধিয়ে অসুবিধেতে পড়তে চায় না উদয়—নইলে সে হয়তো হরিপদর বাপ-পিতেমো তুলেই বসত। মনে মনে সে গালাগালি দিল, জানোয়ার।

একটা অসহিষ্ণু নিঃশ্বাস ফেলে কোন রকমে উদ্যত উষ্মাকে সামলে নিল উদয়। টাকা হাতে নিয়ে সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হরিপদর চোখে চোখ রেখে বলল—আংটিটার পাথরখানারই দাম পঞ্চাশ টাকা, বুঝলেন।

—তা, কি হয়েছে তাতে! পাঁচ শ' টাকা হলেও ক্ষতি ছিল না। তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে, এখনো কথাবার্তায় ঝাঁজ মরেনি—কুটকুটে ব্যাচেলার কি না।

হরিপদ মুখুজ্জের ঘর থেকে কেউ বেরুলেই তার দিকে পাড়ার লোক তাকায়। এমনি সহজভাবে তাকালে তো ক্ষতি ছিল না, যাকে দেখছে তার নজর বাঁচিয়ে ছাখে—যেন লক্ষ্যই করছে না। সবাই জানে এ ঘরে যে ঢোকে

সে 'ফক্কুরে' হয়েছে। ঠাট বজায়ের দায়ে পড়ে এখানে আসে সবাই—কিন্তু অন্যের নজর বাঁচিয়ে।

কুমারের বৌভাতে কি উপহার দেবে উদয়? বই, ফুলদানী, টেবিল ল্যাম্প কোনটাই মনোমত লাগছে না। দশ টাকার মধ্যে একখানা শাড়ি হবে না? শাড়ি কিংবা রূপোর সিঁদুরকৌটো ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া সঙ্গত নয়, কেননা কুমার তার বাপ-দাদার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করেই রংচটা সামাজিক জীব প্রতিপন্ন করেছে আপনাকে। অথচ এই ঘরকন্নার ছকে বাঁধা সুবিধাবাদী জীবনের ওপর ওদের সকলেরই প্রচণ্ড অবজ্ঞা। ওরা চোখের ওপর দেখছে, বিশেষ করে গৃহপালিত বিবাহিত মানুষগুলো এক নাগাড়ে আপন স্বার্থচক্রে সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে তাল বজায় রেখে পাক দিয়ে কাটাচ্ছে! এদের কাছে দেশ, সমাজ, কিছুই কিছু নয়। · উদয় মনে মনে কুমারনাথের দাম্পত্য-জীবনের ছবি আঁকে। তার চোখ কুঁচকে এল, ঠোঁটের ডগায় অশ্লীল তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল। বিড-বিড করে উঠল সে—কুত্তার ডিম, শুয়োর—।

স্যুটকেস্‌টা খুলে উদয় জামা কাপড় বাছতে লাগল। পুরনো পাঞ্জাবি একটা ছিল, সেটা কোথায় যে গেল—। কোন নবাব দরকারের সময় নিয়ে শটকেছে আর ফেরত দেয়নি—এখন তুমি মরো। সেটা যে বেপাত্তা তা উদয়ের মনেও ছিল, তবু একবার উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখে নিল।—যেন খুঁজতে পারলেই পাঞ্জাবি গজিয়ে উঠবে। নিজেকে আহাম্মক প্রতিপন্ন করে একটু খুশী হল উদয়। আজকাল সে আগের মত আর নিজেকে মোটেই বুদ্ধিমান ভাবে না। দুনিয়ার সব মানুষকে নির্বোধ বলে জানাটুকুর মধ্যেও পুরনো আরাম নেই—এখন নিজেকে মূঢ় ভেবে তবু কিছুটা সুখ পাওয়া যাচ্ছে। এটা মন্দ নয়।

কিন্তু দুটো শার্ট ছাড়া তৃতীয় কোন জামা নেই! শার্ট দুটোর বয়স বছর খানেক হবে। হ্যাঁ, তা হবে বে-ওজোর। বেলারাণীর দর্জির কারবারের প্রথম আমলে এ দুটো অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছিল উদয়। এক বছরেও শার্ট দুটোর আয়ু অক্ষুণ্ণ থাকার কৃতিত্ব কাপড়ের মিলের নয়—দর্জির। বেলার হাতের গুণে জামার বুক-পেট-হাতা সবই প্রায় সমান প্রশস্ত। তারিফ করে উদয় বলেছিল—খাঁটি ডেমোক্রেসী এবং প্রথম প্রথম সগৌরবে এই শার্ট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াত সে। যেহেতু বেলাকে কাটা কাপড়ের কারবারে নামানোর

মূলে ছিল কুমারনাথের অসাধারণ মগজ সেহেতু উদয়ের এই রসিকতায় কুমার হাড়ে হাড়ে চটে যেত। একদিন সে আর সামলাতে না পেরে বলেছিল—' দোহাই, তোকে আমি চারটে জামার খরচ দেব, ওই শার্ট দুটো তুই পুড়িয়ে ফ্যাল্‌…। বেলারাণীর মুখখানা মনের ভেতর ঘোরাফেরা শুরু করেছে। উদয় অকারণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

উদয় একটা শার্ট বার করে চৌকির ওপর রাখল। শার্টটাকে ঘিরে অনেক টুকরো ছবি উদয়ের মনের অলস পটে আঁকা হয়ে যাচ্ছে। বেলারাণী এখন কি করবে? প্রথম যেদিন উদয় গিয়েছিল বেলারাণীর ঘরে সেদিন এ রকম কোন প্রশ্নই ওঠেনি। বরং দু-চারটে রসের কথাই বলেছিল উদয়। এমনকি, যেদিন কুমার নিশিকান্তকে ঢালাও হুকুম দিল—'আজ থেকে তোমার বাড়ির বা পাড়ার কোন ছেলেমেয়ের, বৌ-ঝির জামার অর্ডার আমি ছাড়া আর যেন কেউ না পায়—' সেদিন ওরা সবাই অবাক হলেও ভাবতে পারেনি যে, কুমার শেষ পর্যন্ত বাজারের এক পেশাদার বেশ্যাকে সুপথে আনবার জন্য সেলাই কল কিনে দিয়েছে এবং তার জন্য অর্ডার কুড়িযে বেড়াচ্ছে। ওরা ভেবেছিল কুমার নিজেই বুঝি দর্জির দোকান দিয়েছে। যখন আসল ব্যাপারটা কুমার ভেঙে বলল তখন উদয়ই প্রথম গলাবাজি করে বলেছিল— 'আমার ভাই দুটো শার্ট তৈরী করিয়ে দাও, মজুরী কিন্তু অন্য দর্জির চেয়ে বেশি চেয়ো না, তোমার মত আবগারীর ঘুষ তো জোটে না কপালে।'

মুখ্যতঃ কুমারের পেশাবের মেয়েমানুষ হলেও বেলারাণী ওদের সকলের সঙ্গে দিনে দিনে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল না, দিনে দিনে একটু একটু করে নয়, দুদিনেই ওর অন্তর অকপট দ্বিধাসঙ্কোচশূন্যভাবে খুলে দিয়েছিল বেলারাণী, বাকী দিনগুলো কেটেছে সেই অন্তরঙ্গতার মিষ্টি স্বাদটুকু উপভোগের আমেজে। অবশ্য দেহ-বিনিময়ের সম্পর্ক বেলার সঙ্গে কুমার ছাড়া, ওদের দলের আর কারুর ঘটেনি। তেমন ইচ্ছে হলে তুমি অন্য ঘরে যেতে পার, এই ছিল ওপাড়ার দস্তুর—তা দরকার পড়লে অন্যত্র গিয়েছে বইকি বাকী সকলে।

ও বাজারের নিয়মই এইরকম। অন্য অচেনা পুরুষকে খরিদ্দার হিসেবে মেয়েরা কারবারের রীতি প্রথা অনুযায়ী সব কিছুই করবে, খোদ খরিদ্দার ছাড়া তার সঙ্গী-সাথী-ইয়ার বন্ধুদের খাতির যত্ন করতেও বাধা নেই, কিন্তু শেষ সীমায় দেহদ্বার বন্ধ রাখাই আদব। এটুকু যে মেয়েমানুষ না মেনে চলে সে লাঞ্ছিত হয়, পক্ষান্তরে কোন পুরুষমানুষ যদি এই সীমা ডিঙোতে চায় তবে

তারও কপালে দুর্গতির অন্ত থাকে না—তাকে দেহবিলাসিনীরা চরিত্রহীন অমানুষ বলে চোখ বাঁকিয়ে ঠোঁট উল্‌টে থুথু ফেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা বলে বেলার ক্ষেত্রে এ জাতের প্রশ্নই ওঠেনি। বেলা হয়তো বয়সে ওদের চেয়ে দু-এক বছরের বড়ই হবে, তবু 'দাদা' বলেই সম্বোধন করে। ওর আচার-আচরণে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুর ঝরে পড়ে। মেয়েটিকে উদয়ের ভালই লাগত—ভাল লাগত ওর গানের কণ্ঠ, ওর কথা বলার বিশেষ ধরনেও একটু অবিশ্লেষ্য মাধুর্য পেয়েছে উদয়। কুমার যে ওই মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল সেজন্য কেউ ওরা এতটুকু আফসোস করে নি। বরং নিজেদের ঔদার্যহীনতার গ্লানিতে নিজেকে কুমারের কাছে খাটো বলেই মনে হয়েছে উদয়ের। সেই আক্ষেপ মেটাবার মানসে উদয় দু-একবার কুমারের অনুকরণ করতে গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্য সে নিজেই দায়ী—কিংবা সেরকম মনের মত মেয়ে না পাওয়াই হেতু তা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করেনি—তবে এটুকু সে বেশ বুঝেছে যে, সবাই সব কাজ পারে না। অর্থাৎ উদয় আর কুমার এক নয়।

…নাঃ আর বাজে ভেবে সময় বইসে লাভ নেই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আদর্শ আর বাস্তব, কল্পনা আর ঘটনা, এক পথে হাঁটে না। কুমারকে দোষ দিযে কি হবে। হয়তো উদয়ও এমন ক্ষেত্রে অন্য কিছু করতে পারত না। এবার ভাবনা রেখে নিজেকে ধোপা মুচির বিজ্ঞাপন সাজিয়ে বিয়ে-বাড়িতে চট্‌পট্ হাজির হওয়া দরকার। পথে কুমারের বৌ এর জন্যে একখানা শাড়ি কিনতে হবে।

চাঁপা ফুল রংটার মোহ উদয় কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না। বিয়ের দিন কুমারের বৌকে এক নজর দেখেছিল বটে, তবে এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না—মেয়েটি দেখতে কেমন, এমন কি তার গায়ের রংটাও নয়। তবে, মেয়েকে কেমন মানাবে সে ভাবনা বাদ দিয়ে যদি কাপড় দেখে পছন্দ করতে হয় তাহলে এই চাঁপা রংকেই সেরা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দামও তেমনি। পকেটের সব ক'টি টাকা ধুয়ে মুছে বেরিয়ে গেল। তা যাক, তা বলে নজরকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না উদয়। সে তো নিশিকান্ত নয় যে, সব সময় হিসাবের খাতা চোখের সামনে মেলে চলবে! আর কুমারনাথের বিয়েও বছরে দশবার হচ্ছে না। মোট কথা কুমারের বিয়েতে

উদয় যে দুঃখ পেয়েছে সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত হয়ে থাকাই ভাল। সে কুমারকে ভালবাসে, কর্তব্যটুকু অন্ততঃ করতেই হবে।

কাপড়খানা কিনে সে দোকানদারকে বলল—হ্যাঁ মশাই পছন্দ করবে তো—নাকি ?

এক গাল হেসে বুড়ো সেলসম্যান চোখ মটকে জবাব দিল—আপনার নজর আছে। যিনি পরবেন তিনি বেশ ফর্সা নিশ্চয়।

—তাহলেই ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি।

লিকলিকে ঘাড়খানা যতদূর সম্ভব কাৎ করে বুড়ো বলল - চোখ বুজে নিয়ে যান আপনি। এ হল মোকামের সেরা মাল, যে গায়ে চড়বে সে গায়ের রং কিছু না হোক দু-পোঁচ খোলতাই মালুম হবে।

মানানসই খামে গুছিয়ে শাড়িখানা বগলে নিয়ে দোকান থেকে নেমেই উদয়ের মনে হল যেন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। পকেট হাতড়ে সব মিলিয়ে যা পয়সা পেল তা থেকে এক কাপ চা খাওয়া হয়, টোষ্ট খেলে আর সিগারেটের পয়সা থাকে না। পথ চলতে চলতে হিসেব করলে উদয়, আবার কালই গোটা পাঁচেক টাকা কারুর কাছে ধার করতে হবে।... মাসের শেষে বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া বেশ ঝকমারী।

তখন হরিপদর কাছে আর গোটা পাঁচেক টাকা বেশি চাইলেই হত। তাহলে আগামী কাল দিক্‌দারীতে পড়তে হত না। কিন্তু ষোল টাকা দিয়ে যে হুট্‌ করে শাড়ি কিনবে উদয় কি তা জানত! নাঃ কাজটা বড্ড বেমক্কা হয়ে গেল। বাজেট ছিল দশ, হাতে যা ছিল তাতে মাসটা লেংচে পার করা যেত—। দশ টাক ধার করা কিছু গরহিসেব হয়নি। তবে মেজাজ দিন দিন নবাবপুত্তুরের মত হয়ে উঠছে—হাতে পয়সা থাকলে খেয়ে-খাইয়ে দিলদরিয়া করে ফুঁকে দিতে পারলেই স্বর্গসুখ।'

বিরক্ত হয়ে উদয় নিজেকে জব্দ করবার জন্য সংকল্প করল—'খাওয়া হল না। নো চা—। সিগারেটের ধোঁয়া লাগিয়ে ক্ষিদে দাবিয়ে রাখ, একেবারে লুচি-মাংসে উসুল দিও।'

পানের দোকানের ঝাপসা আয়নাতে নিজের সুরত দেখে উদয়ের হাসি পেয়ে গেল। ক'মাসে বেশ মোটা হয়েছে তো উদয়। আরো একটু ভাল করে দেখল—বাঃ বাঃ, শার্ট তো নয় বালিশের খোল পরেছে সে।

এই সাজে তাকে দেখে বিয়ে বাড়িতে সবাই কি বলবে। কুমার তো ক্ষেপে আগুন হবে। দেখে নির্ঘাত সে চিনতে পারবে, বেলারাণীর হাতের ছাঁট। শার্টের হাতা হতকুচ্ছিৎ বানালেও বেলার নিজের হাতের গড়ন কিন্তু ভারি সুন্দর গোল গোল। অমন যার হাতের গড়ন—নরম কিন্তু টান-টান, সেই হাতের এই সৃষ্টি। কুমারের যেমন খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না। বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়ে বেলাকে বেহুলা সতী করার আর পথ খুঁজে পেল না হতভাগা। সেইকালে উদয় বলেছিল—'ওসব বুজরুকী রেখে চিড়িয়াকে শাদি করে ফ্যাল।' কুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিল—'এটা তারই ফার্স্ট স্টেজ রে। ওকেও তো একটা ওয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। আমি যদি শালা টি-বিতে ফৌত হয়ে যাই তখন কি আমার বাপ-দাদা আমার প্রস্-ওয়াইফকে পাত্তা দেবে? আরে ব্রাদার বিয়ে করব বলেই তো এত ঝক্কি পোয়াচ্ছি। ওরও একটা ভোকেশন্যাল ট্রেনিং হয়ে রইল। অবিশ্যি জানি তোরা থাকতে ওর তেমন ব্যাডলাক হবে না। তবে আই ডোন্ট লাইক ডিপেণ্ডেন্স—ওরও সেইরকম টেস্ট, বুঝলি না।'

বিবস হাসি হেসে উদয় সিগারেট ধরাতে মুখের কাছে দড়ির আগুন তুলল—কোথায় গেল কুমারের সেই নোবল আইডিয়া!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উদয় এক ঝলক ধোঁয়া ছাড়ল—বেচারী বেলা! বেলা এখন কি করবে? 'ব্যাক টু বডি বিজনেস'—তাই কি সহজে আর পারবে। গতবারে শিবরাত্রির উপোস করল বেলা, সেই উপলক্ষে নেমন্তন্ন ছিল ওদের রাত জাগার। এতখানি এদিকে ঝুঁকে পড়বার পর ওই মেয়ে কি আবার পাবলিকের বারো জনকে খাটে জায়গা দিতে পারবে! রুচিতে আটকাবে নির্ঘাত।

আচ্ছা বেলা কি বিয়ের খবর জানে? বোধহয় জানে না। উদয়কেই তো দিন চারেক আগে কুমার বলেছে। তাও নিজে থেকে নয়, নিশি-কান্তকে দিয়ে বলিয়েছে। কাওআর্ড—ব্রুট—হার্টলেস পিগ। হঠাৎ উদয়ের মাথাটা গরম হয়ে উঠল। আলবাৎ কুমার একটা নিষ্ঠুর অমানুষ। হ্যাঁ আলবাৎ—। যেন এতক্ষণ নিজের কাছে এই কথাটা বলতে চেষ্টা করেও সে সাহস করেনি। যেন কুমারের এই অমানুষিক কাজটার পিছনে উদয়ের সায় ছিল বলে মিথ্যে অপরাধ-বোধ তাকে

ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ অসতর্ক চিন্তার ফলেই কুমারকে সে সাংঘাতিক প্রতারক ভেবে বসল। ভাবনার মজাই হল এই—একবার ভাবতে শুরু করলে আর তার ওপর খবরদারী করতে পারে না মানুষ। তখন ভাবনার পিছু পিছু তাকে চলতেই হবে।...উদয়েরও সেই দশা। সে বেঁকে দাঁড়াল। এরকম হীনচরিত্র স্বার্থলোভী মানুষের বিয়েতে যাওয়া মানেই তো তাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করা। কুমার এতদিন হয়ত চরিত্রহীন ছিল কিন্তু সে হীনচরিত্র হয়ে পড়েছে। চরিত্রহীনতার মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু হীনচরিত্র মানুষ জঘন্য পর্যায়ের জন্তু। আর উদয় একজন খাঁটি মরালিষ্ট হয়ে কি না সেই রকম একটি ব্যক্তির বৌভাতে উৎসব করতে চলেছে।

কুমারের জীবনে যেটা বাস্তব বলে স্বীকৃত, সেটা উড়িয়ে দিতে না পারলেও, প্রতিবাদ করার হক্ তার কেউ কেড়ে নেয়নি। প্রথম যখন বিয়ের কথা শুনে খটকা লেগেছিল তখন থেকেই উদয় মনে মনে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু কেবলমাত্র ভাল না-লাগাটার কোন মূল্য নেই—তাকে চিহ্নিত করার মত প্রত্যক্ষ কোন কাজ খুঁজে পাওয়া চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই উপায়টুকু দেখা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকেও জোর দিয়ে বোঝাতে পারে না যে, সত্যি সত্যি ভাল লাগছে না। তখন মানুষ পাইকারী ফতোয়া দিয়েই নিজেকে থামিয়ে দেয় যেমন উদয় দিয়েছিল, এই বলে যে, সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না অথবা পারলেও সাহস করে না, বা সাহস করলেও সে বাচাটা সুখের হয় না—সেই জন্যেই কুমার বেলাকে ভালোবেসে শেষে এরকম একটা বিয়ে করল!...কিন্তু যে মুহূর্তে প্রতিবাদের প্রতীকচিহ্ন আবিষ্কার করল উদয় সেই মুহূর্তে আগেকার পাইকারী ফতোয়াকে বাতিল করে যেন বাঁচল। জেলখানা থেকে হঠাৎ বিনা সর্তে মুক্তির আনন্দে উদয় আচমকা অট্টহাসি হেসে অভিনন্দন জানাল নিজেকে।

তাহলে এবার তার যাত্রা বেলারাণীর ঘরে। দুনিয়ার লোকে যা-ই বলুক উদয় বেলারাণীকেই কুমারের 'বৌভাতে শাড়িখানা' উপহার দেবে। এতদিন ধরে কুমার যে কথা বলে এসেছে সে কথার দাম এমনি করেই দেবে উদয়। পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ রইল যে বেলারাণীকে কুমারের স্ত্রীর মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত নয়, ভীত নয়।—এ ব্যাপারে সমাজের দোহাই পেড়ে,

সামঞ্জস্যের গোঁজামিল দিয়ে, আদর্শের টুঁটি টিপে খতম করে, উৎসবের জাঁকজমকে আসল সত্যকে ধামা চাপা দিতে পারবে না উদয়।

বেলারাণীর বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত উদয়ের কোন হুঁশ ছিল না। প্রচণ্ড একটা ঝড়ের বেগে তার সমগ্র সত্তা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। বিরাট পৃথিবীর তাবৎ মিথ্যাচারী মানুষগুলোর বিপক্ষে একলা লড়াই করবার উদগ্র উত্তেজনায় সে টগ্‌বগ করে ফুটছে—যে কোন মূহূর্তে প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে পড়বে সে।

গলির মুখে যারা ঘোরাফেরা করছে তাদের চেনে উদয়। এ পাড়ার ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর সদর কখনো বন্ধ থাকে না। সরাসরি তিনতলায় উঠে দেখল বেলার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ।

কড়া নাড়ল। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হল, বেলা খুব অবাক হয়ে যাবে। আর তার গায়ের শার্টটা দেখে হয়তো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অট্টহাসিকে ভদ্র রূপ দেবার চেষ্টা করবে।—আগে বেলা ওর সারা দেহে তরঙ্গ তুলে হাসত। হাসির ঢেউ উঠলে সহজে ও সামলাতে পারত না। সে হাসির শব্দে হাতের হাল্কা বেলোয়ারী চুড়ি-ভাঙার ঠুন্‌কো 'ঠুং' শব্দ ধ্বনিত হত না—হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁসার বাসনে যে রকম শব্দ হয়, সেই শব্দের রেশ উচ্চ থেকে মৃদু বিভিন্ন স্তরের ঢেউ খেলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চলে সে রকম ধরনের ধ্বনি ছিল ওর হাসিতে। কিন্তু কুমার পছন্দ করত না বলে ও নিজের স্বভাব-সুলভ ভাবে হেসে ফেললেও নিমেষে সচেতন হয়ে মুখে আঁচল চাপা দেয় আজকাল। জোরে হাসাটা ওর স্বভাব আর মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে আড়াল করা ওর এখনকার অভ্যাস। বেলার এই মেনে নেওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মাধুর্যও লক্ষ্য করেছে উদয়। আসলে মেয়েটার সূক্ষ্ম শিল্পবোধই ওকে আরও সুন্দর, লোভনীয় করে তুলেছে।

একটু যেন দেরি হচ্ছে দরজা খুলতে।

আগের আমলে উদয়ের এ রকম হঠাৎ চলে আসাটা হামেশাই হত এবং বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও হতো না। কুমার থাক বা না-থাক বেলা নিজেই দরজা খুলে দিত।…হয়তো বেলা আজকের বৌভাতের খবর জানে, তাই মন মুষড়ে শুয়ে আছে। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে হয়তো ভাবছে বাজে কোন উটকো খদ্দের এসেছে। এ বাড়ি থেকে বেলার উঠে যাওয়ার কথা হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া হয়নি কেননা সে রকম পছন্দসই বাসা পাওয়া যায়নি।—মাঝে মাঝে

বাজে লোকের উৎপাত পোহাতে হয়। এক এক সময় বেলা খুব বিরক্ত হয়ে কুমারকে বলত—'তোমার মুরোদ তো ভারি! একটা ঘর জোগাড় করতে পার না—মুখেই কেবল রাজা উজীর মারতে পার।'

আবার কড়া নাড়ল উদয়। এবার একটু জোরে—আর বেশিক্ষণ ধরে।

দরজার ওপারে পায়ের শব্দ। এপারে উদয়ের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড অসম্ভব দাপাদাপি করছে। তার কানের পাশের শিরাগুলোয় রক্তের বেগ দ্রুত হতে হতে শক্ত দড়ির মত ফুলে উঠল। এর পরমুহূর্তে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তাকে দেখে বেলা চোখের তারায় কোন্ ভাবের কেমন ছবি আঁকবে? কতটুকুই বা সময়, ক'পায়েরই বা দূরত্ব—অথচ এই মুহূর্তটুকুকে যদি আলাদা করে রাখা সম্ভব হত তাহলে তাৎপর্যের ওজনে উদয়ের জীবনের একটি যুগের চেয়েও বেশি প্রমাণ হত। ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ বুকের ভেতরে—আর বাইরে অর্থাৎ বন্ধ দরজার ওপারে পায়ের শব্দ। বেলা আসছে।

কিন্তু দরজা খুলে যখন বেলা বলল—আপনি! কী কাণ্ড—আসুন, আসুন। তখন উদয় কেমন মনমরা হয়ে পড়ল। বেলার চেহারায়, ওর মুখের কথায়, কথার ভাষাতে, ভাষার ভঙ্গিতে—কোথাও বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেন? ও কী জানে না যে, আজ কুমারের বৌভাত—না কী বিয়ের কথাটুকু পর্যন্ত শোনেনি।

অপ্রতিভ চোখে উদয় দেখছিল বেলার পিঠের ওপর লতিয়ে-পড়া লম্বা বিনুনিটা। ঘরের মধ্যে কাটা কাপড়ের টুকরো যেন শীতের ঝরা পাতার মত এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে।

অদ্বিতীয় চেয়ারে কতকগুলো জামা পাট করা ছিল। সেগুলো আলতো হাতে তুলে নিয়ে বেলা বলল—বসুন দাদা! তারপর, কি খবর বলুন। মথুরার রাজা ভাল আছে তো।

ম্লান হাসিতে উদয়ের ওষ্ঠে কথার পূর্বাভাষ জেগে উঠল। কিন্তু তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সেলাই কলের হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে বেলা যেন নিজের মনের কথাকেই সেলাই করছে এমনি ভঙ্গিতে বলল—জানেন এ মাসে বেশ মোটা টাকার অর্ডার পেয়েছি।

সাড়া দিল না উদয়। তার যেন কী হয়েছে। কী ভাবছে সে! বেলার এই নিরুত্তাপ ভাবভঙ্গি, ওই যন্ত্রটার একঘেয়ে কিট্ কিট্ আওয়াজ, কিছুই উদয়ের মনে সায় পাচ্ছে না—বিরক্তি, বিস্ময়, অস্বস্তি—।

তাকে নিরুত্তর দেখেই বোধহয় বেলা কল চালানো থামিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল। তারপর উদয়ের কোল থেকে শাড়ির প্যাকেটটা টেনে নিয়ে প্রশ্ন করল—এতে কি আছে দাদা ?

—শাড়ি।

—তাই নাকি ? খুলে দেখব কেমন শাড়ি কিনলেন !

উদয়ের গায়ে যেন হঠাৎ-খুশির এক ঝলক হাওয়া লাগল। সে একটু জোর দিয়ে বলল—শ্রীঅঙ্গে পরেও দেখতে পার, ওটা তোমারই জন্যে এনেছি।

কথাগুলো বলে উদয় খানিকটা খুশি হল নিজেকে প্রকাশ করতে পারার স্বাভাবিক কারণে। আর সেই সঙ্গে হয়তো আশা করেছিল যে, বেলাও খুশী হয়েছে।

কিন্তু তার উৎসুক চোখের ওপর দুটি আয়ত আহত চোখ রেখে বেলা বলল—যাঃ, এসব নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা ভাল নয় দাদা।

—কী নিয়ে ঠাট্টা তামাসা, বেলা ?

—এই ইয়ে নিয়ে—মানে শুধু শুধু আমাকেই বা শাড়ি দেবেন কি জন্যে ?

—শুধু শুধু তো নয়, কারণ একটা আছে বই কি।

—কিন্তু আপনারা যে ধরনের ছিচ্‌কে মতলববাজ নন্ বলেই জানতাম। আপনার বন্ধু যদি শোনে তো কি মনে করবে ? সে কথা ভেবে দেখেছেন !

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে উদয় জবাব দিল—আমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই বেলা। সব শালা শুয়োরের বাচ্চা—

তার কণ্ঠস্বরে ঘৃণা আর আক্রোশ প্রকট।

বেলারাণী শাড়ির মোড়কটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে শ্লেষ মেশানো মিষ্টি সুরে ঠেস দিয়ে বলল—আপনিই বুঝি খাঁটি ভগবানের পয়দা! তাই একখানা কাপড় দিয়ে মন ভুলিয়ে আমার কাপড় খুলে ফেলতে এসেছেন! বাঃ—

চমকে উঠল উদয়। ছি-ছি, এসব কী বলছে বেলা! যে কথা সে কল্পনাতেও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয়নি—অনায়াসে সেই নোংরা, বাজে একটা অপবাদ চাপিয়ে দিল ? তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক ঝলক অবশ করা শিহরণ বয়ে গেল। ইচ্ছে করছে গলায় যত শক্তি আছে সমস্তটুকু প্রয়োগ করে চেঁচিয়ে বেলার কথার প্রতিবাদ জানায়—না, না, না! ভুল—তুমি ভুল করছ বেলা। আমি এসেছি তোমাকে মর্যাদা দিতে, যে মর্যাদা সমাজের

প্রতিনিধি হয়ে কুমার দিতে রাজী হয়নি—সেই মর্যাদা—। আরও অনেকগুলো কথার আবেগে উদয়ের মনটা সিরসির করছে। কিন্তু তার মুখ ফুটে একটি কথাও বেরুলো না।

যে ঘৃণা কুমারকে দেখানোর কথা সেই ঘৃণা-কটাক্ষ মেলে উদয়ের দিকে তাকিয়ে বেলা বলল—এ শাড়ি আপনি নিয়ে যান। পরশুদিন বন্ধুর বৌভাতে প্রেজেন্ট দেবেন—তাতে খরচেরও সাশ্রয় হবে আর—

বেলার কথা শেষ হবার আগেই উদয় বলল -কি বললে, বৌভাত কবে?

—কেন পরশু, জানেন না নাকি।

দাত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুখের কথা জিভের আড়ালে রেখে দিল উদয়। কি দরকার সত্যি কথা বলে গোলমাল বাড়িয়ে। যদি সে বলে যে, বৌভাত পরশু নয় আজ, তাহলে হয়তো তার কথা বেলা বিশ্বাসই করবে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বেলা একটু হাসল—আমার কথায় রাগ করবেন না যেন দাদা। তবে, এরকম আর কক্ষনো করবেন না যেন, আমি ভীষণ অপছন্দ করি। বিয়ে-থা যা ই করুক, ওর সঙ্গে আমি জোচ্চুরী করতে পারব না।

স্তিমিত কণ্ঠে উদয় বলল –তাহলে বিয়ের জন্যে তোমার মনে কোন দুঃখ নেই।

—দুঃখু কষ্ট ছাড়া কি মানুষ দুনিয়াতে আছে দাদা? আপনিই বলুন। তা ছাড়া আমার তেমন ইচ্ছে থাকলে ওকে কবে বিয়ে করতে পারতাম। কিন্তু দেখলাম তাতে অনেক গুলো মানুষের অভিশাপ কুড়োতে হবে। তার চেয়ে, এই তো বেশ আছি। বললাম, বিয়ে করো– বাপ মায়ের চোখের জল ফেলিয়ো না, তাতে মঙ্গল হবে না।

কথা বলতে বলতে বেলার কণ্ঠস্বর আবেগে গভীর, ভারি হয়ে উঠেছে। ওর চোখের কোলে হয়তো অজস্র অশ্রু সঞ্চিত হয়ে আছে যে কোন মুহূর্তে ঝরে পড়বে।

উদয় বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু—

তাকে থামিয়ে দিল বেলা—এতে কোন কিন্তু নেই। আমার একটা তো জীবন, সুখে-দুঃখে কেটেই যাবে। এখন আর তেমন ভাবনা নেই—একটা পেটের ভাত আপনাদের আশীর্বাদে জুটে যাবেই। তা ছাড়া বিয়ে করেছে বলেই ও কী আর ফেলে দিতে পারবে! এই তো দেখুন না—বিয়ে বাড়ির

সব জামার অর্ডার ও আমাকে পাইয়ে দিয়েছে। কাল ডেলিভারি নিয়ে যাবে, নগদ তিরিশ টাকা মজুরীও পাব। নিজে মুখে বললে খারাপ শোনাবে, কিন্তু সত্যি আজকাল আমার হাতে কাট-ছাটের সবাই তারিফ করে। এই তো দেখুন না, এটা হল মিনতির জামা—এটা ফুলশয্যার রাতে পরবে ও—বৌ-এর আসল নাম জানেন তো ক্ষমা—আমি কিন্তু মিনতি দিয়েছি।

বলে উৎসাহ সহকারে একটা ব্রোকেডের ব্লাউজ তুলে নিয়ে উদয়ের চোখের সামনে মেলে ধরল। উদয়ের আর এক দণ্ডও এখানে বসে থাকতে ভরসা হচ্ছে না। কি জানি নিজেকে যেন ভয় করছে সে। বেলার কথাগুলো চাবুকের চেয়েও জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে—তবু মুখ বুজে সব শুনে যাচ্ছে উদয়।

বেলার উৎসাহের যেন শেষ নেই, নতুন জামাগুলি একে-একে সব দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, কোন্‌টি কখন পরবে মিনতি অর্থাৎ ক্ষমা। সব দেখানো হয়ে গেলে বলল—কেমন শেপ্ হয়েছে বলুন। আহা, মাপের জন্যে যে জামা এনেছিল তার কী ছিরি! বুক-পেট সব সমান। এই দেখুন না—

পুরনো একটা ব্লাউজ আর ব্রেশিয়ার টেনে আনল কাপড়ের গাদা থেকে, মুখের কথা কিন্তু থামেনি—আমি কিন্তু ও মাপে বানাইনি। বুকের নীচে আর পেছনে এমন ফাষ্ট´ক্লাস প্লিট ভেঙে দিয়েছি যে, নীচের জামা না পরলেও চলবে। বুঝলেন মশাই, আপনার বিয়ের সব অর্ডার কিন্তু আমাকে দিতে হবে, হ্যাঁ।

কথা শেষ করে বেলা এমনভাবে তাকাল উদয়ের দিকে যেন এখনই ফরমাশ পাবে। এবার, এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম উদয়ের দিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল বেলা। দেখতে দেখতে স্বগতভাবে বলল—শার্টটা বুঝি রেডিমেড্ কিনেছেন, কি বিচ্ছিরি কাট মা মাগো! আমি হলে—

বেলার মুখের কথা শেষ হবার আগেই উদয় উঠে দাঁড়াল—চলি।

—ও মা, সে কি কথা! এই তো এলেন, বসুন দাদা। হিটারে জল বসিয়ে দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটে চা হয়ে যাবে।

—থাক।

—বা রে থাকবে কেন, বসুন না দাদা। একটু গল্প করুন—তারপর, বরযাত্রী গিয়েছিলেন তো, বউ দেখতে কেমন হয়েছে?

বউ-এর কথা উঠতেই উদয়ের মনে পড়ল বৌ-ভাতের কথা, মনে পড়ল কুমারের কথা। যে কুমার অর্ধ সত্যের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে বেলার কাছ থেকে। মনে মনে হাসল উদয়, সে ইচ্ছা করলেই পারে কুমারের আসল চেহারা খুলে মেলে দেখিয়ে দিতে—যদি সে বলে যে ফুলশয্যার রাতটা একদিন আগে এসেছিল, যদি সে বলে যে বৌভাতের নেমন্তন্নে বেরিয়ে বেলার কথা ভেবেই এখানে এসেছে উদয় তাহলে বেলার মুখের অবস্থা কি দাঁড়াবে! না, বেলার মনের শেষ সান্ত্বনার ঘোরটুকু কেড়ে নেবে না উদয়। থাক—মিথ্যে হলেও এই সান্ত্বনাটুকু সম্বল করে যদি একটি মেয়ে সুখী হয় তাতে উদয়ের বাদ সাধার দরকার কি?

উদয় ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তার পিছু পিছু বেলাও—বোধ হয় দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত মনে বিয়ে-বাড়ির অর্ডারগুলো তামিল করবে।

—দাঁড়ান।

ঘাড় ফিরিয়ে উদয় দেখল—কিন্তু ততক্ষণে বেলা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরে ফিরে গেছে। ঘুরে এল শাড়ির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে। কুণ্ঠিত হাতে উদয়ের দিকে সেটা এগিয়ে ধরে বলল—কিছু মনে করবেন না দাদা। এটা নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।

নিজের পালিশ-চকচকে জুতোর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসিতে উদয়ের মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। হাত পেতে সে শাড়ির প্যাকেটটা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে গেল। হরিপদ মুখুজ্যের কথাটাই ঠিক! হয়তো আর একবার সে নিজেকে 'নিবোধ' প্রতিপন্ন করে বেয়াড়া খুশীর বাঁকা হাসি হেসে নিয়ে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই কোন সত্যিকার বাজারে-মেয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকবে এবং টাকার বদলে শাড়ি দিয়ে তার অঙ্গের বস্ত্রহরণও করবে!

॥ রাত্রির বয়স ॥

স্পর্শ | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-সংক্ষেপ করবার জন্য এই গলিপথটা মাঝে মাঝে পার হতে হয় সুবিমলকে। সন্ধ্যার পরও কতদিন সে হেঁটে গেছে এই অপরিসর পথ ধরে সম্পাদক বন্ধুর বাড়িতে। কোন কিছু ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পথ চলা।

ছোট্ট গলি। গলির মুখেই ক্ষুদ্রকায় একটি পান-বিড়ি-লেমোনেডের দোকান, এক ঝলক আলো এসে পড়েছে সেখান থেকে রাস্তার ওপর। এই আলোটুকুর পরেই অন্ধকার। কিছুটা অংশ জুড়ে অবশ্য। তারপরেই আবার একটি দোকান। টিনের চালের নিচে বেঞ্চি পাতা—চা-ফুলুরি প্রভৃতির দীন আয়োজন। আবার পথে এসে পিছলে-পড়া আলো। এই আলোতেই বড রাস্তা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে হাঁটা যায়। বড রাস্তায় সারি-সারি আলোর প্রহরী, রিক্সার টুং টুং, বাস অথবা ট্যাক্সির উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা।

গলির যেটুকু অংশ অন্ধকার—সেই অংশেই আবছা আলোয় ওরা দাঁড়িয়ে থাকে, সময়-সময় চিত্রার্পিতের মত মনে হয়। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় একযোগে নীরব হয়ে যায় পথচারি আগন্তুকের পদশব্দে, অসীম ঔৎসুক্যে তাকায় গলির মুখে বৃত্তাকারে পিছলে

পড়া আলোর দিকে—যারা আসছে, চকিতের মধ্যে সেই আলোয় দেখে নেয় তাদের চেহারা, কথনো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। মনে মনে সূক্ষ্ম একটা প্রতিযোগিতার ভাবও অনুভব করে, এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, কে কার থেকে দেখতে একটু সুন্দরী বেশী, কার প্রসাধনে পরিপাট্য জেগেছে আজ, কজ্জল-রেখায় কার চোখে ঔজ্জ্বল্য জ্বলছে বেশী ? পথচারী নির্বিকার চিত্তেই ওদের পার হয়ে যখন আবার গিয়ে পড়ে আলোর বৃত্তের মধ্যে, তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সমবেদনায় মদির হয়ে ওঠে ওদের মন—এর-ওর মেকী সোনার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা মায়া জাগে ওদের অন্তরে। কিন্তু তাও ক্ষণিকের। আলোর বৃত্তে দেখা যায় নতুন আগন্তুক, আবার মন ভরে ওঠে নতুন প্রত্যাশায়। মন্থরগতিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসে পথিক—লক্ষ্য করে মুহূর্তের জন্য একটা শিহরণ কেঁপে যায় সারা শরীরে, ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা হয়ে ওঠে লীলায়িত—কটাক্ষে জ্বলে বাঁকা দৃষ্টি, মনে মনে হিসাব করে টাকার অঙ্ক। একটু ভালো খাবার—ভালো থাকবার উচ্চ শা মুহূর্তের জন্য তরঙ্গ তুলে আবার মিলিয়ে যায়।

দিনের পর দিন। সকলের অবস্থা অবশ্য সমান নয়, ওরই মধ্যে একটু অর্থনৈতিক তারতম্য আছে। কারুর ঘর বেশী সাজানো, কারুর কম। কারুর ঘর বড় কারুর ঘর ছোট। কারুর বাড়িতে বৈদ্যুতিক নীল বাতি জ্বলে, কারুর বাড়িতে কালিপড়া লণ্ঠন। হয়তো একই বাড়িতে এ ঘরে বিদ্যুৎ ও-ঘরে লণ্ঠন। কারুর তিন-চার মাস একাদিক্রমে বিদ্যুৎ জ্বলবার পর অবশেষে কেরোসিনের বাতি। ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়িউলীর লোক বাল্‌ব খুলে নিয়ে গেছে সম্ভবতঃ। তবু, এরই মধ্যে নিত্যকার প্রসাধন, নিত্যকার হেসে কথা বলা।

ভাবুক বলে বন্ধু মহলে খ্যাতি আছে সুবিমলের। একটু আত্মভোলা কবি মন। হিসাব কষা সংসারে এই বেহিসেবী লোকটাকে জীবনে মূল্য দিতে হয়নি কম, তবু আজও হিসেব সে ভুল করে, আজও দুঃখ পায়।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি ঘন হয়েছে রীতিমত। আকাশটাও কালো। পথ চলতে চলতে মেঘের সে কালিমা আরও ঘনীভূত হল, ওর তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। বড় রাস্তা দিয়ে অনেকটা দূর চলে এসেছে, দু-এক

মেয়েটি বলল, মাথাটাও ভিজে। গামছা দেব?

না না—তাড়াতাড়ি বলে উঠল সুবিমল, তারপরে মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘ চুলগুলি একটু বিন্যস্ত করে নিল।

মেয়েটি বলল—দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়ুন না খাটের উপর!

বিছানার ধব্‌ধবে নিভাঁজ শুভ্র চাদরের দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলল, বসব?

বসুন না!

বসবার পর একটু যেন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল সুবিমল, একটু সহজ।

মেয়েটি বাইরের জানলার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, টেনে বন্ধ করে দিলে ভাল করে, বলল, বৃষ্টির ছাঁট আসছে, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়েছিল আর কী আজ, ভিজে সপসপে হয়ে যেতেন!

খুব মৃদুস্বরেই সুবিমল বলল—বাড়ল না কি বৃষ্টি?

বাড়ছে মানে? এগিয়ে আসতে আসতে মেয়েটি বলল—রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে এতক্ষণে! বড় রাস্তায় দেখুন গিয়ে, হয়তো এরই মধ্যে জল জমে গেছে, ট্রামগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে। জল ঠেলে ঠেলে শুধু চলছে বাস।

সুবিমল মেয়েটির দিকে তাকাল এতক্ষণে। সাদা শাড়ি পরা ছিপ্‌ছিপে গড়নের মোটামুটি সুশ্রী একটি তরুণী। মুখখানিতে কেমন একটা ছেলেমানুষির ভাব মেশানো, চোখের কোণে কিন্তু ক্লান্তির গভীর রেখা, একটা অবসাদের ম্লানিমা নেমেছে যেন চোখ-মুখ ভঙ্গিমায়। ওর কাছে জীবনের ভার যেন দুর্বিসহ, অথচ সেটা কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াস রয়েছে অনুক্ষণ, নতুন করে আশা জাগে মনে, নতুন করে জীবন সংগ্রামের প্রেরণা।

মেয়েটির মুখে রক্ত নেই, হালকা প্রসাধন মুখখানাতে কিছুটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য সুবিমলের মনে হল কথাগুলি, মুহূর্তের জন্যই একটা প্রাণ-শক্তির ঝলক যেন দেখতে পেল সে মেয়েটির মধ্যে। সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

নাঃ, কিছুক্ষণ আপনাকে বসতেই হল দেখছি, বৃষ্টিটা ধরবার নাম নেই।

সুবিমল বলল—এসে হয়তো অসুবিধাই করলাম আপনার।

অসুবিধা ? মেয়েটি ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল, না। বরং সুবিধাই করেছেন।

কী রকম !

হাসতে হাসতেই মেয়েটি বলল—আপনি না এলে ঠায় একা বসে থাকতাম তো। বসে বসে বৃষ্টি দেখতাম।

হয়তো সেটা ভাল হত।

না, একা-একা বৃষ্টি দেখবার উপায় আছে নাকি ? এখুনি ও ঘরের মেয়েগুলো আসত হুটপাট করতে। গত মাস থেকে এ ঘরে বিজলী এসেছে কিনা, টিমটিমে হ্যারিকেন আর জ্বলে না। জোরালো আলোর নীচে এলে ওদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে।

ওদের ঘরে বিদ্যুৎ নেই বুঝি ?

না।—মেয়েটি বলল— ওপরের ঘরের এক সরলা ছাড়া কারুর ঘরে নেই। আমার ঘরেই কী আসত নাকি ? নেহাত চেহারায় এতটা চটক ফুটেছে নাকি, তাই ঘরেও একটা শ্রী এল। আমি বলি, ওসব চটক্ ফটক্ কিছু না, আসলে আমার একটু পড়্‌তা পড়েছে।

বেশ অন্তরঙ্গ সুরেই কথাগুলি বলে যাচ্ছে মেয়েটি। মনে হচ্ছে, অনেক কথা জমেছে ওর, হাওয়া বুঝি অনুকূল, তাই ঝরে পড়ছে ওর কথা-ফুলগুলি।

একটু যেন সরলতাও আছে মেয়েটির মধ্যে, একটু যেন ভাবালুতাও। এটাও অবশ্য সুবিমলের মনে হওয়া, সত্যিও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। সুবিমল বলল—নাম বুঝি স্বপ্না ?

হেসে ফেলল মেয়েটি, বলল, কোথা থেকে শুনলেন ?

ঐ মেয়েটি যে আপনাকে ডাকল তখন ?

শুনেছেন বুঝি ?—মেয়েটি বলল—স্বপ্নাই বটে। নিজেই রেখেছি নিজের নাম, আজকালের রেওয়াজ বুঝে। কেমন, ভাল না নামটা ?

ভাল।

জানেন ? মেয়েটি বলল, আজকাল রঙ্-টঙ মাখাও কেউ পছন্দ করে না। বড় বিশ্রী। বেশীক্ষণ রঙ মেখে থাকলে কেমন অস্বস্তি লাগে, মাথাটাও ধরে যায়।

—তাই নাকি ?

ও মা, জানেন না ?—প্রশ্ন করেই হেসে ফেলল মেয়েটি। জানেন, ভান করছেন।

একটু অদ্ভুতই মনে হচ্ছে মেয়েটিকে। কিম্বা হয়তো এ ধরনের মেয়েরা এমনই হয়।

বলল, ধরল বৃষ্টি ?

জানলাটা একটু খুলে দেখে নিয়ে ফের বন্ধ করল মেয়েটি, বলল, সে গুড়ে বালি। সমানে বৃষ্টি হচ্ছে! হোক না, কত আর হবে, থামতেই হবে এক সময়!

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার বলল—রাস্তায় জল জমলে বেশ মজা না ? বেশ পায়ের পাতা ভিজিয়ে ভিজিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

ভাল লাগে বুঝি ?

কী, বৃষ্টি ? ভীষণ ভালো লাগে!—বালিকার মত সারল্যে বলতে থাকে মেয়েটি—বৃষ্টি পড়লে কোন লোক আসবে না তো, বেশ মজা পাওয়া যায়।

আমি যে এলাম ?

আহা! মেয়েটি বলল, এ কী আসা বলে নাকি ?

বলেই হেসে উঠল, তারপর বলল, সে সব ধরনের লোক আমরা চিনি। আপনি না।

সুবিমল বলল, দেখুন, একটা কথা বলব ?

বলুন না ?

কিছু মনে করবেন না তো ?

না।

সুবিমল বলল, এই যে আমি বসে আছি, কোন ভয়-টয় নেই তো ?

হেসে উঠল মেয়েটি, বলল, ওমা কেন ?

লোকে কত কি বলে, টাকাচুরি, হেন-তেন, কত কী ?

বুঝেছি, মেয়েটি বলল, কিন্তু তাতে ক্ষতি কার বেশী জানেন ? ধরুন আপনার কাছে কুড়ি টাকা আছে, আমি বা আমার লোক সব কেড়ে নিলাম, কুড়িটা টাকা পেলাম ঠিক কিন্তু আপনি আর আসবেন কেন ? কেমন কি না ? ব্যবসা করতে বসে এটা ভাবতে হয় বই কী! কোন্‌টা হয় তাহলে লাভের শেষ পর্যন্ত ?

আগ্রহের সঙ্গেই ওর কথা শুনে যায় সুবিমল। মেয়েটির কথা বলার ধরনে একটু কৌতুকও অনুভব করে। এ এক অনাবিষ্কৃত জগৎ ওর কাছে!

কী? ভাবছেন কী এত? এখনো ভয় গেল না?

না, তা নয়, একটু অপ্রতিভ হয়ে সুবিমল বলে, আপনার কথাগুলি শুনতে বেশ লাগছে। বেশ কথা বলেনও আপনি!

হেসে উঠল মেয়েটি, একটা খুশীর হিল্লোল যেন বয়ে গেল সারা শরীরে, বাহু দুটি একবার দুলিয়ে খাটের বাজু ধরে রূপায়িত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল, বলে, জানেন না বুঝি? কথায় আমরা ওস্তাদ।

তাই বুঝি।

হ্যাঁ, কথা-বার্তায় আপনাদের খুশী করতে না পারলে আমাদের চলবে কেন?

সুবিমল একটু হেসে বলল, খুব কথার মালা গাঁথতে হয় বুঝি?

কী বললেন? কথার মালা? বাঃ, বেশ বললেন তো, শিখে রাখলাম।

তা শিখুন, সুবিমল বলল, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দিলেন না তো?

কোন প্রশ্ন? ও, ঐ কথার মালা?—মুহূর্তে যেন বিরস হয়ে গেল মেয়েটির মুখখানি, একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল—যারা আসে, কথা আর শুনতে চায় কই?

চায় না?

মেয়েটি একটু ম্লান হাসে, বলে, অথচ আমাদের তো সাধ যায়, যাকে ভাল লাগে, তার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলতে!

সেটা তো স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটা হয় না। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে কথা বলা শিখি।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

বুঝলেন না? মেয়েটি একটু হাসল মুখটিপে, যারা আসে তারা শুধু শুনতে চায় ভালবাসাবাসির কথা, আর কিছু তো নয়। বড় জোর নামটা, ব্যস এই পর্যন্ত।

ভঙ্গীর মধ্যে একটা অকপট কথনের সুর আছে মেয়েটির, যেটা বেশ ভাল লাগে! সুবিমল একটু হেসে বলে, ভেবে দেখতে গেলে এর বেশী জানবার আর কি আছে মানুষের সম্বন্ধে মানুষের?

চোখ বড় বড় করে উত্তর দেয়, আপনার তাই মনে হয় বুঝি? হয়তো আপনার কথাই সত্য! আমার কিন্তু ওতেই মন ভরে না।

চুপ করে থাকে মেয়েটি। সুবিমলও চুপ। বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে সমানে বর্ষণ চলেছে তখনও। বন্ধ ক্ষুদ্রকায় ঘরখানার মধ্যে শুধু ওরা দুজন। খাট, আলমারী, বাক্স, আরো কি সব টুকিটাকি জিনিস। পাশেই বোধ হয় রান্নাঘর। শাড়ির পার জুড়ে জুড়ে পর্দা তৈরী করে ঝুলিয়ে দিয়েছে দুই ঘরের মাঝখানে। রাস্তার দিককার বন্ধ জানালাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জোরে জোরেই হেসে ওঠে মেয়েটি, বলে, দেখেছেন? জানলা টেনে বন্ধ করে দিয়েছি তবু জল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসছে। ঐ দেখুন কেমন এঁকে-বেঁকে দেওয়াল বেয়ে একটা ধারা নেমেছে। ঠিক যেন একটা সাপ, তাই না?

সুবিমল একটু হেসে চুপ করে রইল। মেয়েটি সেই এক ভাবে দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাবার পর মেয়েটি বলল, ভাবছেন কী অত?

একটা কথা ভাবছি।

কী?

সুবিমল মেয়েটির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, শুনে আশ্চর্য হবেন না তো?

না। বলুন না আপনি?

সুবিমল একটু থেমে থেকে তারপর বলল—আপনাকে নিয়ে গল্প লেখা যায় কি না, তাই ভাবছি।

গল্প!—মেয়েটি বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, গল্প···মানে···

মেয়েটির মুখখানা যেন মুহূর্তে আলোয় ভরে ওঠে, বলে, আমায় নিয়ে!

হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে।

হঠাৎ আবার ম্লানিমায় ঢেকে যায় মেয়েটির মুখ, বলে, কী করে লিখবেন? কতটুকু জানেন আমার কথা?

যতটুকু জেনেছি, তাতে লেখা চলে।

অবাক হয়ে সুবিমলের দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি—লম্বা লম্বা ঘন চুল, চোখ দুটি যেন স্বপ্ন দেখছে। ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে জাগে মেয়েটির, সঙ্গে সঙ্গে অধীর হয়ে ওঠে আগ্রহে আর উত্তেজনায়, বলে, বুঝেছি!

কী ?

সিনেমার গল্প, না ? ঐ যে টকীতে কথা বলে ছবিগুলো, তার গল্প লিখবেন ! না ? সে বেশ হবে।

আশ্চর্য হয়ে যায় ওর কথা শুনে সুবিমল। গল্প লেখার প্রসঙ্গে সিনেমার কথা হঠাৎ তুলল কেন মেয়েটি ? আর এত উৎসাহের সঙ্গে ! ঠিক ভেবে পায় না।

মেয়েটির উৎসাহ হয়ে যায় দ্বিগুণ, আতিশয্যে ওর একবারে কাছে সরে আসে মেয়েটি, বলে, এতক্ষণে আমি আপনাকে কোথায় যেন দেখিছি দেখিছি মনে হচ্ছিল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সুবিমল। মেয়েটির সে পরিচিত ? বলে কী ও ?

মেয়েটির বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছে উত্তেজনায়, বলল, বছর তিনেক আগেকার কথা। আমার এক বাবু আমাকে বেহালার দিকে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখাতে। সিনেমা মানে টকী। কথা বলে। তাতে আপনি পার্ট করেছিলেন না ? সেই যে মেয়েটার স্বামী, ঐ যে শেষকালে যার সঙ্গে বিয়ে হল মেয়েটার ?

কী আবোল তাবোল বকছে এই মেয়েটি ! সিনেমায় সে আবার পার্ট করল কবে।

মেয়েটি আবিষ্টের মত বলে চলেছে—আমি কোনদিন টকী দেখিনি জানেন ? ঐ সেই একবার। কী সুন্দর ! দেখেছেন, আপনাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বুঝতে পারে সুবিমল, মারাত্মক ভুল করেছে এই মেয়েটি। কোন ছবির নায়কের সঙ্গে তার সাদৃশ্য কি করে মেয়েটি খুঁজে পেল কে জানে ! কিন্তু গল্প লেখার সঙ্গে ছবিতে নায়ক সাজার সম্বন্ধ কী ?

চমকটা কেটে যাবার বেশ কিছু পরে সুবিমল প্রশ্ন করে—সিনেমা তো দেখেছেন। বই পড়েন ? বই ?

বই ? মেয়েটি বললে, না, স্কুলে আর ভর্তি হলাম কবে ? বাড়ি বসে মা যেটুকু—

না না, সে কথা নয়। গল্পের বই-টইয়ের কথা বলছি।

ছোটবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তুম দু-একটা। এখন বই পাবই বা

কোথায়, পড়বার সময়ই বা কই? ওপরের সরলার কাছ থেকে অনেক সেধে-টেধে একটা বই পড়েছিলুম, বিষবৃক্ষ। বুঝলেন? কিন্তু বইয়ের কথা কেন? সিনেমার কথা বলুন না একটু। বইগুলোকেই তো সিনেমা করে?

তা করে, হেসে সুবিমল বলে, কিন্তু একথা কেন? সিনেমার দিকে খুব ঝোঁক বুঝি?

একেবারে কাছে ঘন হয়ে এসে চুপি চুপি কথা বলার মতন ফিস্‌ফিস্ করে বলে, ওপরের সরলা। ওর এক বাবু সিনেমায় বই লিখেছিল! ওঃ একদিন কি খাওয়া দাওয়া ওর ঘরে।

বলেই চুপ করে যায়, যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, যেন চোখের সামনে দেখতে পায় প্রতিযোগিনীর সেই সোনা-মোড়া দিনের ঐশ্বর্য সম্ভার।

হঠাৎ যেন চমক ভেঙে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়, বলে, চা খাবেন?

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সুবিমল, না-না।

তিরস্কারের ভঙ্গীতে মেয়েটি বলে, না-না কেন? খান না? আমার তোলা পেয়ালা পিরিচ রয়েছে।

না-না, তার জন্য নয়।

তবে? আমার হাতে খাবার কথা ভাবছেন? কেন, রেষ্টুরেণ্টে খান না চা? জাত-বেজাত ভাবেন নাকি তখন?

না-না, আমি সে কথা বলছি না।

মেয়েটি মাথা হেলিয়ে যেন শাসনের ভঙ্গীতে বলে, অনেকবার না-না বলেছেন। এবার শুনব না, আমি এক্ষুনি চা করে আনছি। বসে থাকুন।

সাজানো আলমারির পুতুলগুলির পাশ থেকে পেয়ালা পিরীচ বার করে মেয়েটি ওর দিকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে চলে যায় রান্নাঘরে। আর ঘরের মধ্যে অপ্রস্তুতের মত বসে থাকে সুবিমল। কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে সে। পত্রিকায় পত্রিকায় লিখে যাওয়া দরিদ্র তরুণ লেখক। পাইস্ হোটেলের পয়সা জোটানোই তার কাছে কষ্টকর, তার পক্ষে এই অজ্ঞ উৎসাহী মেয়েটির সামনে অনর্থক একটা আশার আলো তুলে ধরা মারাত্মক অপরাধ। গল্প লেখার কথা তোলাই হয়েছে তার সব থেকে বড় ভুল। ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ায় সুবিমল, অতি সন্তর্পণে দরজার খিলটা খুলে বাইরের বৃষ্টির অবস্থা নিরীক্ষণ করে। হাওয়াটা কমেছে, বৃষ্টির বক্রধারাও সরল হয়ে এসেছে।

কাঠের উনুনে হাওয়া দিতে দিতে পিঁড়ের উপর বসে অনেক কথাই ভাবতে থাকে মেয়েটি। ভদ্রলোককে চা খাওয়ার কথা বলে এসে রীতিমত বিপদেই বুঝি পড়ল সে। চা আছে দুধও একটু আছে, কিন্তু চিনি নেই। রান্নাঘরের আগড়টা খুলে যাবে নাকি কমলার কাছে চিনি ধার করতে। আগেরটিরই তো শোধ হয়নি, দেবে কী এবার চাইলে? ঘরে বাবু এসেছে শুনলে দিতেও পারে। চায়ের সমস্যা না হয় মিটলো, কিন্তু রাত পোহালে কাল কি হবে, ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায়। ঘরে সব কিছু বাড়ন্ত, হাতে একটাও পয়সা নেই। বাড়িউলী মাসীর লোক কাল নির্ঘাত বালব্ খুলে নিয়ে যাবে, ভাড়া বাকী পড়ার দরুন। তার উপরে যারা টাকা পায়, তারা? খেয়ালের বসে ভদ্রলোককে ঘরে এনে ভাল করেনি সে। ওরা জানবে, বাবু এসেছে, নিশ্চয়ই টাকা পেয়েছে ছুঁড়ি। কাল সকালে ওবা ছিঁড়ে খাবে সবাই টাকা-টাকা করে।

পোড়া বৃষ্টির জন্যই তো এত! বৃষ্টি পড়লে কেন যেন মাতাল হয়ে যায় মন। যেন মেতে ওঠে সে।

তা হোক, ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ। তার পড়তা পড়েছে হেন-তেন কত কী! লোকটা প্রথম থেকেই তাকে 'আপনি-আপনি' করতে শুরু করে দিল। তাদের মত মেয়েকে কেউ আবার আপনি বলে নাকি? হয়তো ভাল লেগেছে তাকে লোকটার। না-না, অন্যরকম ভাল লাগা, সিনেমার ভাল লাগা। সত্যই, সিনেমার লোকগুলোই ঐ রকম। সরলার মত তাকে যদি, যাকে বলে 'চান্স'—সেই 'চান্স' দেয় লোকটি, তাহলে···

তাহলে তার চেহারাই হয়ে দাঁড়াবে অন্যরকম। সরলা 'নিবেদিতা' হয়ে মোটরে মোটরে ঘুরে বেড়ায়, আর সে···না, সে স্বপ্নাই থাকবে।

ঐ যাঃ! ভদ্রলোকের নামটা তো জেনে নেওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর নাম। সেই সরলার লোকটার মতন।

ফুটতে থাকুক জলটা কেটলীতে, ও ততক্ষণ ঘুরে আসুক একটু ছেলেটির কাছ থেকে। চুপচাপ বসে বসে করছে কী ও? পর্দা সরিয়ে ঘরে এল মেয়েটি। কিন্তু কোথায় সে?

দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরে সে নেই। চলে গেছে চুপি চুপি। বৃষ্টি কমে এসেছে। প্রস্তর মূর্তিবৎ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্না।

হুদ্দাড় করে ছুটে এল কমলীর দল—কী লো, বাবু চলে গেল?

হা-হা করে হঠাৎ হাসিতে যেন লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি, বলল—বাবু!
বাবু কে?

ঐ যে লোকটা এসেছিল?

বাবু নয়।

তবে?

তেমনি হাসতে হাসতেই উত্তর দিল মেয়েটি, সিনেমার লোক রে, সিনেমার লোক। আমার সঙ্গে 'কন্‌টাক্ট' করতে এসেছিল। হয়ে গেল কন্‌টাক্ট।

বলে আবার হাসতে লাগল উচ্ছ্বসিত হয়ে বিস্মিত বিহ্বল কয়েকটি সহচরীর সামনে।

॥ এক আশ্চর্য মেয়ে ॥

শনি | সন্তোষকুমার ঘোষ

বাবরী চুলের নিচে কামানো ঘাড, পাউডারের ছোপ, ডানধারে বোতামওয়ালা পাঞ্জাবির তিনটে বোতামই খোলা। গোঁফের অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কী একটা কুটিল সংকল্পের ইঙ্গিত।

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। জানালার ধারে দাড়িয়ে বিনুনী করছিল, আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, কপালে এরই মধ্যে ক'ফোঁটা ঘাম জমেছে। আবার একটু ক্রীম ঘষতে হল।

তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে যমুনা নেমে এল নিচে। যদি নিরস্ত করতে পারে; আসনের ওপর শুয়ে পড়েও ঠেকাতে পারে সর্বনাশের বেনোজল।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই লোকটা ঢুকে পড়েছে। কপাটটা ভেতর থেকে দিয়েছে ভেজিয়ে।

দরজার বাহিরে ধুলোয় থপ করে বসে পড়ল যমুনা। মেয়াদ তো ফুরিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক পর এ ধুলোটুকুর ওপরও আর কোন অধিকার থাকবে না। নরেশ যখন সব জানতে পারবে। যেমন আছে, এই পোশাকেই মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে হবে, হয়তো ঐ লোকটার সঙ্গেই, কালাপাহাড়ি নিষ্ঠুরতা নিয়ে আজ যে হানা দিয়েছে। বিষশ্বাস বাসুকি উঠে এসেছে পাতালের নিমন্ত্রণ নিয়ে।

দরজার ওপর কান পাতল যমুনা। বন্ধ ঘরের কথাবার্তা, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেবল ফিস ফিস শব্দে একটা হীন চক্রান্তের ইঙ্গিত।

লোকটা যা বলবার সব বলেছে সন্দেহ নেই। ওর সাপুড়ের ঝাঁপি খুলেছে। যমুনার জীবনে একটিমাত্র মিথ্যা, একটিমাত্র প্রবঞ্চনা ফুল হয়ে উঠেছিল, তার এক-একটি পাপ্‌ড়ি খুলছে।

যমুনার লোভ হল, একবার শোনে উত্তরে কী বলছে নরেশ। সে কি বিশ্বাস করেছে? বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী। লোকটা এত তোড়-জোড় করে যখন এসেছে, তখন কি আর উপযুক্ত প্রমাণ-দলিল না নিয়েই এসেছে।

দু একবার মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল নরেশের। কথাগুলো যমুনা বুঝতে পারল না, কিন্তু স্পষ্ট যেন দেখতে পেল, অপ্রত্যাশিত, মর্মান্তিক সত্যের আঁচ লেগে চোখ-মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কঠিন আঙুলের শিরাগুলি উঁচু হয়ে উঠেছে, চেয়ারের হাতল শক্ত মুঠিতে ধরে মাথা নীচু করে বসে আছে। পানপাত্র একবার নিঃশেষ করে লোকে যেমন শূন্যপাত্র এগিয়ে দিয়ে আবার ভরে দেবার নির্দেশ দেয়, তেমনিভাবে একটু একটু শুনছে নরেশ, ওর মাথাটা বুঝি একটু একটু টলছে, বলছে, তারপর, তারপর।

যমুনা জানে তারপর কী। ঐ লোকটা বেরিয়ে যেতেই নরেশ উঠে আসবে টলতে টলতে। রাগে, ঘৃণায় আরক্ত চোখে তাকাবে যমুনার দিকে। তারপর? লাথি মারবে, না চুলের ঝুঁটি ধরবে? নাকি গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে সদরে?

দিক। যমুনাও শক্ত করে বেঁধেছে মন। দুদিনের স্বর্ণসুখ যদি ঘুচেই যায়, যাক তবে। আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল যমুনা। অল্প অল্প পা টলছে। তবু রেলিং ধরে অনায়াসেই উঠতে পারল ওপরে।

টেবিলের ওপর বিকেলে তুলে আনা ফুলগুলি এখনো অম্লান। বিছানার ওপর নতুন ভাঁজভাঙা চাদরটা পরিপাটি। সমস্ত মুখটা তেতো হয়ে গিয়ে একটা কান্না এলো যমুনার। এ বিছানায় আর কোনদিন শোওয়া হবে না। ফুলতোলা বালিশের মসৃণ ওয়াড়গুলোর ওপর যমুনা একবার হাত বুলিয়ে নিলে; ভিজে-ওঠা কপোল বালিশের ঈষদুষ্ণ কোমলতার মধ্যে ডুবিয়ে চোখ বুজে রইল খানিকক্ষণ। এ স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, থাক না।

কিন্তু একটু পরেই উঠতে হল তাকে। সারা শরীরে একটা অস্থিরতা,

বুক জ্বলছে, গলা জ্বলছে, চোখ জ্বলছে। কতক্ষণে যাবে ঐ লোকটা, কতক্ষণে ওপরে উঠে আসবে নরেশ।

আঁচলের চাবির গোছা খুলে যমুনা টেবিলের ওপর মাথা রাখল। গয়না সামান্যই আছে গায়ে, এগুলো প্রায় সবই নিয়ে যাবে। নতুন ব্যবসায়ের এগুলোই হবে পুঁজি।

কিন্তু এই দুল জোড়াটা? এটা নরেশের দেওয়া। এটাকে তো খুলে যেতে হবে। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যমুনা চোখ থেকে গড়িয়ে নামা চোখের জলের ভিজে দাগ ঘষে ঘষে তুলল আঁচল দিয়ে। তারপর দুল জোড়া খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেঁপে যাওয়া হাত কেবলি ফসকে গেল। কানের গোড়ার চুলের সঙ্গে দুল জোড়া এমন জড়িয়ে গেছে, যে কিছুতেই খোলা গেল না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। যাক তবে। নিজে হাতেই নরেশ এটা খুলবে। হয়তো দেবে একটা হ্যাঁচকা টান, কানের লতি যাবে ছিঁড়ে, কয়েক ফোঁটা রক্ত আর চুলে জড়ানো দুল জোড়া নরেশ রেখে দেবে পকেটে। একটু ব্যথা হয়তো করবে যমুনার, শির শির করবে কান দুটো, শরীরটা যাবে কাঠের মত নিস্পন্দ হয়ে, দাঁতে চাপা ঠোঁট দিয়ে একটা যন্ত্রণাসূচক অব্যয় বেরিয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তবু সে এমন বেশি কী। যমুনা একবার দেখতে চায় কত নিষ্ঠুর হতে পারে নরেশ।

টাইমপীস ঘড়িটা বাজছে টিক টিক করে। যমুনা তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছটা। ঐ শব্দ জানান দিচ্ছে, ফুরিয়ে এল, যমুনার বধূজীবনের পরমায়ু ফুরিয়ে এল। ঐ শব্দের সঙ্গে তাল মেলে একমাত্র যমুনার আতঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের। নিজের বিবাহিত জীবনের এই ক'টা দিনকে মনে মনে থিয়েটারের দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতির সঙ্গে তুলনা করলে যমুনা। অন্ধকার, রুদ্ধদ্বার প্রেক্ষাগৃহ, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, কয়েক মিনিটের জন্যে সব ক'টা দরজা গেল খুলে, কিন্তু তারপরেই আবার অন্ধকার।

অন্ধকার ছাড়া কী। নন্দেরচাঁদ বাই লেনের দিনগুলিকে অন্ধকার ঘরের দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী মনে হতে পারে। আবার যমুনা ফিরে যাবে সেখানেই। মাকে গিয়ে বলবে, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনেক সেলামি দিনুম মা, এবার ক্ষ্যামা দাও। আমি যা তাই থাকতে দাও।

তখন কী ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে যাবে মাতঙ্গের মুখ? কী যে উদ্ভট খেয়াল হয়েছিল মাতঙ্গের। নিজের সারাজীবন কেটেছে নন্দেরচাঁদ বাই

লেনের পাকে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই বেসুরো হারমোনিয়ামের আওয়াজ আর ঘুঙুরের বোল ওঠে। রাত একটা দুটো পর্যন্ত শোনা যায় রিক্সার ঠুন ঠুন ; প্রমত্ত নিশাচর বীটের পাহারাওয়ালাকে পালিয়ে ফেরে।

কিন্তু এ জীবনে মাতঙ্গের রুচি ছিল না। সে স্বপ্ন দেখত একটি ছোট নীড়ের, যেখানে সন্ধ্যাবেলা শাঁখ বাজে, ধূপ-সুরভি ঠাকুর ঘরে একটিমাত্র স্নিগ্ধ ঘৃতদীপ জ্বলে।

মাতঙ্গের চোখের ওপর টিয়া বাড়ি কিনলে, তারও বয়স হয়েছিল, সেই বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসল মাসি হয়ে। আর মাতঙ্গকে শেষ বয়সে করতে হল বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি। সময় থাকতে গুছিয়ে নিতে পারেনি, ওর চেহারাটাই দুষমনি করেছে ওর সঙ্গে। ভারি গলায় গান উঠত না, মোটা আঙুলে বাজত না বাজনা। এখনো বাজে না, কাঁসার বাসনে শালপাতার বাজনা বাজিয়েই মাতঙ্গের জীবন গেল। টিয়া ওকে করুণা করত। বলত, তুই নিজে তো কিছুই করতে পারলিনি মাতঙ্গ, তোর মেয়েটাকে আমায় দে। ভরা-ভরা শরীর, রোজগারের সময় তো এই। গলাটাও মিঠে, ওকে আমি এমন গান শেখাব যে লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজিরাও হার মানবে।

টিয়া মাসির বাড়ির সেই হাতে খড়ির দিনগুলি মনে হতেই গায়ে এখনো কাঁটা দেয়। বিকেল হতেই দল বেঁধে গা ধোওয়া। পাতা কেটে, চুল বেঁধে খয়েরি টিপ পরা। তারপর খোলা দরজার দু পাশের রক ঘেঁষে দু সার দিয়ে দাঁড়ান। ওদের মধ্যে তরঙ্গ মাসির ছিল সবচেয়ে সাহসিকা। মাঝে মাঝে সে বেরিয়ে গিয়ে সদর রাস্তা কি পার্ক থেকে খদ্দের নিয়ে আসত। সুবিধে পেলে রাস্তার লোকের হাত ধরে টানাটানি করতেও পেছপা হত না।

কোলে একটা বেড়ালের ছানা, ডান হাতে বিড়ি, তরঙ্গের চেহারাটাও স্পষ্ট মনে আছে যমুনার।

প্রথম প্রথম যমুনার বুক ঢিপ ঢিপ করত। চৌকাঠ পেরিয়ে সংকীর্ণ প্যাসেজটাতে দাঁড়িয়ে লোকগুলো দেশলাই জ্বালত, কিন্তু সিগারেট ধরানোর পরেও নেবাত না কাঠি। একে একে সবার মুখের সমুখ দিয়ে পুড়ে আসা কাঠিটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেত। সৌরভী, তরঙ্গরা কুৎসিত একটা গালাগালি দিত, কিম্বা খিল খিল হেসে গড়িয়ে পড়ত এ ওর গায়ে। আর যমুনা দু হাত দিয়ে ওর মুখটা দিত আড়াল করে। মনে মনে প্রার্থনা করত, হে ভগবান, আমাকে যেন পছন্দ না করে।

তবু কেউ না কেউ পছন্দ করতই। সেই অপরিচিতদের নিয়ে দরজায় খিল দিতে গিয়ে হাত সরত না, বুক দুর দুর করত, সমস্ত শরীর আসত অবশ হয়ে। ওদের হাতে জড়ানো বেলফুলের মালার উগ্র সুবাস ছাপিয়ে উঠত পানীয়ের গন্ধ।

পরদিন সকালে আবার যে-কে-সেই। স্নান শেষে শরীরটাকে মনে হত প্রথম বর্ষার ভেজা মাটির মত স্নিগ্ধ, সরস, নরম।

টিয়া মাসি কোনদিন নিয়ে যেত গঙ্গায়। ঘাটের উড়ে ঠাকুরের হাতে তিলক কেটে টিয়া মাসি ফিরত এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে। ঘরদোর বিছানায় সেই জল ছিটিয়ে দিত মাসি। বলত, পাপ, পাপ, পাপে চারদিক ভরে গেল।

প্রথম প্রথম বিস্মিত হত, পরে শুধু মজা পেত যমুনা। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর এই টিয়া মাসিরই আবার অন্যরূপ। তখন সে তার চুলগুলোকে আলগা একটা গিঁট দিয়ে স্তূপ করে রেখেছে মাথার ওপর, মাংসল শরীরটার আবরণ ঢিলে করে দিয়ে হিসেব নিচ্ছে সকলের কাছে।

সহজ হিসেবের ওপর আরেকটা উপরি হিসেব ছিল টিয়া মাসির। আইনকে বলুচের আড়াল দিয়ে চুপে চুপে চোলাই মদের ব্যবসা চালাত। অবশ্য যারা আসত ওদের কাছে তাদের অনেকেই আগে থেকে চুর হয়ে আসত। কিন্তু তা প্রায়ই এখানে এসে ওদের তেষ্টা পেত। তখন হয়তো নিশুতি রাত। কোথায় আছে নির্ঝরিণী?

আছে। টিয়া মাসির কাছে আছে। ওর তোষক ঢাকা তক্তপোষের আলগা পাটাতনের নীচে চোরা-সিন্ধুকে ঝকঝকে বোতল সর্বদাই মজুত। খিল খুলে এক একটি মেয়ে বাইরে আসে, টিয়া মাসি বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে। কীরে কী চাই? কাছে এসে অন্তরঙ্গ সুরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েরা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করে, আছে?

আছে। ক' বোতল?

সন্তর্পণে তোষক তুলে তালা খুলে চোরা সিন্দুকের রহস্য উন্মোচন করে টিয়া মাসি। আঁচলে দশ-বিশ টাকার নোট বাঁধতে বাঁধতে বলে, ভাগ্ এবার। পালা। যত সব পাপ জুটেছে এখানে।

মুখ টিপে টিপে হাসে মেয়েরা। আর ক' বোতল আছে টিয়া মাসি? তখন টিয়া মুখ খুলে গাল পাড়তে শুরু করে। বোতল? কিসের বোতল। সিন্দুক ভর্তি সব তো গঙ্গাজল।

শুধু গঙ্গাজল, মাসি ?

হাসতে হাসতে মেয়েরা চলে যায়, টিয়া মাসিও হাসতে শুরু করে। এ মাসে যদি পঞ্চাশ বোতল চালাতে পারিস সৌরভী, তবে তোর কুকুরের বরাদ্দ আধপো। মাংস আমি একপো করে দেব।

ক্রমেই সয়ে আসছিল। কিন্তু তবু যেদিন সৌরভীর ঘরে একটা লোক খুন হল, সেদিন ভয় পেয়েছিল যমুনা। পুলিস এল, ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। জেরা করলে কত রকম। সৌরভীকে বুঝি মারধোরও করেছিল। ওদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হল গলির মোড়ের পানওয়ালাটাও।

তারপর ওরা একদিন ছাড়াও পেল। লোকে বলে টিয়া মাসি ঘুষ খাইয়েছিল পুলিসকে। কিন্তু সৌরভীকে ওরা রেখে দিলে। সব কাহিনী যখন জানা গেল, তখন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল যমুনার। ঐ লোকটা সম্প্রতি সৌরভীর ঘরে কিছু ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল। ফুরফুরে বাবু ছিল লোকটা, পায়ে পাম্পসু, গায়ে মিহি পাঞ্জাবি। দামী সিগারেট ছাড়া খেত না। পকেটের রুমাল সর্বদাই এসেন্সে ভুর ভুর করত। সেই লোকটাকে মোড়ে পানওয়ালার সঙ্গে যড় করে মারলে সৌরভী। লোকটা রোজ সন্ধ্যা-বেলাতেই আসবার আগে ঐ দোকান থেকে পান কিনে খেত। পানের সঙ্গে কী একটা ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল সেদিন, লোকটা টলতে টলতে সৌরভীর বিছানা পর্যন্ত এসেই কাং হয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর গভীর রাতে সেই পানওয়ালাটা আর সৌরভী—

সৌরভী ? উঃ ভাবতেও শিউরে উঠে শরীর। ময়লা ময়লা বোকা বোকা চেহারার এই মেয়েটির সঙ্গেই যমুনার ছিল সবচেয়ে বেশি ভাব। ভারি আমুদে ছিল সৌরভী, কথায় কথায় হাসত। তার পেটে পেটে এত—

দশ বছর জেল হয়েছিল বুঝি সৌরভীর।

সেই থেকে সন্ধ্যা হলেই গা ছম ছম করত যমুনার। প্রায় মাস ছয়েক ও বাড়িতে কেউ আসত না। যতদিন মামলা চলেছিল, পুলিস থাকত দরজার সামনে পাহারা।

টিয়া মাসি কিন্তু বেশি ঘাবড়ায়নি। খালি বলত, বাসাটা বদলাতে হবে। এটার বড় বদনাম হয়েছে।

তোমার ভয় করে না টিয়া মাসি ?

ভয় ? মেজের পানের পিক্ ফেলে টিয়া মাসি বলেছে—থুঃ। এই চল্লিশ বছরের জীবনে এই নিয়ে কম-সে-কম দশটা খুন দেখলুম।

শেষ পর্যন্ত বাসা আর বদলায়নি টিয়া মাসি। খালি যে ঘরে সৌরভী থাকত সেই ঘরটা চুনকাম করে দিলে। দেয়ালে ঘটা করে দিলে গঙ্গাজলের ছিটে।

মাতঙ্গ মাঝে মাঝে দেখতে আসত ওকে। যমুনা বলত, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল, মা।

আদর করে ওর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে উকুন বেছে দিত মাতঙ্গ, বলত, নিয়ে যাবরে, যাব। তোর বিয়ে দেব।

বিয়ে দেবে! প্রথমদিন কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল যমুনা ; সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা। আমাদের কি বিয়ে হয়, বেশ্যার মেয়েদের ?

বেশ্যার মেয়েদের! চোখ দুটো মাতঙ্গের একবার জ্বলে উঠেছিল, তারপর ওর দৃষ্টি সুদূর হয়ে গিয়েছিল।

হয় কিনা জানিনে, তবে আমি তোর বিয়ে দেব, দেখিস্। আস্তে আস্তে দৃঢ়তার সঙ্গে মাতঙ্গ বলেছে।

যেদিন থেকে পরের বাড়ির ঝি-গিরির কাজ নিয়েছে মাতঙ্গ, সেদিন থেকেই ওর মাথায় এই ভূত চেপেছে। গৃহস্থবাড়ির রূপ কাছে এসে দেখতে পেয়েছে, আর যত দেখেছে, ততই ওর মনে মোহ জমেছে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মত। তক্‌তকে উঠোন আর সাজানো-গুছানো ছোট একটি ঘর—এমনি বাড়ি যদি একটি তার হত। এখানেও কলহ আছে, নীচতা আছে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আছে অনিবর্চনীয় একটু মাধুর্য ; পরিপূর্ণ শুচিতা আর শ্রী। এ ঘর মাতঙ্গ কখনো পাবে না ; সে বয়স নেই, কিন্তু পায় যেন যমুনা। কিন্তু সে কেমন করে ? কোন্ পথে এই পঙ্কজকে সে পৌঁছে দেবে পূজার বেদীমূলে। উপায় যা হোক একটা কিছু স্থির করতে হবে, ততদিন যমুনা থাক নন্দেরচাঁদ বাই লেনে।

সৌরভীর খালি ঘরে নতুন যে মেয়েটি এল, তার নাম শ্যামা। বেশিদিন আসেনি কলকাতায়। এই বছর চারেক হল।

মোটে চার বছর ?

তুমি বলছ ভাই মোটে ? আমার মনে হয় এক যুগ হয়ে গেল। বলতে

বলতে কেঁদে ফেলে শ্যামা ; কাঁদতে কাঁদতে ওর স্খলনের ইতিহাস বলে, গ্রামের বালবিধবার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সম্ভাবনা, কলঙ্কের ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসা—

তারপর, তারপর ? উৎসুক রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা জিজ্ঞাসা করে।

ম্লান একটু হাসে শ্যামা। বলে, তার আর পর নেই।

তরঙ্গ মাঝখানে তীর্থে গিয়েছিল, কয়েকমাস বাদে ফিরে এল ফ্যাকাশে হয়ে।

কী হয়েছিল তোর তরঙ্গ ?

কী হয়নি তাই জিজ্ঞেস কর বরং। টাইফেট্, নিমুনিয়া, আরো কত কী।

চেহারা কিন্তু তোর বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে ভাই।

দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় তরঙ্গ। বলে, বেঁচে যে আসতে পেরেছি, এই ঢের। বাবা বিশ্বনাথের কৃপা।

শ্যামার কিন্তু বিশ্বাস হয় না তরঙ্গের গল্প। যমুনাকে বলে, বিশ্বাস করলি তুই ওই মাগির গাঁজাখুরি গল্প ? অসুখ হয়েছিল না হাতী। ও নিশ্চয়ই পোয়াতী হয়েছিল, নষ্ট করে এসেছে, আর নইলে ওর ছেলে হয়েছিল, সেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে যমুনা, বুঁজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি জানলে কী করে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল শ্যামা। কথাটা না শোনার ভান করে দূরের চারতলা বাড়ির ছাদের দিকে চেয়েছিল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হতে সামান্য একটু হেসে বলেছিল, চেহারা দেখলেই আমরা টের পাই যে। আমারও হয়েছিল।

তোমার ছেলে হয়েছিল ? উত্তেজিত গলায়, প্রায় চীৎকার করে, জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

পায়ের নখ দিয়ে সিমেন্ট ঘষতে ঘষতে শ্যামা জবাব দিয়েছিল—হয়েছিল।

কী করেছ সেটাকে ? জলে ভাসিয়ে দিয়েছ ?

না। খুব নীচু গলায় শ্যামা ধীরে ধীরে একবারো-না-কাঁপা গলায় বলেছিল, গলা টিপে মেরেছি।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি কেউ। তারপর শ্যামা বুঝি জোরে হেসে উঠেছিল। তোর মনটা এখনো কাঁচা আছে যমুনা। তোকে এখানে মানায় না, গেরস্তের ঘরে মানাত। দিব্যি ঘোমটা টেনে, নোলক পরে বসে থাকতিস্।

তরঙ্গের সঙ্গে ঘেন্নায় তিন দিন কোন কথা বলতে পারেনি যমুনা। বিবর্ণ, ঐ পাংশু মেয়েটিই কি তার সদ্যোজাত শিশুকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে জলে ? বিশ্বাস হয় না। শ্যামা বলেছিল, ছেলে তো কেউ চায় না, তাই মেরেছে ; এই যদি মেয়ে হত, তবে দেখতিস কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির হত তরঙ্গ, অসুখ-টসুখের কথা আর সাজাতে হত না।

মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে টেরি কাটা এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটার সঙ্গে শ্যামার ঘরে আলাপ। লোকটা প্রায় সন্ধ্যাতেই শ্যামার অতিথি হত। শ্যামা নিজে নাচতে জানত না, তাই মাঝে মাঝে যমুনার ডাক পড়ত। লোকটা একদিন ফরাসের ওপরই ঘুঙুরসুদ্ধ পা জোড়া জড়িয়ে ধরেছিল যমুনার। এমন পাখির মত হালকা পা তোমার, থিয়েটারে নামো না কেন ?

থিয়েটারে ? বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

হ্যাঁ, ডায়না থিয়েটারে নাচ শেখায় লোকটা। নাট্যকার হবে শিগ্‌গিরি। মাঝে মাঝে বগলে করে একটা এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে আসত, সেইটেই ওর স্বরচিত নাটক। সুভদ্রাহরণ কি ওই জাতীয় নাম হবে। শ্যামার ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে সেই নাটকের মহলা হত। লোকটা একটু একটু করে পড়ে শোনায়, এক এক চুমুক খায়, আর রক্তিম মুগ্ধচোখে যমুনার দিকে চেয়ে ওর অভিনয় কৌশলের তারিফ করে বলে, এ নাটকে হিরোয়িনের পার্ট তোর বাঁধা। আমি শ্রীমন্তবাবুকে বলে রেখেচি। থিয়েটারে কিন্তু এসব যমুনা-টমুনা চলবে না, তখন তোর নাম হবে মিস্ রোজ।

মিস্ রোজ ? গোলাপী রঙের ছিটে লাগত যমুনার গালে, শ্যামা নতুন কেনা তাকিয়াটার ওপর গড়িয়ে পড়ত হাসতে হাসতে।

শেষ পর্যন্ত যমুনা ডায়না থিয়েটারে হিরোয়িনের ভূমিকায় নামত কিনা বলা যায় না। কিন্তু মাতঙ্গ একদিন এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

দুপুরবেলা একদিন এসে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

কোথায় মা ? রাত্রি জাগরণের পর সমস্ত শরীরে শৈথিল্য এসেছিল, ফোলা ফোলা চোখ যমুনার, একটা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মা ?

মাতঙ্গ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, যা, চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। এক জায়গায় তোর বিয়ের কথা কয়েছি, চটপট তৈরি হয়ে নে।

সাজতে গিয়ে সেদিন বার বার হাত কেঁপে গেল যমুনার। পছন্দ আর

হয় না। ছাপা শাড়ি পছন্দ যদি বা হল ব্লাউজের সঙ্গে আর মেলে না। চুলটাই যমুনা বাঁধলে কত রকম করে।

সাজগোজ সারা করে বেরিয়ে যখন এল, তখন মাতঙ্গ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, তুই এ কী করেছিস্ বল্ তো যমুনা !

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। কী মা ?

এমনধারা সেজেছিস কেন ? ভদ্রলোকের বাড়ি যাচ্ছিস, না বেশ্যাবিত্তি কত্তে যাচ্ছিস লা ? খোল্, খোল্ শিগগির ওই রঙচঙে শাড়িটা, একটা ফর্সা লাল পেড়ে কিছু পর। অত গয়নাও পরতে নেই, মোছ গালের রঙ।

ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করে রুচিও কিছু ভদ্রলোকের মত হয়েছে মাতঙ্গর।

যমুনা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কম্পিত হাতে মাতঙ্গ যা-যা বললে অবিকল তাই করলে। কলে গিয়ে ফের মুখ ধুয়ে এল। মুছে ফেললে কপালে কাচপোকাব টিপ। পাতা কেটে চুল বেঁধেছিল অভ্যাস অনুযায়ী, সেটা খুলে চুলগুলোকে সংবরণ করলে সাধারণ একটি খোঁপায়।

মাতঙ্গ খুশী হয়ে বললে, এই তো দিব্যি মানাচ্ছে। মা আমার যেন সরেস্তী।

রাস্তায় নামতে যত রাজ্যের সংস্কার এসে জড়িয়ে ধরে পা দুটো, নাছোড প্রণয়ীর মত। মোড়ের রহমৎ গাড়োয়ানের ছেলেটা, পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি দিচ্ছিল, সে কি একটা রসিকতা করলে। ওরিয়েণ্টাল থেমটা পার্টির ম্যানেজার রকে দাঁড়িয়ে শিষ দিলে একবার। ‘স্পিশাল সেলুনের’ লম্বা জুলপিওয়ালা কারিগরটা ভ্রূ-ভঙ্গি করলে। অন্যদিন যমুনা হয়তো এক মুহূত দাঁড়াত, মুচকি হাসত একটু ; আজ ভ্রূক্ষেপ করল না। একে তো মা সঙ্গে যাচ্ছে, তাতে আবার যমুনা যাচ্ছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। চালচলনটাও করতে হবে তেমনি। আজ তো মৃগয়া নয় ! লোল কটাক্ষ আর ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, সব রেখে যেতে হবে পেছনে, এই নদেরচাঁদ বাই লেনে।

সারা রাস্তা মাতঙ্গ যমুনাকে তোতাপাখি পড়াতে পড়াতে নিয়ে গেল। দায়িত্ব তো কম নয়, ঝুঁকিও নয় সামান্য। মেকিকে মন্ত্রবলে খাঁটি করে দেবে মাতঙ্গ, লোহাকে স্পর্শমণি ছুঁইয়ে করবে সোনা।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এক গলিতে ‘সমাজ সংস্কারক’ অফিস। টেবিলের

সম্মুখে সম্পাদক কাজ করছিলেন। সৌম্যমূর্তি, শাদাকালো মেশানো দাড়ির আড়ালে অনিশ্চিত একটা বয়স লুকানো।

মা নমস্কার করলে, মার দেখাদেখি যমুনাও।

মাতঙ্গ বললে, আমার মেয়ে। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার যমুনাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সম্পাদক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হুঁ। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ। ওঁর পায়ের কাছে বসে যমুনা ওঁর বুক পকেটের চেন লাগানো ঘড়িটার অতি ক্ষীণ টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

হঠাৎ খানিকক্ষণ বাদে সম্পাদক সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। একবার ওর, একবার মার, মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে—

মাতঙ্গ বললে, যদি কোন উদাব ছেলে পাই তো—

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সম্পাদক বললেন, পাবে। কয়েকটি জানাশোনা ছেলে আছে আমাব হাতে। এ রকম বিয়ে আমরা গোটাকতক দিয়েছিও। আমবা শুধু কাগজে কলমেই সমাজ সংস্কার করি না, হাতে কলমেও করি। কিন্তু—

কিন্তু কী? না, সামান্য একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। একেবারে গণিকার গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করতে কোন পাত্র সহজে রাজী হবে না। তার চেয়ে, চশমা খুলে পকেটে রেখে সম্পাদক বললেন, তার চেয়ে ধর যদি ওদের বলি—

আস্তে আস্তে সম্পাদক ওঁর কৌশলটা ব্যক্ত করলেন। যমুনা দিনকতক থাকবে ওদের সমিতি পরিচালিত আশ্রমে। মফঃস্বল থেকে এসেছে, দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীতা, স্বজন পরিত্যক্তা কুমারী, এই ধরনের একটা বিশ্বাস্য গল্প তৈরী করে চালাতে হবে।

আশ্রমে এসে বেশিদিন থাকাও হল না। মা রোজ এসে খোঁজ নিত। আসতেন 'সমাজ সংস্কারকের' সেই প্রবীণ সম্পাদক গিরিজাবাবু। এখানে আরো ক'টি মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না। যমুনা সংকুচিত হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। এখানকার মেয়েরাও মিশুক নয় তেমন। সব যেন কেমন ঠাণ্ডা, বোবা, স্থির। কথা বললে, শান্ত

চোখে তাকায় কেবল। যে অতি তরল, অতি মুখর জীবনের সঙ্গে যমুনার পরিচয়, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

একদিন এক পাত্র এসে দেখে গেল ওকে। পরে শোনা গেল তার পছন্দও হয়েছে। যখন দেখতে এসেছিল তখন তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করেনি যমুনা, কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না তার মুখ। পরে শুনলে, নাম নরেশ, কাছাকাছি মফঃস্বলের কী একটা জায়গার ডাক্তার। বিপত্নীক। শুনেছে যমুনার কল্পিত তত্তাগোষ কাহিনী। বিয়েয় আপত্তি নেই।

বিয়েব সেই নির্দিষ্ট দিনটি এল। সেদিন শ্রাবণ মাস, সারাদিন বৃষ্টি। বিকেল হতেই চারধার অন্ধকার হয়ে এল। আশ্রমের গলিটায় থৈ থৈ জল। এমন দিনে কি কারুব বিয়ে হয়। আলো পর্যন্ত জ্বলল না রাস্তায়। এমন দিনে দুর্যোগে লোকে ঘরে বাসি মড়া রাখে, তবু রাস্তায় বার করে না।

শিরশিরে হাওয়া, যমুনা সেদিন গা ধোয়নি পর্যন্ত। কিন্তু তব গলির বাঁকে সন্ধ্যার একটু পরেই ছ্যাকরা গাড়ি দেখা গেল একটা, আব সেটা থামলো আশ্রমেব ঠিক সমুখেই।

দরজা খুলে প্রথমে নামলেন, 'সমাজ সংস্কারক' সম্পাদক গিরিজাবাবু। তাঁর পিছনে আরেকজন লোক কোঁচা হাতে রকে লাফিয়ে উঠল, সন্তর্পণে জল বাঁচিয়ে। এই কি বর?

সন্দেহ কী। ছেলে পরা টোপবটাকে সোজা করে বসিয়েছে মাথায়। মুখে দু চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, মুছতে গিয়ে চন্দনের ফোঁটাগুলোও গেল মুছে।

তারপর আস্তে আস্তে আলো জ্বলল, শাঁখও বাজল। আশ্রমের মেয়েরা উলু দিল। গিরিজাবাবু পুরুত নিয়েই এসেছিলেন, তিনি মন্ত্র পড়লেন, বিয়ে হল।

নতুন জীবন শুরু হল যমুনার।

পরদিন এসেছিল মাতঙ্গ। দূর থেকেই দেখলে নরেশকে, কেননা নরেশ তার পরিচয় জানে না। যমুনাকে তার নতুন পরিচ্ছদে কত রকম করে যে দেখলে মাতঙ্গ, ঠিক নেই। সিঁথিতে সিঁদুর তুলেছে যমুনা, এ সাফল্য যেন যমুনার একার নয়, মাতঙ্গেরও। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে মাতঙ্গ ওর সারাজীবনের স্বপ্ন সফল করেছে। যমুনাকে প্রমোশান দিয়েছে ভদ্রসমাজে।

নরেশকে বেশি কিছু দিতে হয়নি; মোট দুহাজার টাকা, সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছে সাতশো। মাতঙ্গের নিজের বলতে আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

তুমি এবার কি করবে মা?

আমি? মাতঙ্গ হেসে বলেছিল, আমার জন্যে ভাবিস্‌নি। আমার চলে যাবে; আমি তো এবার নিশ্চিন্ত। যে ক'দিন শরীরে কুলোবে খেটে খাব, তারপর তীর্থটীর্থ—

যমুনার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল, নিজের বলতে মাতঙ্গ কিছুই রাখেনি, সব উজাড় করে দিয়েছে মেয়েকে।

যমুনার মনে আশংকা ছিল, হয়তো নরেশ ওকে জেরা করবে, ওর অতীত জীবনের খুঁটিনাটি জানতে চাইবে। দুর্বৃত্তদের হাতে ওর অপমানের একটা কাহিনী রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা সব সময় যমুনার ভাল খেয়াল থাকত না। হয়তো কী বলতে কী বলে বসবে, সামঞ্জস্য থাকবে না কাহিনীতে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হল নরেশের কথায়।

আমি শুনেছি সব, ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নরেশ বললে, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা। এতে তোমার কোন লজ্জা নেই, এ লজ্জা আমাদের, আমাদের সমাজের, যারা তোমাকে বাঁচাতে পারেনি।

ঈষৎ উষ্ণ করতল নরেশের, তবু যমুনার হাত যেন হিম হয়ে এল। পুরুষের স্পর্শ জীবনে এর আগেও বহুবার পেয়েছে—বহু পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে—কিন্তু নরেশের আজকের এই আশ্বাস বলিষ্ঠ স্পর্শের সঙ্গে কোন অনুভূতির তুলনা নেই। পঙ্ক থেকে উঠে এসে প্রথম নবধারা জলে স্নান করার শুদ্ধ অভিজ্ঞতা।

নরেশ আবার বললে, আমি কিছু শুনতে চাই নে। তোমার অতীত ফুরিয়ে গেছে। বর্তমান আর ভবিষ্যতে কোন ফাঁকি না থাকলেই হল।

মফঃস্বল শহরে ওদের যৌথ জীবনে তৃতীয় কেউ ছিল না। নরেশ কাজের মানুষ, সকাল হতে বেরিয়ে যেত, ফিরত দুপুরে, খেয়ে দেয়ে আবার বেরুত, দেখা হত আবার সেই সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যাটুকুই ওদের দুজনের যৌথ।

মাঝে মাঝে বুক দুরদুর করত। কী জানি, কোথায় বুঝি ত্রুটি

ঘটে যাবে, নরেশ ধরে ফেলে দেবে ও মেকি ; ওর আসল পরিচয় ফুটে উঠবে পারদের মত।

কিন্তু আশ্চর্য, সে সব কিছুই হল না। নরেশ কাজের মানুষ, এ সব খুঁটিয়ে দেখার মত অবসর নেই তার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার বুড়ি ছুঁয়ে যাবার মত বাড়ি আসছে ; একটুখানি হেসে কি একটু হাসি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছে।

আর সন্ধ্যাগুলো ? অল্প অল্প হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপে, তির্যক একটু চাঁদের আলো জানালা গলে মেজেয় গড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। সে সন্ধ্যা শুধু ঘন হয়ে বসবার, স্তব্ধ চোখে তাকাবার।

বেশ কাটল দুটি মাস।

বৃথাই যমুনা ভয় করেছিল ; অশুভ এতটুকু ছায়াও পড়ল না।

কিন্তু কোথা থেকে দিন তিনেক আগে এসে উদয় হয়েছে এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটা। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে।

নরেশের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাঠ পার হয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে খালি পায়ে বালির ওপর দৌড়ে দেখেছে পা বসে যায় কতখানি ; একটু একটু দূরে বাব্‌লা গাছ, কাঁটায় আঁচল গেছে জড়িয়ে, হলুদ ফুল তুলে পরেছে খোঁপায়। কোঁচড় ভরে তুলেছে কাশের গুচ্ছ।

তারপর ধরাধরি করে আবার পা টিপে টিপে আলের রেখা ধরে ফিরে এসেছে। নরেশ দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে ক্লাবে-না-ডিসপেন্সারিতে।

গেট খুলে বাব্‌রিওয়ালা লোকটা চোরের মত পা টিপে টিপে এসেছিল পেছনে।

নরম মাটিতে পায়ের শব্দ হয়নি। সিঁড়িতে পা দিয়েও যমুনা টের পায়নি পেছনে লোক আছে। দুটো সিঁড়ি পেরুতেই আঁচলে টান পড়ল। চমকে ফিরে দাঁড়াল যমুনা। ভীত, চকিত একটা আর্তস্বর কণ্ঠে অর্ধোচ্চারিত হয়েই থেমে গেল। অন্ধকারে একেবারে মুখোমুখি এসে যে দাঁড়িয়েছে তার বাব্‌রি চুলের নিচে রক্তিম চোখ দুটো জ্বলছে গন্‌গনে উনুনের মত।

বিচিত্র হাসি খেলে গেল যমুনার মুখে।

কী চাও ?

ওর আঁচল তখনো লোকটার মুঠোতে। বললে, তোমাকে ফিরে নিতে এসেছি।

ফিরে নিতে ? কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল যমুনার, নিজের কাছেই অপরিচিত শোনাল।

ফিরে নিতে। নিষ্ঠুর নিশ্চিত কণ্ঠে লোকটা বললে। তারপর আপাদমস্তক দেখে নিলে যমুনাকে। দেখলে ওর সীমন্তের সিঁদুর-রেখা, হাতের শঙ্খবলয়, এয়োতির চিহ্ন। হেসে উঠল ব্যঙ্গশাণিত গলায়। বাঃ, ভোল্ তো দিব্যি পালটেছ সুন্দরী। কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি। পোশাক বদলালে ভেতরটা বদলায় না। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

কোথায় ?

ডায়না থিয়েটারে। তোমার হিরোয়িন হবার কথা ছিল মনে নেই ? তোমার মনে নেই, আমার আছে। অনেক খোঁজ নিয়ে তবে নাগাল পেয়েছি।

যমুনার ইচ্ছে হল কেঁদে উঠে লোকটার পা ছুটো জড়িয়ে ধরে। নতুন জীবন নিয়ে পরীক্ষা তার, আদর্শ সংসার, উদার দেবতুল্য স্বামী—

কিন্তু স্বর ফুটল না, একটি কথাও বলতে পারলে না। লোকটার চোখ ছুটি রক্তাভ, কিন্তু সে তো শুধু নেশাতেই নয়, অনুরাগেও। কী এক অদ্ভুত, সর্বগ্রাসী চাউনি ওর সর্বাঙ্গে রসনা লেহন করছে। এই দুঃসাহসী লোকটা চায় কী।

এখানে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। এ তোমার স্থান নয়। সত্যি করে বল যমুনা, তোমার ছিটগ্রস্ত মায়ের খেয়াল মেটাতে তুমি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করছ না ? এই সোনার শিকলে কি অস্বস্তি হচ্ছে না ? সত্যি করে বল পা ছুটি চঞ্চল হয়ে উঠছে না একজোড়া ঘুঙুরের জন্যে ? নন্দেরচাঁদ বাই লেনের মেয়ে তুমি, রকে এসে দাঁড়াতে—

থিয়েটারের বই লেখে লোকটা। কথাগুলো লেখে যেমন, বলেও তেমনি সাজানো। আর শুনতে পারেনি যমুনা। ঝুঁকে পড়ে হাতের কাছে শক্ত গোছের কি একটা পেয়েছিল, সেইটা ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটার মুখে।

কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পরল লোকটার গাল বেয়ে। এক হাতে

ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বললে, ঠিক লাগল না, ফসকে গেল। হাত তোমার এখনো তৈরি হয়নি।

চাপা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা বললে, যা—ও।

যাচ্ছি। কিন্তু কাল সকালে আবার ফিরে আসব।

পরদিন সকালে যমুনা উৎসুক হয়ে রইল, ওর মুখটা এক একবার বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নরেশ বেরিয়ে গেল। গদার মা এল বাসন মাজতে। কিন্তু লোকটার দেখা নেই। আশায় আশংকায় যমুনার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কে জানে, লোকটার মত পরিবর্তন হয়েছে কিনা। হয়তো সে ফিরেই গেছে। কিন্তু এতদূর অবধি খুঁজে খুঁজে এসেছে যে, সেকি ফিরে যাবে এত সহজেই।

স্নান, এমন কি খাওয়া দাওয়াও শেষ হল। নরেশ এল বেলা দেড়টা-দুটোয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শুয়ে পড়ল বিছানায় এ সময়টা নরেশ একটু গড়িয়ে নেয়। আজ আর যমুনা নরেশের কাছে বসল না। আজ তার প্রতীক্ষার পালা। কতক্ষণে বাছু আবার এসে দেখা দেবে কে জানে। শেষে বেলাও পড়ে এল। পশ্চিমের রাস্তার ধারের নারকেল গাছটার ছায়া এসে ঘরে পড়ল, তবু যখন লোকটা এল না তখন যমুনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল; কুগ্রহ হয়তো কেটে গেছে।

চা খেয়ে নরেশ গেছে তৈরি হতে নিতে, যমুনা আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে. হালকা সুরের একটা গানও এসেছে মনে, এমন সময়--

সেই কামানো ঘাড, বাবরি চুল আর ভাঁটার মত দুটি চোখ।

শ্যামার ঘরের সেই লোকটা। নদের চাঁদ বাই লেনে ফিরে যাবার খেয়া নৌকার মাঝি।

সিঁড়িতে চটিজুতোর পায়ের শব্দ। নরেশ উঠে আসছে। যমুনা অনুভব করল ওর হাত পা হিম হয়ে আসছে। নরেশ জেনেছে সব। জেনেছে, যমুনা দুর্বৃত্তের উচ্ছিষ্ট অথচ নিরপরাধ নারী নয়। সে নিতান্তই পণ্যস্ত্রী। দেহের পবিত্রতা তার নষ্ট হয়েছে একটিমাত্র দুর্ঘটনায় নয়, অর্থের বিনিময়ে আত্মদানের পৌনঃপুনিকতায়।

চটি জুতোর শব্দ চলে এসেছে ওপরে। এখুনি ঘরে ঢুকবে নরেশ।

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল যমুনা, বালিশে মুখ গুঁজল। হাত-পা অসাড়, কেবল পিঠটা উঠছে ফুলে ফুলে।

কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, নরেশ ওর শিয়রে বসে। চোখের পাতা, কপাল, চুল কেমন ভিজে-ভিজে। বালিশসুদ্ধ মাথাটা নরেশের কোলে। আস্তে আস্তে নরেশ ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভয় পেয়েছিলে? সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল নরেশ।

মিট মিট করে আরেকবার তাকাল যমুনা। এত সুখ বিশ্বাস করা যায় না। এখনো সে এ ঘরেই আছে, এখনও তাকে তাড়িয়ে দেয়নি নরেশ!

কী হয়েছিল? নরেশ আবার জিজ্ঞাসা করলে।

কিছু না, ক্ষীণকণ্ঠে যমুনা বললে, মাথাটা ঘুরে উঠেছিল একটু। তারপর ভয়ে ভয়ে বললে, শুনেছ সব?

নরেশ ধীরে ধীরে বললে, শুনেছি।

আমাকে এবার তাড়িয়ে দেবে তো?

পাগল, নরেশ বললে, এত ঠুনকো কারণেই সংসারটাকে ভেঙে দেব—তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমাকে যখন বিয়ে করেছি তখনই কি আমার সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওনি?

বিশ্বাস করতে পারছিল না যমুনা। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, পেয়েছি।

সেই উদারতাকেই আরেকটু প্রসারিত করে দিলাম। তোমাকে তো বারবার বলেছি, তোমার অতীত নিয়ে তো তুমি নও, তোমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়েই তুমি।

আরো কী কী যেন বলছিল নরেশ। পঙ্ক থেকে হাত দুটি তুলে ধরেছে যমুনা সূর্যালোকের দিকে, নরেশ তাকে আবার ঠেলে দেবে না। সুখাবেশে চোখ দুটি মুদিত হয়ে এল যমুনার। নরেশ বড়, নরেশ উঁচু, নরেশ মহৎ সে জানত, কিন্তু সে মহত্ত্ব যে এমন অভ্রস্পর্শী তা কখনো অনুমান করতেও পারেনি।

লোকটা চলে গেছে?

—গেছে। আমি দিয়েছি বিদায় করে। তুমি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোও মণি।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিল যমুনা। পাথরের একটা বোঝা নেমে

গেছে। স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরি শেষ হয়েছে আজ। মহত্ত্বের শুচিস্পর্শে নরেশ ওর সমস্ত গ্লানি মুছে নিয়েছে। এখন থেকে সুস্থ, সহজ জীবন যমুনার। শেষ হল পদে পদে কুণ্ঠার বিড়ম্বনা। শেষ পাতাটিও খসে গেছে, এবার শুধু নতুন, সবুজ পাতা। ওর স্বর্গ অটুট রইল। লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়েছে যেন, অত্যল্পকালের মেয়াদ নয়। নিরেনব্বুই বছরের ইজারা।

কিন্তু সেই নিরেনব্বুই বছর ন মাসেই ফুরিয়ে যাবে, তাকি যমুনা তখন জানত।

সেই ঘটনার দিন তিনেক বাদে 'সমাজ সংস্কার' সম্পাদক গিরিজাবাবু এসেছিলেন। সামান্য একটু রোগা হয়েছেন গিরিজাবাবু, কপালে কিছুটা কুঞ্চন, কিন্তু চোখে যেন দিব্য একটা জ্যোতি এসেছে।

প্রণাম করল যমুনা নরেশ কলরব করে অভ্যর্থনা করল। যমুনার আনত মাথা সস্নেহে শুধু একবার স্পর্শ করলেন গিরিজাবাবু। স্বরোপিত চারা গাছটিতে সতেজ হয়ে উঠতে দেখে আত্মপ্রসাদের হাসিতে যেন মুখখানা ভরে গেছে তার। বললেন, এদিকে কাজ ছিল একটু। তাই একদিন নেমে তোমাদের দেখে গেলুম।

বেশ, বেশ। ভারি খুশী হয়েছি।

নরেশের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি খুব কাজ আছে নরেশ? দুটো কথা ছিল।

নরেশ বললে, কিছুমাত্র না। আসুন।

দুজন গিয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণ যমুনা রান্নাঘরে বসে নানারকম খাবার তৈরি করলে।

সন্ধ্যার গাড়িতে গিরিজাবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় আবার আশীর্বাদ করে গেলেন। সুখী হয়ো। কোন অকল্যাণ যেন তোমাকে কখনো স্পর্শ না করে।

এরপর আরো দু মাস কেটেছে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হত। কোথায় আছে মাতঙ্গিনী? এখনো কি দাসীবৃত্তি করছে? যমুনার ইচ্ছে ছিল মাকে কাশী চলে যেতে লিখবে। সেখানে না হয় দু চার টাকা করে হাত খরচ পাঠানো যাবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। তিনদিন নরেশের অসুখটা চাপা ছিল। অল্প অল্প জ্বর, বুঝতে পারেনি। ক্রমে চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে

উঠল, অল্প অল্প কাশির লক্ষণ দেখা দিল। কিসের পর কী ঘটল ভাল বুঝতে পারেনি যমুনা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন এলোমেলো, অসম্বদ্ধ। যখন বুঝতে পারল, তখন হাতের নোয়া খুলে ফেলতে হয়েছে, সিঁথির সিঁদুর গেছে মুছে। আর অপরিমেয় সর্বনাশ ওর পরনের শাড়ির সব রঙ কেড়ে নিয়ে শাদা করে দিয়ে গেছে।

সব হিসেব খতিয়ে দেখা গেল, বেশি কিছু রেখে যেতে পারেনি নরেশ। অতি সামান্য কিছু নগদ, আর এই বাড়িখানা।

কী করবে, কিছু স্থির ছিল না। তালমত কিছু স্থির করবার আগেই কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে উঠে বসল।

সঙ্গে বেশি কিছু আনেনি। নিত্যব্যবহার্য দু-চারখানা কাপড়, হাত-খরচের টাকা কিছু, আর নরেশের ছবি একটা।

অবলা আশ্রমের গিরিজাবাবু তাঁর ঘরে বসে চিঠি লিখছিলেন। যমুনাকে ঢুকতে দেখে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। প্রণাম করতে বললেন, বসো। আস্তে আস্তে বললেন, কিছু জানাতে পারিনি তো?

আশ্রমেই একটা ঘর ওর জন্য নির্দিষ্ট হল। সেই ঘরের দেওয়ালে নরেশের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখলে যমুনা। প্রতিদিন ধূপ ধুনোয় সেই প্রতিকৃতি উপাসনা, তাজা ফুলের মালা ফটোটার গায়ে ঝুলিয়ে দিত।

ক্ষণকালের জন্যেও যে মানুষটি ওকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছিল, তার আসন যমুনার মনে চিরদিনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বেঁচে থাকতে তবু নরেশের দু-চারটে দোষ ত্রুটি চোখে পড়ত। মর দেহ ত্যাগ করে সে যমুনার কাছে দেবত্ব লাভ করলে।

গিরিজাবাবু একদিন বললেন, তোমার মার বড় অসুখ যমুনা, একদিন দেখতে যেও।

খোলার ঘরের মেজেয় ময়লা বিছানায় পড়ে আছে মাতঙ্গিনী। যমুনা ডাকলে, মা।

চোখ দুটো যেন অতি কষ্টে মেলে একবার চাইল মাতঙ্গী। এসেছিস? যমুনার নিরাভরণ হাত দুটির দিকে চেয়ে মাতঙ্গিনীর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে যমুনার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

যমুনা স্থির করেছিল এখানেই থেকে যাবে, অন্তত মা সেরে ওঠা পর্যন্ত। আশ্রম থেকে ওর জিনিসপত্র আনিয়ে নিলে।

মাতঙ্গ মনে মনে খুশী হল। এখানে তুই থাকবি মা? থাক তবে। কিন্তু একটু অস্বস্তিও যেন বোধ করছে মাতঙ্গ। সর্বস্ব ব্যয় করে মেয়েকে সে সমাজের ওপর তলায় তুলে দিয়েছে, আবার এখানে এসে বাস করলে যমুনা নেমে আসবে না তো। জীবনের আগাগোড়া ফাঁকির মধ্যে ওই একটুমাত্র সান্ত্বনা আছে মাতঙ্গের, তার মেয়ে ভদ্র। বিধবা হলেও ভদ্র।

বিকেলের দিকে দু শিশি ওষুধ হাতে করে যে লোকটা ঘরে ঢুকল তাকে দেখে যমুনার সমস্ত প্রত্যঙ্গ হিম হয়ে এল।

সেই বাব্‌রি চুল, কামানো ঘাড়, লাল চোখ, কালো দাঁত।

চিনে চিনে আবার এসেছে শনি, পথ শুঁকে শুঁকে।

বোঝা গেল লোকটাও কম বিস্মিত হয়নি। আড়চোখে একবার যমুনার দিকে তাকিয়ে সে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বসল। ওষুধের শিশি দুটো রাখল শিয়রে। চাপা গলায় সেবনবিধি সম্বন্ধে কী যেন বললে মাতঙ্গকে।

মাতঙ্গ বললে, যা বলবে আমার মেয়েকে বল বাছা। ওই তো এসেছে। একটু থেমে বললে, কপাল পুড়িয়ে এসেছে।

যমুনার মনে হল লোকটার মুখে বিচিত্র একটুখানি হাসি খেলে গেল যেন। শেষ পর্যন্ত যেন বাজি জিতে গেল সে-ই। অর্থাৎ যমুনাকে আসতে হল তো আবার সদেবচাঁদ বাই লেনে।

মাতঙ্গ বললে, আমার অসুখে গঙ্গাধরই দেখাশুনা করছে। বড় ভাল ছেলে গঙ্গাধর।

কিন্তু ততক্ষণে কঠিন হয়ে গেছে যমুনা। মন স্থির করে ফেলেছে। লোকটার ভুল ভেঙে দিতে হবে। সে যে নেমে আসেনি সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে উঠে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু পালাবে কোথায়? অহরহ সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে গঙ্গাধর। ওষুধের গেলাস ধুতে কলতলায় যমুনা উঠে গেছে যদি, গঙ্গাধরও গেছে পিছনে। যমুনার ওঠা বসায়, চলায় ফেরায় অনুক্ষণ ওর শিকারী দৃষ্টি যমুনাকে অনুসরণ করছে।

কী চায় লোকটা? এখনো কি ও আশা রাখে যমুনা 'ডায়না' থিয়েটারে যোগ দেবে, ওর লেখা নাটকে হবে হিরোয়িন?

শ্যামা বললে, তাই। খবর পেয়ে শ্যামা দেখা করতে এসেছিল। যমুনার মুখে আদ্যোপান্ত শুনে বললে, হবে না? ও একেবারে হন্যে কুকুরের মত

হয়ে আছে যে, তোকে ওই থিয়েটারে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে টাকা খেয়েছিল যে।

টাকা খেয়েছিল? যমুনা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

খেয়েছিল তো। শ্যামা বললে। ডায়না থিয়েটারের মালিক সুদাম শীলকে আমি চিনি। ওর স্বভাবই ওই। টাকা দিয়ে যেখানে মনের মতন জিনিস পাওয়া যায় সেখানে সে পেছপা হয় না।

তারপব?

—তারপর তুই চলে গেলি। টাকাটা এদিকে ও ভেঙে ফেলেছে। ফেরৎ না দিতে পেরে চাকরি যায় যায়। সেই থেকে ও কেবল তোর খোঁজ করে বেরিয়েছে।·· একটু হুঁশিয়ার থাকিস ভাই।

মাতঙ্গ সেরে উঠছিল। যমুনা সেইদিনই আশ্রমে চম্পট দিলে।

রাহু এসে উদয় হল সেখানেও।

সন্ধ্যাবেলা সবে নরেশের ফটোতে মালা ঝুলিয়েছে যমুনা। ধূপ জ্বালাতে হবে, এমন সময় বাইরেব জানালার কাছে ছায়া পড়ল। কার আবার। গঙ্গাধরের। দুটো শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যমুনার দিকে। পা দুটো একবার কেঁপে উঠল যমুনার। এক্ষুনি অবশ্য জানালাটা বন্ধ করে দিতে পারে, কিম্বা দারোয়ান ডেকে ধরিয়ে দিতে পারে লোকটাকে। কিন্তু তাতে কি নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? তার চেয়ে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক আজ।

কী চাই? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে যমুনা।

গঙ্গাধর একবাব এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল।—দরজা খোল, বলছি।

আজ নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে যমুনা। কোথা থেকে অদ্ভুত একটা সাহস এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে নিয়ে এল গঙ্গাধরকে। ধূপের গন্ধে, দীপের আলোয় রহস্যময় হয়ে আছে ঘরখানা। সেই ঘরের মেঝেয় মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে।

—এবার বল।

—আমার সঙ্গে চল। পুরনো কথাবই পুনরাবৃত্তি করলে গঙ্গাধর। নির্বিকার কণ্ঠে, অক্লেশে। এতটুকু বিচলিত হল না।

আর সঙ্গে সঙ্গে যমুনা যেন ফেটে পড়ল। লজ্জা করে না, জানোয়ার। কার সমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জান না তুমি!

তবু মিটি মিটি হাসছে গঙ্গাধর—লোকটা আসল শয়তান—কার সমুখে ?

হিড় হিড় করে ওকে যমুনা টেনে নিয়ে এল নরেশের ফোটোর সামনে।—চেয়ে দেখ, আমার স্বামী। উনি আজ নেই, কিন্তু আমি ওঁরই। দেবতা ছিলেন উনি, আমাকে টেনে তুলেছিলেন। মহৎ ছিলেন, আমার সব কিছু জেনে শুনেও ঘরে পাশে স্থান দিতে ইতস্তত করেন নি। আর তুমি

নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে গঙ্গাধর বললে আমি কী ?

—তুমি হীন, নীচ, কীট কৃমি তুমি। টাকা ঘুষ খেয়ে আমাকে থিয়েটারের মালিকের কাছে বেচে দিতে চেয়েছিলে, কিম্বা এখনো চাও।

—চাই। অনায়াসে বললে গঙ্গাধর। এখনো চাই। টাকাও খেয়েছি সত্যি। কিন্তু একলা, কিন্তু একলা কি আমি? তোমার স্বামী—

—টাকা খেয়েছিলেন? চিৎকার করে উঠল যমুনা।

—খেয়েছিলেন। শান্ত গলায় গঙ্গাধর বললে, উত্তেজিত হয়ো না, তিনিও টাকার লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছিলেন। নতুন ডাক্তার, তখনো পসার জমেনি, পরের টাকায় ডিস্পেন্সারি সাজিয়েছিলেন. তোমার মার টাকায়, একটি একটি করে জমানো টাকায়। তিনি জানতেন, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, দুর্দৈবে পড়ে একবার মাত্র লাঞ্ছিত হয়েছ। তারপর যখন জানলেন, তুমি তা নও, তোমার জন্ম এবং বৃত্তি কোনটাই গৌরবের নয়—

—তুমিই জানিয়েছিলে, তারপর ?

—তিনি আমার দেবতা—

—বা।

না, গ্লানি নয়, আত্মধিক্কার নয়—কেননা তিনি উদার ছিলেন। কিন্তু হয়তো ভেবে দেখলেন, উপরি উদারতাটুকুর জন্যে কিছু উপরি টাকা চাই। ভদ্রঘরের মেয়ের জন্যে যদি তিন হাজার পেয়ে থাকেন, তবে গণিকার মেয়ের জন্যে চাই অন্ততঃ আরো তিন হাজার। সহজ হিসেবে সেই মর্মে দাবী জানিয়ে চিঠিও দিলেন গিরিজাবাবুর মারফত তোমার মাকে। পেয়েও গেলেন। অত টাকা তোমার মার ছিল না। সব কুড়িয়ে কাচিয়ে হল এগারোশো। আরো চারশো টাকা নিজে থেকে দিয়ে গিরিজাবাবু রফা করলেন দেড় হাজারে।

টকটকে লাল দেখাচ্ছে যমুনার মুখ। ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে প্রদীপের সলতের বুক জ্বলছে। রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললে, মিথ্যুক।

কর্ণপাত না করে গঙ্গাধর বললে, সেই ব্যাপারটার ফয়সালা করতেই তো গিরিজাবাবু সেবারে তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন।

—মিথ্যুক, মিথ্যুক।

গঙ্গাধর মৃদু হেসে বললে, প্রমাণও আছে। জামার পকেট থেকে বার করলে অতি জীর্ণ, পুরনো একখানা কাগজ। বাড়িয়ে দিলে যমুনার দিকে।

কম্পিত হাতে যমুনা টেনে নিলে কাগজটা। নরেশের হস্তাক্ষর :

'শ্রদ্ধেয় গিরিজাবাবু, আপনি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। ভদ্র ঘরের মেয়ে বলিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, সম্প্রতি জানিয়াছি সে জন্মকুলটা। আপনাকে অভিযুক্ত করিতে পারিতাম, জেলেও পাঠাইতে পারিতাম। কিন্তু অতদূর যাইতে চাহি না। ভাবিয়া দেখিলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। যদি সমাজচ্যুত নারীকে বিবাহ করিবার সাহস আমার থাকে, তবে পতিতাকে গ্রহণ করিবারও আছে। কিন্তু একটি কথা। আমার এখন কিছু হাত টানাটানি চলিতেছে। যদি যমুনার মাতাকে বলিয়া কিছু টাকা—অন্তত: তিন হাজার '

অক্ষরগুলো ক্রমশ: ঝাপসা হয়ে এল। চিঠি থেকে মুখ তুলে একবার গঙ্গাধরের দিকে চাইল যমুনা : নরেশের ফটোর পাশে দাড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে লোকটা নির্লজ্জ, নির্বিকার বিড়ি টানছে। মুখে পরিচিত সেই বিচিত্র হাসি।

হাতের কাছে ফুলদানী ছিল একটা। যমুনার একবার মনে হল, সেটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে আঘাত করে লোকটাকে। কিন্তু আশ্চর্য, সেটাকে তুলতে পারলে না কিছুতে। ওর সমস্ত জোর নিমেষে যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, আঙুলগুলোও অবশ। ঝাপসা চোখে নরেশের ছবি আর গঙ্গাধরের মুখ একাকার হয়ে গেছে।

। শুকসারী ।

আঙুরলতা | বিমল কর

মনে হল না এই মাত্র অতিবড একটা সর্বনাশ ঘটে গেল আঙুরের— আঙুরলতার ঘরে।

হাউমাউ করে কেঁদে নন্দর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আঙুর। দুটো ঠাণ্ডা পা নিজের বুকের মধ্যে দু-হাতে জাপটে ধরে মাথা ঠুকতে শুরু করল না; আধভেজান দরজাটা হাট করে দিয়ে ছুটে যে বাইরে যাবে, চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকবে, তাও না। নন্দর চৌকির পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে একটু কাঁদল না পর্যন্ত।

মধুর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ মেড়েছিল আঙুর। আঙুল দিয়ে নন্দর জিবে আস্তে আস্তে সেটা মাখিয়ে দিতে মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু আগে। নন্দর যখন সাড়া পাওয়া গেল না, দশ ডাকেও ঠোঁট ফাঁক করল না, জিব বার করল না একটুও—আঙুর তখন তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটার বোজা চোখের পাতা দেখল সন্দেহভরে। একটা কালো পিঁপড়ে উঠেছিল পলকের তলায়। ঘাড়টা একটু কাত্‌ হয়ে রয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। সমস্ত মুখখানা সেদ্ধকরা বাসি ডিমের মতন শুকনো, শক্ত শক্ত, ফ্যাকাসে। যে-আঙুলে মধু চ্যবনপ্রাশ মাখিয়ে নিয়েছিল আঙুর নন্দর জিবে ছুঁইয়ে দেবে

বলে, সেই আঙুলটাই নন্দর নাকের তলায় ধরল। না, নিশ্বাস পড়ছে না নন্দর। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নন্দর নাকের ডগার সঙ্গে ছুঁয়ে গেল। ঠাণ্ডা। নন্দর বুকে হাত রাখল, কান পাতল। কোন শব্দ নেই। যাই যাই করছিল মানুষটা! আজ যাই কি কাল যাই। যাক, শেষ পর্যন্ত চলেই গেছে।

মধু মাড়া খলনুড়িটা কুলঙ্গির মধ্যে রেখে দিতে এসে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিল আঙুর। হিমুদের পুরনো টিনের চালার ওপর এখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাটির দেওয়ালগুলো ভিজে সপ্সপ্। ডোবাটার নীল জলে শ্যাওলা থিকথিক করছে। আশশ্যাওড়া আর কচুর জঙ্গলে ক'টা কাক ভিজছে আর ডাকছে।

জানলার কাছ থেকেই ঘুরে দাঁড়াল আঙুর। নন্দর দিকে আর একবার চাইল। নড়বড়ে সরু চৌকিটার ওপর কতকগুলো এলোমেলো হাড় যেন কেউ চিট ছেড়া কাঁথার তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। দুটো মাছি এসে বসেছে নন্দর মুখে।

নন্দ তো মরে জুড়োল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল! আঙুর ভাবছিল: এখন কি করি। কাকে ডাকি, কার পায়ে ধরি, কার কাছে হাত পাতি?

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আঙুরের। পাজী নচ্ছারটা যেন বুঝেসুঝেই এসেছিল এখানে। যেন ঠিক করেই এসেছিল, এটো পাতটা আঙুরকে দিয়েই তুলিয়ে নেবে। সেই জেদও রাখল।

এখন কি করে আঙুর? এ-ভাবে তো ঘরের মধ্যে মড়া ফেলে রাখা যায় না। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার, পোড়াবার কি হবে?

খানিকটা ভেবে আঙুর ঘরের পূব দিকের দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। তোবড়ানো রঙচটা বাক্সটার ওপর ক'টা পোঁটলা পুঁটলি গুটানো মাদুর চাপানো ছিল। তারই ওপর কালো ছিটকানো বেড়ালটা মুখ গুঁজড়ে ঘুমোচ্ছিল।

চোখে পড়তেই আঙুর যেন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। খপ করে ধরে বেড়ালটাকে আধভেজানো চৌকাটের দিকে ছুঁড়ে মারল। থপ্ করে একটা শব্দ, বেড়ালটার সামান্য একটু ককিয়ে ওঠা। দরজার ফাঁক দিয়ে পালাল জন্তুটা।

যেমন করে বেড়ালটার টুঁটি চেপে ধরেছিল আঙুর, তেমন করেই মাদুর

পোঁটলা-পুঁটলি, একটা উদোম বালিশ—মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ও। 'যত আপদ সব। আমার কপালেই জোটে গো—এত আশ্চর্যি। কেন, তোদের আর জায়গা হয় না। হারামজাদা, নচ্ছারের দল। অন্য ঠাঁই নেই? শুতে পারিস না, মরতে পারিস না সেখানে। না থাকে রাস্তায় যা, ভাগাড়ে যা।'

আঙুরের গলা চড়ল। যখন বেশ চড়ায় উঠল তখন আঙুর যেন থেমে গিয়ে প্রত্যাশা করছিল এইবার অন্য কেউ কথা বলবে। ম্লান বিষণ্ণ, ভাঙা ভাঙা, চাপা গলায়। কিন্তু কোন জবাব আসছে না দেখে মুখ ফিরিয়ে নন্দর দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, লোকটা মরে গেছে।

রঙচটা, তোবড়ানো বাক্সটা খুলে বসল আঙুর। হাঠকাল, হাতড়াল। একটা পাটের ফাঁস পাওয়া বাংলার শাড়ি বের করল দুটো তাঁতের—ছেঁড়া পেঁজা। সায়াও একটা সাটিনের একটা বাডিজ— কাঠের কৌটো, প্রসাদী ফুল যাঁ।। ন্যাকড়া রোল্ডগোল্ডের মেডমেডে কান পাশা, ঝুটো কাঁচের মালাও একটা। আর বেকল একপাতা সিঁদুর। কটা মাথার কাঁটা।

আঙুর সিঁদুর পাব মাথার কাঁটা কটা হাতে ধরে একটু চুপ করে বসে থাকল। নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল না, কিন্তু চোখ দুটো ওর মনে মনে নন্দকেই দেখছিল। বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে। তখন নন্দর গায়ে মাংস ছিল, হাড়টা চোখে পড়ত না। নাকটা ছিল চোখ টানা। ভরাট গাল, বড় বড় চুল।

আঙুরের বুকের মধ্যে এতক্ষণে টনটন করে উঠল। গলার কাছে নিশ্বাসটা একটু সময় চাপ হয়ে থাকল। চোখের সাদা জমি ব্যথা ব্যথা করে জল জমছিল। এক ফোঁটা জল একটা গাল ভিজিয়ে পড়ল টপ্ করে—হাতের ওপর। ঠিক কব্জির কাছটায়। আর আঙুর সে-দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাক্সের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিল।

না, নেই। সেই শাখ জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাখা তো নয়, শখের শাখা, স্বামীর সিঁদুর তো না, যে লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়েমানুষ করে তার একচেটিয়া জবরদস্তির সিলমোহর ও-সিঁদুর। আঙুর শাখা ফেলে দিয়েছিল, সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। সে অনেকদিন হল।

চোখটা মুছে নিল আঙুর। এই যে তার মনটা খারাপ লাগছে, কান্না

আসছে—এর জন্যে নিজের ওপরই তার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এবার সে ন্যাকামি শুরু করেছে। যেন এই ন্যাকামিটুকু করা উচিত, করলে পাঁচজনে দেখবে, অন্তত নন্দ।

ঘাড় ঘোরাল আঙুর। না, নন্দ আর দেখবে না। ও মরেছে।

বাক্স হাতড়ে খুঁটে খুঁটে সবশুদ্ধ সাড়ে এগারো আনা জুটল। একটা অচল টাকা আছে। এমনই অচল যে, কোন রকমে চালাবার উপায় নেই। যে হারামজাদা ফাঁকি দিয়ে এটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সে আর কোনদিন এল না। এলে আঙুর তার কাছ থেকে টাকাটা ঠিক আদায় করে নিত। ঠাকুর বাড়িতে মানুষ অচল চালায় আর চালাবার চেষ্টা করে তাদের এই পটিতে।

সাড়ে এগারো আনা—আর আঙুর মনে মনে খুঁজে-পেতে দেখল, কুলঙ্গিতে গেলাস চাপা দেওয়া একটা মাধুলি আছে, দোক্তার কৌটার মধ্যে একটা দুয়ানী। ও, হ্যাঁ— আর আনা ছয় পয়সা আছে চালের হাঁড়ির মধ্যে। কত হল সবসুদ্ধ তাহলে। সেই এক টাকা সাড়ে এগারো আনা।

এক টাকা সাড়ে এগারো আনায় একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান-টোড়ান সম্ভব? আঙুর যদিও এমন ঝামেলায় আগে পড়েনি তবু জানা কথাই গোটা দুয়েক টাকা শ্মশান খরচ লাগে না।

কি করবে, কি করা যায়—আঙুর ভাবছিল। কূল পাচ্ছিল না। বিক্রি করবে, বাঁধা রাখবে—এমন কোন জিনিসই আর তার কাছে নেই। কি আছে তার এখন? এক রতি সোনা না, রূপো না, এমন কি কাঁসাও নেই। সোনা কোনকালেই ছিল না। সোনার পাত পরানো হালকা চুড়ি চার গাছি ছিল এককালে নন্দই করিয়ে দিয়েছিল। তবে, সে চুরি করেই গেছে। কানের দু-তিন আনা সোনা ছিল, তা অবশ্য আঙুর তার রোজগারে গড়িয়েছিল। সেটাও গেছে মাসদেড়েক আগে নন্দ আসার পর।

নন্দ এল, আর যেন মস্ত বড় হাঁ নিয়েই হারামজাদা এসেছিল, আঙুরের কানের তিন আনা সোনা গেল খাঁটি সোনা, নাকের দেড় আনা—মাথায় গোঁজা রূপোর চিরুনিটা, দুখানা রেশমী শাড়ি, কাঁসার থালা, বাটি, গেলাস—টুকিটাকি আরও কত কি।

কি করবে আঙুর! আহা, সে কী সেধে এনে ঘরে ঢুকিয়ে চৌকি পেতে দিয়েছিল। অত পিরীতের লোক ছিল না নন্দ তার। বরং ওই ছ্যাচড়া,

শয়তান, ইতর, স্বার্থপর লোকটা যখন ধুকতে ধুকতে এসে উঠল, আঙুর তো তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়েছিল।

মুখপোড়া মাগীচাটা তখন আঙুরের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষের মত কেঁদেছে। আঙুরের নিজেরই তখন ঘেন্না করছিল। নন্দর সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজরক্তে ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা দাগ ধরে কড় কড করছে; বিকট গন্ধ—দাঁতে পোকা, চুলে উকুন, এক মুখ দাড়ি, হলুদ চোখ। আর বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মতন গরম গা। 'দুটো রাত আমায় থাকতে দাও, আঙুর, গায়ের তাপটা একটু কমুক আমি চলে যাব।' নন্দ বলেছিল আঙুরের পা সত্যি সত্যি জড়িয়ে ধরে।

'না, না, না। যেখানে কাটালে এতদিন—সেখানে যাও।' আঙুর রোদজলে পোড় খাওয়া কাঠের মত শক্ত। 'তোমার পয়সার সুখ যারা লুটেছে, যাদের পায়রা করে পুষেছ এতদিন, শোয়াশুয়ি রঙ্গ করেছ—তাদের কাছে যাও। কেন, তারা এখন রাখল না, লাথি মেরে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল!'

নন্দ জবাব দিতে পারছিল না। তার জবাব দেবার কিছু ছিল না। শুধু জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণার বিকারে একটা মারাত্মক জখম-হওয়া-কুকুরের-মতন ছটফট করছিল, মাথা খুঁড়ছিল।

আঙুর থাকতে দেবে না। নন্দও উঠবে না। ওঠার মতন ক্ষমতাটুকুও তার নেই যেন।

অগত্যা।

'থাকছ, থাক—; কিন্তু জ্বর ছাড়লেই চলে যেতে হবে।' আঙুর সাফসুফ বলে দিয়েছিল, শাসিয়ে দিয়েছিল। সেই গোড়াতেই।

নন্দ তো জ্বর ছাড়াতে আসেনি, এসেছিল আঙুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করতে। কী ঝামেলা, কী ঝকমারি নন্দকে থাকতে দিয়ে। জ্বর তো যায়ই না, উপরন্তু বাড়ে। মাঝে মাঝেই নন্দ বেহুঁশ। হুঁশ থাকে যতক্ষণ কাটা ছাগলের মত ছটফট করে।

চোখের সামনে সবাই আর কতক্ষণ দেখতে পারে মানুষ। আঙুর বিরক্ত হয়ে, কোন উপায় নেই দেখে, নন্দকে গালাগাল দিতে দিতে ডাক্তার ডেকে আনল। অম্বিকা ডাক্তারকে। এ-পাড়ার ডাক্তার। যার কাছে আঙুরদের লুকানো-চোরানো রোগগুলো জলের মতন পরিষ্কার। ও জ্বালা-টালা, ঘা-টা আপাতত সে চাপাচুপি দিয়ে দিতে পারে।

অম্বিকা ডাক্তার দেখল নন্দকে। আঙুরকে বলল, 'ও আঙুর—খারাপ ঘা-টাগুলো না হয় একটু সারিয়ে সুরিয়ে দিলাম আমি ; কিন্তু ওর লিভার যে পচে গেছে মদ খেয়ে খেয়ে। বড় কাহিল অবস্থা। সহজে মেরামত হবে না। হবে কি না তাও সন্দেহ! ওকে বরং কলকাতার হাসপাতালে দাও, যদি কিছু হয়—এখানে তো সুবিধে দেখছি না।'

আঙুরকে যেন কেউ উনুনের আঁচ থেকে টেনে চুল্লিতে ফেলল। জ্বলে যেতে লাগল আঙুর। কোথায় আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে, তা না নাড়িভুঁড়ি পচিয়ে, ক্ষিচিল রোগে সমস্ত রক্তটাকে দুষিয়ে হারামজাদা তার কাছে আরাম করতে এসেছে।

মর, মর। অরুচি আমার। খেলাম, শুলাম, সুখ করলাম পাটে ; ছাই ঝাড়তে ওরে পচি, এলাম তোমার হাটে। বেইমান মিনসে কোথাকার। হবে না, শরীর তো পচে পচে গলে গলে ঝরবে। প্রায়শ্চিত্তি এমনি করেই হয়। কেন, যখন আঙুরকে ছেড়ে পথে বসিয়ে পালিয়েছিলে মনে ছিল না। আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো আর সাত ভাতার করে বেড়াইনি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কত রস-আদিখ্যেতা, মধুমিছরি কথা—।

আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস টুপটুপে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত। শাখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ, স্বামী-স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়াল ছাদের বন্ধন —এরা সাক্ষী।

বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে, ঘর-দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে। তারপর চার বচ্ছর আর এ পথ মাড়াল না। আজ এসেছে—মরতে বসে যখন আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না দেহটা রাখে।

আঙুর চীৎকার করে করে শুনিয়ে শুনিয়ে এ-সব কথা দশবার করে বলে। দূর দূর করেই আছে। জিবের রাখঢাক নেই। সারাদিন বিরাগ আর বিরক্তি, রাগ ঘেন্না উগরে যাচ্ছে।

অথচ নেহাতই যেন এমন এক কলে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধার নেই তার লোকটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত—তাই ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাপ বিদায়ের গুণাগার দেবার জন্যেই ডাক্তার আর ওষুধ আর এ-পথ্য সে-পথ্য।

অম্বিকা ডাক্তার ক'টা ছুঁচ ফুঁড়ল, দু-চার শিশি ওষুধ। ঘা কোড়ার দগদগানি কমল একটু। আর কিছু না। চটকলের সেই বড় ডাক্তার—তাকেও একদিন দেখিয়ে আনল আঙুর। তার লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়াল। যে কে সেই। এই ডাক্তারও বলল. কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এস।

বিশ মাইল কলকাতা। যেতে আসতে চল্লিশ মাইলের রগড়ানি, রেল-ভাড়া, বাস-ভাড়া। নন্দর ওঠার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু আঙুর একটা পচাগলা মাছের চেঙারির মতন নন্দকে কাঁধে-কোমরে ধরে তাও কলকাতার দু-দুটো হাসপাতালে ধরণা দিল। কিসের কি, কানে কথাই তুলল না কেউ। দেখল না পর্যন্ত। এক নজর চেয়েই বলল, এখানে কেন এসেছ গো, নিমতলায় নিয়ে যাও। আর যদি আঁচলে নোট বেঁধে এনে থাক—টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে যাও।

ফেরার পথে নন্দর সঙ্গে হাসপাতালেরও বাপান্ত করতে করতে ফিরল আঙুর। আর সেই যে এসে পড়ল নন্দ তারপর আর পাশ ফেরবার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকল না। হোমিওপ্যাথি চলছিল শেষটায়। তবু দু'আনা পুরিয়া পাওয়া যায় কালীকেষ্টর ডাক্তারখানায়। গত পরশু থেকে গতা কবিরাজের কথা মতন মধু-চ্যবনপ্রাশ।

তারও শেষ হল। নন্দ মরল।

আঙুর রঙচটা তোবড়ানো ডালা খোলা বাক্সর অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়েছিল। চোখের পাতা পড়াছল না, মনেই হচ্ছিল না ও আছে, ও কিছু ভাবছে, কিছু ওর করার আছে।

হুঁশ হল মেঘের ডাকে। খুব জোরে একটা মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। আঙুর মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানলার বাইরেটায় অনেকটা অন্ধকার জমে এসেছে।

বাক্সটা থেকে পাটের বাহারী শাড়িটা বের করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল বাইরে। খানিকটা কালো মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু বিকেলও হয়ে গেছে। বৃষ্টি অবশ্য আর পড়ছে না।

আঙুর শুনতে পাচ্ছিল তার ঘরের বাইরে চাঁপা, আতা, লাবণ্য, চামেলি, গোলাপ—দুপুরের গা-গড়ানো ঘুম শেষ করে, কেউ জল ভরতে, কেউ হাই

তুলতে, উড়ের দোকান থেকে চার পয়সার চা আনতে—উঠোন দিয়ে আসছে যাচ্ছে, কথা বলছে। আতার কিরকিরে গলা আর গোলাপের ভাঙা গলার বিশ্রী হাসিটা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল আঙুর।

আতা ছুঁড়িটার কপাল ভাল। পাটকলের একটা ছোঁড়া খুব যাচ্ছে আসছে। আগেরটা ভাগতে না ভাগতেই নতুনটা জুটে গেছে। আঙুর ভাবছিল: আতা কি এই পাটের বাহারী শাড়িটা নেবে? ওর তো এই সব রঙ, বাহার ভালই লাগে। যদি নেয় আতা, হোক না একটু ফাঁস খাওয়া—তবু এখনও ছ'টা মাস নিশ্চিন্তে পরতে পারবে। আহা, এই শাড়ি গায়ে তো আর বিছানায় ধামসাচ্ছে না!

যদি নেয়, আঙুর চার টাকাতেই দিয়ে দেবে। আর যদি না নিতে চায়? আঙুরের মনের মধ্যে আতা, পাটের শাড়ি, নন্দ সব এলোমেলো হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুর যেন সব ভেবে নিল, পর পর। কি করবে, কার কাছ থেকে কার কাছে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার। বিকেল তো হয়েই গেল। আর কতক্ষণ ধরে মড়া ফেলে রাখবে!

যাবার সময় নন্দর মুখের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত গাল আওড়াল আঙুর। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

আতা তার ঘরের কাছটিতে পিঁড়ি পেতে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। নিশ্চয় ওর বাবু কাল যাবার সময় ফেলে গেছে। কিংবা আতা সরিয়ে রেখে দিয়েছে [illegible]েই। সেই সিগারেটের ভাগ পাবার আশায় মানদা আতার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে, চিনু পায়ের কাছটিতে উবু হয়ে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে।

পাটের শাড়িটা আঁচলের তলায় আড়াল করে নিয়েছিল আঙুর আগেই। আতার আশেপাশে অত ভিড় দেখে এখন আর যেতে ইচ্ছে হল না। মানদা যতক্ষণ কাছে থাকবে, শত খুঁত বের করবে, আতার ইচ্ছে থাকলেও মানদা কিনতে দেবে না। দর-দাম তো পরের কথা।

তার চেয়ে আগে হিমুর কাছেই যাওয়া যাক। বলতে গেলে হিমুই একমাত্র লোক যার সঙ্গে আঙুরের ভাবসাব আছে ভাল মতন। সুখ দুঃখের কথা তার সঙ্গেই যা হয়। এত বড় বিপদের কথাটা তাকেই আগে জানানো দরকার।

আঙুর উঠোন পেরিয়ে তর তর করে সদর দিয়ে বাইরে চলে গেল। হিমুদের চালাটা পাশে।

চুল বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল হিমু। আঙুর এসে কাছে দাঁড়াল।

বিপদের কথাটা বললে আঙুর। হিমুর হাত থেমে গিয়েছিল। 'কখন ম'ল ?'

'দুপুরে।'

'ঘণ্টা তিন চার হল তবে। আজ আবার শনিবার। দোষ না পায়!'

'পাবে পাক, আমি কি করব। আমার কাছে তো চিতেয় ওঠার জমা রেখে যায়নি।'

'কি করবি ?' হিমু চুলের খোঁপাটা আবার গুছোতে শুরু করল।

'ক'টা টাকা যোগাড় করতে পারলে হারামজাদাকে চিতেয় উঠিয়ে আসব।' আঙুর দাতে দাঁত পিষে বলল।

'বিশুদের কাছে যা। ওদের বল। তবে মাগনায় মরা কাঁধে করে পোড়াতে যাবে না ওরা।'

'তা জানি।'

'দেখ তবু হাতে-পায়ে ধরে—যদি যায়।'

আঙুর তাকিয়ে তাকিয়ে হিমুর মুখ দেখল। হিমুকে দেখে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তার কোন গা নেই।

'তুই আমায় ক'টা টাকা দিবি হিমু ?'

'টা—কা।' একটুক্ষণ আঙুরের দিকে চেয়ে থেকে হিমু হতাশ, বিষাদ-বিষাদ মুখ করল, 'তোকে বলছিলাম না সে-দিন! স্যাকরার জন্তে বারোটা টাকা রেখেছি অনেক কষ্টে, আর চারটে হলে—জিনিসটা হয়। তা পোড়া কপাল এমন চারটে টাকাও জুটোতে পারছি না।'

আঙুর হিমুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

কি ভেবে হিমু বললে আবার, 'সিকি, আধুলি, বড় জোর টাকাটা হয়, পারি আঙুর। তার বেশি আমাদের ক্ষমতা কি। তা তুই দুটো টাকা নে বরং আমার কাছ থেকে। পরে শুধে দিস। বলেই হিমু একটু অন্য রকম হাসল, তুই আর শুধবি কি—।'

হাত পেতে আঙুর দুটো টাকাই নিল। অন্য সময় হলে নিত না, কিছুতেই না।

ছিমুর কাছ থেকে বেদানামাসির ঘরে।

মাসি শুনে খেঁকিয়ে উঠল, 'তখন বলেছিলাম ও আপদ ঝেড়ে ফেল গা থেকে। শুনলি না। দরদে একেবারে উথলে উঠলি। যা এবার নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যা। ছেনাল মাগী কোথাকার।'

আঙুর কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল শুধু দরদেও উথলে উঠিনি, বিছানা পেতেও শুতে দিইনি। নন্দর আমি বিয়ে করা মাগ নয় যে, না খেয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেছি ওই পচা মর-মর লোকটার। নেহাত ছিল, একই ঘর; ও চৌকিতে, আমি মেঝেতে; তাই জল চাইলে দিয়েছি, ওষুধটা ঢেলেছি মুখে। পথ্যটা দিয়েছি দায়ে পড়ে।

বেদানামাসি বললে, 'আমি কি করব?'

মড়াটা ঘরে থাকবে? আঙুরের গলা যেন আর উঠছিল না।

'তা থাকবে বৈকি—আমার এখানে মড়া ধরা না থাকলে, না পচলে তোদের চলবে কেন! যা—যা—মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা—হাতে আধুলিটা টাকাটা গুজে দিস—না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছানায়—ওরাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।'

আঙুরের বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল। মেথর মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কিভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নন্দর উপাধিটা। ও চক্রবর্তী। বামুন।

কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর। বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভূত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে থাকল।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যে হয় হয়।

আঙুর তাড়াতাড়ি এল আতার ঘরে। আতা তখন সাজছে। ছেঁড়া সায়ার ওপর আর একটা নতুন লাল সায়া চড়িয়েছে। তা কোমর-টোমর ফুলেছে খুব। বডিজ এটে শাড়িটা সবে পরছে। ঘরে কেউ নেই।

কথাটা সরাসরি পাড়ল আঙুর। পাটের শাড়িটা একেবারে বের করে।

আতা দেখল হাতে নিয়ে, খুলে ফেলে, কোমরে পাক দিয়ে, গায়ে ফেলে।

'শাড়িটা তোমার বড্ড সেকেলে, আঙুরদি! পাড় ভাল না।'

আঙুর কি বলবে! তিন বছর আগের শাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে! আঙুর শুধু বিড়বিড় করল, 'তোকে মানাবে। বেশ মানাবে।'

আতা হাসল। 'চারুবাবু সে-দিন আমায় একটা ছাপাই এনে দিয়েছে। এ-নিয়ে আর কি করব! বড্ড পুরনো ছেঁড়া ফাটা।'

'নে না—!' আঙুর নিজের অজান্তেই কখন যেন মিনতি করে বলল, 'আমি বলছি আতা, নিয়ে নে। তোকে সুন্দর দেখাচ্ছে শাড়িটা গায়ে ফেলে। আর যদি শুনিস বাপু তবে বলছি—এ শাড়ি পরে তো আর ধামসাচ্ছিস না। রেখে রেখে পরিস—বছর খানেক চলে যাবে।'

আতা ভাবল। 'আমার কাছে তিনটে টাকা আছে—আড়াইটে টাকা দিতে পারি। না হলে তুমি নিয়ে যাও, আমার তেমন দরকার নেই।'

আড়াইটে টাকাই নিল আঙুর। ঘরের বাইরে এল। লণ্ঠন আর কুপি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সব তৈরী। সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলেছে চামেলি, লাবণ্যরা। আকাশ লালচে লালচে, বৃষ্টি হয়ত আরও জোরে আসবে। টিপটিপ পড়তে শুরু করেছে আবার। সেই বৃষ্টিতেই চামেলিদের কেউ মাথার ওপর আঁচল তুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি ছাতায় দু-তিনটে মাথাও জড়ো।

সরু গলিটা দিয়ে রাস্তায় চলে এল আঙুর। গলির আবছা আলো-অন্ধকারে তখন গোলাপদের জটলা, বিড়ি ফোঁকা, গা-ঢলাঢলি, হাসি। ঘুর ঘুর শুরু হয়েছে সবে খদ্দেরদের।

রাস্তায় এসে মনে মনে টাকার পুরো হিসেবটা সেরে ফেলল আঙুর। এক টাকা সাড়ে এগারো আনা, হিমুর দুই আর আতার আড়াই—তা ছ'টা টাকা হয়ে গেছে। বিশুরা যদি এখন এই ছ'টাকায় রাজী হয়। মনে হয় না হবে—। কততে যে হবে—তাই বা কে জানে! হন হন করে এগিয়ে গেল আঙুর।

এখান ওখান খোঁজ নিয়ে বিশুকে পাওয়া গেল সাইকেল সারাবার দোকানটায়। টিনের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দোকানের দরজার পাল্লায় পা তুলে কাঁচের গেলাসে চা খাচ্ছিল। কার্বাইডের আলো তার পাজামা আর মুখে পড়েছে।

আঙুর কাছে গিয়ে ডাকল। ইশারা করল কাছে আসবার।

চা শেষ করে, বিড়ি ধরিয়ে ফুকতে ফুকতে বিশু এল; মিটমিট চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে। 'কি রে পট্‌লি, কি খবর?' বিশুর কাছে আঙুররা সবাই পট্‌লি। কিন্তু আঙুর কিছু বলবার আগেই বিশু সামনের দিকে

চেয়ে বলল, ‘দাঁড়া, আগে মাইরি একটা পান খেয়ে লি। শালা চা নয় তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিবটাই বেসাদ হয়ে গেল।’ বিশু কথাটা শেষ করেই হাত বাড়াল। অর্থাৎ পান সিগারেটের পয়সাটা আগে ফেল। পরে বাতচিত।

আঙুর এ-সব দস্তুর জানে। গরজ তার। আঁচলের খুঁট থেকে আধুলিটা দিল—আতার দেওয়া আধুলিটা। বললে, এক খিলি পান, একটা সিগারেট—তার বেশি নয়, কালীর দিব্যি থাকল।’

বিশু হাসল। ‘খুব টাইট যাচ্ছে না কিরে পটলি। দিনকাল শালা যা যাচ্ছে—যেন সত্যযুগ। আয়—হায়, শালা আঙুরের রস চাটবে তাও মাছি আসে না।’ বিশু হাসতে হাসতে চলে গেল।

এল খানিক পরে, জোড়া খিলি পানে গাল ভরতি করে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। পয়সা কিন্তু ফেরত দিল না। ‘বল পটলি কি বলছিলি ?’

আঙুর বলল সব। গলায় উদ্বেগ আর মিনতি।

বিশু রাস্তায় ছিটে ফোঁটা আলোতে আঙুরের মুখটা ভাল করে দেখছে। একটু ভাবল, ‘ক’টাকা আছে তোর কাছে ?’

‘ছ’টাকা।’

‘ছ’টাকা। ছ’টাকায় কি হবে রে, একটা ঠ্যাং-ও তো পুড়বে না নন্দর।’ হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

‘কত লাগবে তবে ?’ আঙুর বিহ্বল হয়ে দাড়িয়ে বিশুর অট্টহাসি শুনতে শুনতে শুধলো।

‘দেড় টাকা মণ আম কাঠ। তা মণ সাতেক লাগবে। দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে; তারপর হাঁড়ি কড়ি ধুনো—ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্‌ত্র পরাতে চাস তো—’

‘না !’ আঙুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ওর বুক শুকিয়ে আসছিল। নতুন বস্ত্রে আর দরকার নেই।

‘এই তো আর কি ; আর আমরা চারজন যাব চারটে পাঁইট দিবি। তা দু’নম্বরই দিস—দু’টাকা ছ’আনা করে ধরে নে—গোটা দশেক টাকা আর কি !’

আঙুরের পায়ের সাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও। বিশুর মুখটা পর্যন্ত শুয়োরের মতন ছুঁচলো ঘিনঘিনে দেখাচ্ছিল।

খানিকটা সময় লাগল আঙুরের সইয়ে নিতে। বললে, 'অত টাকা আমি কোথায় পাব? আমার বাপ না ভাতার যে তাকে পোড়াতে বিশ টাকা খরচা চাইছিস?'

'বাপ না, ভাতার না—তো সেরেফ চেপে যা। থানায় গিয়ে খবর দিয়ে দে—ধাঙড় পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার সেই ধাঙড়! বুকটা ধক্ করে উঠল। আঙুর নিরুপায় হয়ে বলল, 'আমার খেমতা থাকলে বিশই দিতাম। চামরগিরি করিস না বিশু!'

'তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস, পটলি! এই বৃষ্টি বাদলার দিন—এখন শালা শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো—তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে। মুফতি কেউ যেতে চাইবে না। অন্তত গায়ের পায়ের ব্যথাটা মারবার খরচা দিবি তো। আচ্ছা যা, দুটো পাঁইটই দিস—তোর বাপ ভাতার যখন নয়—এক রকম মাগনাতেই চিতেয় উঠিয়ে দেব। আর কিছু বলিস না মাইরি, তোর পায়ে পড়ি।'

আঙুর হাঁ হু কিছু বললে না। মাথা নাড়ল না। সায় দিল না। রাস্তার আলো শোষা অন্ধকার, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর বিক্ষিপ্ত লোকজন, দোকানপাটের দিকে নির্জীবের মতন চেয়ে থাকল।

বিশু বললে, 'যা শালা, কাঠ না হয় পাঁচ মণের মধ্যেই সেরে দেব। বাপ, ভাতার কিছুই নয় যখন তোর—আধপোড়া হলেও ক্ষতি নেই। টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলে হবে। আরও গোটা ছ'সাত টাকা যোগাড় করে ঝপ করে আয় দেখি, পটলি। আমি হাবুর দোকানে আছি।'

বিশু চলে গেল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। আরও সাতটা টাকা সে কোথায় পাবে, কার কাছে হাত পাতবে।

ফিরতে লাগল আঙুর। যেন ভীষণ জ্বরে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অচেতন। কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

যাক, মেথর মুদ্দোফরাসেই টেনে নিয়ে যাক নন্দকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিক গে। কি করবে আঙুর, কি আর সে করতে পারে! নন্দর ওপর তার এত বেশি রাগ হচ্ছিল যে, লোকটাকে যদি বাঁচা অবস্থায় পেত, আঁচড়ে কামড়ে মেরে-ধরে কুরুক্ষেত্র করত আজ। মরেও আমার হাড়-মাস জ্বালাচ্ছে গো! আর এ কী অসহ্য জ্বলন! আঙুরের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

বড় রাস্তা ধরে আবার তাদের পটির কাছে এসে পড়ল প্রায় আঙুর। আসবার সময় চোখ রেখে আসছিল, যদি তেমন কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার কাছে একটা দুটো টাকা হাত পেতে চাওয়া চলে।

লোক তো অনেক যাচ্ছে আসছে। কিন্তু ওরা কেউ আঙুরের আঁচলে টাকা ছুঁড়ে দেবে না মুফতিতে। না, নন্দর ভাগ্যে আর চিতেয় ওঠা হল না। হবে কোথা থেকে? অমন ঠগ, জোচ্চোর, শয়তান মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে। একে বলে প্রায়শ্চিত্য। বামুনের ছেলে—এবার মেথর ধাঙড়ের হাতে যা, যেমন করে কুকুর বেড়াল যায়, তাও আবার কোন ভাগাড়ে যাবি কে জানে!

আঙুরের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, শিরদাঁড়টা যেন মাঝখানে মচকে যাবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা—অদ্ভুত।

হল না। আর হল না। একটা মানুষ মরল, আর দাহ হল না। কেউ সে-দায় নিল না। কেন নেবে? নন্দ তাদের বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই—কেউ না।

হঠাৎ মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা। হনহনিয়ে ছাতা মাথায় চলেছে। আঙুরের কি যে হল, প্রায় ছুটে গিয়ে মানিকবাবুর পথ আগলে ফেলল।

মানিকবাবু চিনতেই পারলে না। কে? কি চাও? আঙুরকে দু' হাত তফাতে রেখে মানিক মুন্সী যেন এ-পটির মেয়ের ছোঁয়া বাঁচাচ্ছিল।

আঙুরের অত আর দেখবার সময় নেই। গড়গড় করে বলে গেল আঙুর: 'আপনি বাবু, একদিন এসে আমাদের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাড়ি-বাবুর জন্যে। বলেছিলেন, আপদ-বিপদ সুখ-সুবিধে দেখবেন। আজ আমার বড় বিপদ। ঘরে মড়া পড়ে পচছে, পুড়োতে পারছি না। একটা ব্যবস্থা করে দিন বাবু। অন্তত দাড়িবাবুর ঠেঙে চেয়ে সাতটা টাকা দিন।'

মানিক মুন্সী খিঁচিয়ে উঠল, 'আহা—কী আমার আব্দার রে মাগীর! টাকা দিন। কেন, দাড়িবাবু তোমায় টাকা দেবেন কেন? তোমার ঘরে লোক মরবে আর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারবাবু তাকে খরচা করে পোড়াবে! যাও, যাও—ওসব আব্দার রাখ। দাড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কিছু বলতে হয়, কাল বেলা দশটার পর অফিসে যেও।

মানিক মুন্সী চলে গেল। আঙুর থ। কাল বেলা দশটা! মানুষ মরল আজ দুপুরে, তার দাহের জন্যে পা ধরতে যেতে হবে কাল বেলা দশটায়! আর সারা রাত ভরে তার ঘরে মড়াটা পচুক!

আঙুর বুঝতে পারছিল, দায়টা আর কারুর নয়—তারই। দায়ের সময় মানিক মুন্সী। তাদের বেশ্যাপট্টির ঘরে ঘরে ঘুরেছে, পান মিষ্টি খেতে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল আঙুরের।

কিন্তু কাঁদল না আঙুর। চোখ পড়ল সামনের দোকানটায়। পানের দোকানের মত এক ফালি দোকান। রাস্তার সঙ্গে মেশান নীচের দোকানটায় বসে মুড়ি ছাতু-টাতু বিক্রি করে একজন। ওপরটায় অন্যজনের দোকান। আয়না দিয়ে সাজানো। হরেক রকম শিশির থাক। আতর, জর্দা, স্বর্তি আর সুর্মার সঙ্গে মোদকও বিক্রি হয় ও-দোকানে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে দেখতে আঙুরের দুটো চোখ হঠাৎ কিসের আঁচে যেন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, লোকটাকে ভাল করেই চেনে আঙুর। ওর নাম প্রভুলাল। আর এও জানে আঙুর, ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়। দাঁত, মুখ, চোখ, গা—সব যেন কসকস করে, কাঁপে ভেতর ভেতর, টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চকচক করে, ভীষণ চকচক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলা-গলা সবুজ—সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিব দিয়ে লালা পড়ে।

আঙুরের দিকে প্রভুলালের নজরটা বরাবরই এইরকম। কেন, কে জানে। আঙুর বুঝতে পারে না। এক একটা লোকের এক একজনের ওপর এ-রকম হয়। দাঁত উঁচু, টোপা-কপাল ঝুমুরের ওপর তা না হলে অমন সুন্দর মানুষটার চোখ পড়ে মন্টুবাবুর। মন্টুবাবু তো ঝুমুরকে এখান থেকে উঠিয়েই নিয়ে গেল।

আঙুর জানে, তার রূপ ঝরে গেছে। অমন ব্যাধি থাকলে না ঝরে উপায় নেই। আর ব্যাধির কি ঠাঁই বিচার আছে। এমন জায়গায় গুছিয়ে বসল যে, আঙুরের আসলটাই গেল। অম্বিকা ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, খুব

সামলে সুমলে থাকবে। বেশি অত্যাচার করো না। ছেড়ে দিতে পারলেই ভাল। নয়ত একদিন এতেই মরবে।

সেই থেকে আঙুরের অবস্থা পড়ে গেল। নয়ত আতা, চিনু, চামেলির বড় সুখ ওকে সইতে হত না। ঈশ্বর যাকে মারেন—তার আর উপায় কি! তাও একটা বছর আঙুর কত সাবধানে থেকেছে। নেহাত যখন পেট ভরাবার চাল ডালটুকুই বাড়ন্ত হত—তখনই আঙুরকে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে হত সেজেগুজে।

রোগটা ভেতরের---তাই ওপরটায় আজও আঙুরের কিছু কিছু আছে। মুখখানাই শুধু যে ভাল তা নয়; বুক কোমর চলন টলনগুলোও এখন পর্যন্ত ভাল আছে। বিশেষ করে সামনাসামনি দেখলে—আঙুরের এই আশ্চর্য ভরাট গলা-ঘাড়-বুকের দিকে না চেয়ে পারা যায় না।

প্রভুলালের দোকানের দিকে পা পা করে এগিয়ে যেতে লাগল আঙুর। লোকটাকে কী ঘেন্নাই করত ও; প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদড়ের মত শরীর—আর ওই কুচ্ছিত মুখ, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় করত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে। নয়ত প্রভুলাল কতবারই তো ঘুর ঘুর করেছে—আঙুর এগুতে দেয়নি। মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।

আজ আর অত কথা ভাল করে ভাবতে পারল না আঙুর। বরং ভাবছিল, প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে। না বলে।

ধুক ধুক বুকে প্রভুলালের দোকানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল আঙুর।

'সুর্মা আছে?' মুচকি হাসল আঙুর। একটু হেলে দাঁড়াল।

প্রভুলাল প্রথমটায় অবাক। তারপরে যেন শরীরের কোথাও একটা পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে সারাটা গা-মুখ বেঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে ফুলিয়ে হাসল। গলার মধ্যে সর্দি-জড়ানো আওয়াজের মতন ভাঙা ভাঙা আবেগ-স্বর উঠছিল।

সুর্মার দিকে হাত বাড়াল না প্রভুলাল। আঙুরের দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'কি খবর? আঁ—তুমি কাঁহা ভাগ গিয়েছিলে! শালা সারা পটি আন্‌ধার হয়ে গেল।'

হাসি আসছিল না। তবু আঙুর হাসল। যেন একটা ঝাপ্টা খেয়ে প্রভুলালের কোলের ওপর পড়তে পড়তে উঠে সোজা হল। এলোমেলো আঁচলটা তো হাতে লুটোচ্ছিল, বুকের কাপড়টাও কখন সরিয়ে একপাশে গুটিয়ে দিয়েছে আঙুর। 'মস্‌করা থাক। সুর্মা আছে কিনা বলো। না থাকে তো যাই।' আঙুর মাঝ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার টেনে নিল। ঠিক যেমন লাট্টু ঘুরোতে লেত্তিকে ছেড়ে দিয়ে টানতে হয়। গলা বেঁকিয়ে চোখের পাশ দিয়ে বিভ্রম ছুঁড়ল।

'আছে, আলবৎ আছে।' প্রভুলালের চোখ চকচক করছে, 'তোমাদের আঁখে সুর্মা লাগাতেই তো বসে আছি।'

'থাক, তোমায় আর লাগিয়ে দিতে হবে না। হাতে পিঁপড়ে ধরে যাবে।' আঙুর আর এক দফা হেসে—প্রভুলালের বসবার জায়গাটার কাছে বেঁকে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। গালে হাত রাখল। ঘাড় হেলিয়ে মুখ-চোখ তুলে ধরল।

ঠেলে বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়ছিল। আঙুর চোখ বুজল।

'কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙ্গুরী! শালা কী চোট্ যে আছে তুমার বাস্তে।' প্রভুলাল কখন তার গরম হাতটা দিয়ে আঙুরের কনুইয়ের ওপরটা ধরে ফেলেছে।

আঙুর সেই অবস্থায় জোরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টেনে টেনে একবার নিশ্বাস নিল, আস্তে আস্তে ছাড়ল। বুক উঠল, নামল। ঠোঁট কামড়ে, বাঁ চোখ টিপে হাসল আঙুর।

'তোমার পচা আতরের গন্ধ কদিন থাকবে গো!' আঙুর ঠোঁট উল্‌টাল।

'পচা নেই, আসলি আতর দেব। যে কদিন রাখতে চাও।' প্রভুলাল আঙুরের গালে টোনা মারল।

আঙুর ভাবল। 'দশটা টাকা আজ দাও তবে?'

'দশ্—?' প্রভুলাল থতমত খেয়ে গেল, 'দ-শ কি রে?'

'দরকার আছে, দশ দাও। আগাম দাও—।'

'আগ্‌লি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল আঙুর, 'দশ না পারো—সাত—আটটা টাকা দাও।'

মনে মনে হিসেব করে নিল প্রভুলাল। তারপর নিচু গলায় বললে,

'বহুত আচ্ছা, আট টাকা দোবো। মাগর—' প্রভুলাল কুচকুচে কালো মুখে, গোঁফের ডগায় হিসেবী একটা হাসি তুলল। আঙুল দিয়ে দেখাল দিনের হিসেবটা। প্রায় সপ্তাহভোর আর কি!

ও-সবের দিকে চোখ ছিল না আঙুরের। হাত পাতল আঙুর। টাকা।

প্রভুলাল আঙুরের গালটা টিপে দিল। 'তু যা পাগলি, ঘর যা—সুরতটুরত থোড়া ঠিক করে লিগে যা; একদম্ কল্‌কত্তাবালী হয়ে যা দোকান বন্‌ধ্ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।'

আঙুর ভীষণভাবে চমকে উঠল। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পা পাথর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল আঙুর প্রভুলালের দিকে।

'কি রে?' প্রভুলাল আতরের শিশিটিশি, জর্দার নিক্তি ওজন গোছাতে লাগল।

আঙুর তার সাদা নিভন্ত চোখ তুলে আস্তে গলায় বলল, 'আমার ঘর না, তুমি অন্য কোথাও বল।'

এ-রকম কথা প্রভুলাল জীবনে আর শোনেনি যেন। 'বাঃ—! টাকা তুমি লেবে আঙ্‌গুরী— আর ঘর ঢুঁডব আমি। তব তো দুসরা আওরাত ভি—।'

আঙুরের চোখের ওপর প্রভুলালের মুখও আর ভাসছিল না। আলো, আয়না, হরেকরকম শিশি—আর ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা সব কী যেন। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে হলুদ বিকারের চোখে মানুষ যেমন কী দেখছে জানে না বোঝে না চেতনায় চিনতে পারে না তেমনি।

একটু পরে আঙুর মাথা নাড়ল। বেশ, তবে তাই, আমার ঘরেই এসো তুমি। তাড়াতাড়ি।

প্রভুলালের দোকানের সামনে থেকে একটা অন্য রকম শরীর আর পা যেন জলো হাওয়া আর অন্ধকার আর পচ্‌পচে রাস্তা গলি দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে মিশিয়ে গেল।

আঙুরের বুকের মধ্যে শব্দগুলো এলোমেলো। সমস্ত মাথাটা ঠাস; কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, চোখে ঠাওর করতে পারছে না। হাত-পা সাড় পাচ্ছে না। একটা দম দেওয়া পুতুলের মতন যা হবার হয়ে যাচ্ছে, আপনা থেকেই।

কুপি জ্বেলেছে আঙুর। ধুনো পুড়িয়ে দিয়েছে ঘরে। কটা ধূপও।

বাক্স থেকে শাড়ি বের করতে গিয়ে পাটের শাড়িটা খুঁজেছে প্রথমে—তারপরেই মনে হয়েছে আতাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা খানিক আগেই। তাঁতের ঘোর লাল রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিয়েছে, সেই সাটিনের পুরনো বডিজটা পর্যন্ত। চুল বেঁধেছে। আলতা দিয়েছে পায়। টিপ আর কাজল।

প্রভুলাল এল। ঘরটা বড় অন্ধকার। 'লণ্ঠন কি হল? টুটু গিয়া—?' আতরের গন্ধ প্রভুলালের জামায়। হাতে পানের ঠোঙা। মুখে একগাল পান, জর্দা।

প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিসহিস শব্দ। লাল দাঁতগুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।

আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে—সাড় হারিয়ে। কি হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে—রাত কত হল! বিশু কি থাকবে হাঁতুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে আবার! তবে কি হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে! দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।

নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না আঙুর। কুপির আড়াল পড়েছে। একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে। বাড়ুক। কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট—এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।

আবার কি বৃষ্টি এল? না, বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি যেন আর না আসে, হে মা কালী! কোনগতিকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে দাও। চরণে পড়ি তোমার।

প্রভুলাল খুশী। আঙুর হাত পাতলো। চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ—তেমনি, ঠিক তেমনি আরও দুখিলি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রূপোর দাঁত-খোঁটা কাঠিটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে হেসে। আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল।

টাকা আটটা আঁচলে বেঁধে নিল আঙুর। আগের টাকাগুলোও। তারপর বাইরে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। আঁট করে।

আতা চামেলিদের ঘরে তখন আলো, হাসি, হুড়োহুড়ি, ঝুম্ ঝুম্, তালি, বেসুরো গান আর দিশী মদের গন্ধ।

আঙুর তর তর করে দাবায় নেমে গেল। তারপর বাইরে। সদর রাস্তায়। হাঁদুর দোকানে বিশু কি আছে এখনও।

বিশুদের নিয়ে ফিরল আঙুর। দরজা খুলে ঢুকল।

পিছু পিছু বিশু।

'কই মড়া কই। আ, খুব বাহারে ধূপ জ্বালিয়েছিস তো, পটলি।' বিশু নাক টেনে গন্ধ নিল ধূপের।

আঙুর লণ্ঠন জ্বালাল।

বিশু তাকাল এদিক, ওদিক। 'মড়া কই ?'

আঙুর আঙুল দিয়ে চৌকির তলাটা দেখিয়ে দিল।

বিশু মুখ নীচু করে দেখল। অবাক ও, চোখের পাতা পড়ল না। 'ওর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কি করে ?'

আঙুর সে-কথার কোন জবাব দিল না।

বিশু একটু অপেক্ষা করে সঙ্গীদের ডাকল। ডাকবার আগেই পেঁচো, বীরে, ঢুকে পড়েছে।

বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ।'

মড়া নিয়ে বিশুদের বেরুতে খুব একটা সময় লাগল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর দাওয়ায় নামল।

আঙুর বলল, 'হরিবোল দিবি না ?'

বিশু জবাব দিল, 'চল্, রাস্তায় গিয়ে দেব। এখানে রসের হাটে হরিবোল দিলে শালাদের মেজাজ গণ্ডগোল হয়ে যাবে।'

বিশু, কেলো সামনে—পেঁচো আর বীরে পেছনে। মাদুরে জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁধা নন্দর ধড—বাঁশের ওপর চাপিয়ে চারটে লোক দাওয়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে ছায়া। আর আঙুর পিছন পিছন।

আতার ঘরে তখন বস্ত্রহরণ পালার হাসি-উল্লাসের ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানে এসে পৌঁছতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল। কেলো গেল কাঠ

আনতে, পেঁচো পাঁইট আনতে। কাছাকাছি সে-ব্যবস্থা আছে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য কেনা হাঁড়িটার পেছনে বোল তুলে।

আঙুর চুপ করে বসে থাকল এক পাশে।

বিশুর দলের বাহাদুরী বলতে হবে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলল। গঙ্গার জলে ধোয়ান হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ান হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।

পাঁকাটিতে আগুন ধরিয়ে বিশু আঙুরের দিকে এগিয়ে দিল। বললে, 'নে পটলি, মুখে আগুনটা দিয়ে দে।'

আঙুর চমকে উঠল। নন্দর মুখে আগুন দেবে ও? কেন? নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? কিচ্ছু না। কেউ না নন্দ ওর।

আঙুর মাথা নাড়ল। 'আমি কেন দেব। না—না, তোমরা কেউ দিয়ে দাও।'

'দিবি না তুই? লে কেলো, তুই-ই তবে দিয়ে দে শালার মুখে আগুন।'

কিন্তু কেলো ততক্ষণে একটু পাশে গিয়ে পাঁইটে মুখ দিয়েছে। পেঁচো বলল আঙুরকে, 'আহা দাও না তুমি। তোমার সঙ্গে তবু তো জানাশোনা ভাবসাব ছিল খানিকটা, আমরা তো সব রাস্তার লোক।'

জানাশোনা, খানিকটা ভাবসাব? তা হ্যাঁ, তা ছিল বৈ কি। আঙুর সেটা অস্বীকার করতে পারে না। এতো লোকের মধ্যে একমাত্র আঙুরই তবু নন্দকে চিনত, জানত। ওর সঙ্গে এক ঘরে থেকেছে, খেয়েছে, শুয়েছে। শখের স্বামী-স্ত্রী খেলা—তাও খেলেছে। শাঁখা-সিঁদুরও পরেছে।

পাঁকাটিটা জ্বলছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যে দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে পাঁকাটিগুলো। সেই আলোয় নন্দর শুকনো, তোবড়ানো, বাসি ডিমের মত সেদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন সব যন্ত্রণার শেষ ঘা খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সামলে রে পটলি শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।' বিশু হাঁকল।

আঁচলটা সামলাতে গেল আঙুর। এক্ষুনি পাঁকাটির আগুন লেগে যেত।

কিন্তু শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে—পাঁকাটির আগুনে যেন হঠাৎ কী

দেখল আঙুর। দেখে নিথর হয়ে গেল। মনের মধ্যে কী যে অস্বস্তি জাগল! গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

নিজেকে বড় অশুচি অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সঙ্গে সে শুয়েছে। এখনো সেই ভাগাড়ে, কুকুরটার—?—না, এই বস্ত্রে কারুর মুখে আগুন দেওয়া যায় না। নন্দ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে—কে জানে, তবে এই সংসার তো ছেড়ে চললই। এ-সময় আর খুঁত থাকে কেন।

পাঁকাটি কটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঙুর হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস আবার?' বিশু অবাক।

'আসছি। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।' আঙুর তরতরিয়ে ডাইনে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধাপ ভেঙে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়াল আঙুর। আকাশটা লাল। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু হু। গঙ্গার জল কালো। একটা শব্দ উঠছে স্রোতের। ঘাটে আছড়ে পডার।

জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ এই জল এই নিস্তব্ধতা যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল। কেমন একটা পচা গন্ধ এসে নাকে লাগল আচমকা। নিশ্চয় কোন গলা-পচা গরু ছাগল কি মোষটোষ হবে, জলে ভেসে এসেছে। আধপোড়ান মানুষ-টানুষও হতে পারে।

বড বিশ্রী গন্ধ। এদিক ওদিক চাইল আঙুর। নাক বন্ধ করল। একটু পরে আবার খুলল। আর ধক্ করে যে-বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগল সেই গন্ধটা বড চেনা চেনা ঠেকল। হ্যাঁ, বিশুর গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আভা, বেদানামাসি, প্রভুলালের গায়। সর্বত্র।

আঙুরের চোখের সামনে সত্যিকারের গঙ্গা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে—?

মাথার মধ্যে একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল। জ্বলে উঠল সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো। অশুচি, কিসের অশুচি? গঙ্গাজল তার কোন্‌টা ধোবে—বস্ত্র না দেহ না মন। বেদানা মাসি হিমুর গা অনেক ধুয়েছে গঙ্গা। কি দিয়েছে?

গঙ্গার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জলন্ত পাঁকাটি কটা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।

আগুন ধরল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। এখানে আগুন, ওখানে আগুন। আ, সাজিয়েছে বটে বিশুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে বেছে এনেছিল। চোখের পলকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আঙুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশুরা একটা পাঁইট শেষ করে আর একটা খুলল।

আকাশটা লাল। খুব লাল। বৃষ্টি না এসে পড়ে।

নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বীরে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।

আঙুর অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দাহ দেখছে।

আগুনের হল্‌কাটা হঠাৎ ধক্ করে বেড়ে উঠল। সমস্ত চিতাখানা টকটকে লাল। সে-দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। যেন মাতাল হয়ে গেছে।

বীরে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে—মট্ মট্। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!

আর আঙুরের কানে সেই শব্দগুলো লাগছে ভয়ানক ভাবে। ছটফট করছে আঙুর। যেন তার বুকের হাড়গুলো মট্‌মট্ করে ভেঙে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে এক খাবলা কিছু নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই আগুনে।

আঙুর আর পারছিল না। অস্থির হয়ে উঠছিল। কী যে অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। মোচড় দিয়ে উঠছে সারাটা বুক। কণ্ঠার কাছে টনটনে ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে।

আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদনামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল—সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নক্‌শা।

আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ আর ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।

আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জলছে। বড় দুঃসহ সে আগুন। বড় স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।

আঙুর ডুকরে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে। এই প্রথম। হঠাৎ, হঠাৎই। বর্শায় খোঁচা খাওয়া একটা পশুর মত সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে, থর থরিয়ে। তারপর গুমরে গুমরে। কাত্রে কাত্রে।

আঙুরের ইচ্ছে হচ্ছিল, ওই চিতার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দর আধপোড়া ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরে। মাথা খোঁড়ে।

আঙুর সত্যিই ছুটে যাচ্ছিল। বিশু খপ্ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'কি রে পট্‌লি মরবি ন কি ?'

না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না!

॥ আঙুরলতা ॥

সুর্মা | রমাপদ চৌধুরী

ওরা সমাজ-ছাড়া, সমাজের বাইরে ওরা। কিন্তু ওদেরও একটা সমাজ আছে। ওদেরও ছেলেমেয়ে আছে, আর ছেলেমেয়েদের বিয়েও হয় কখনো-সখনো। কিন্তু বিয়েটাকে খুব সুনজরে দেখতে পারে না সকলে।

পারে না তার কারণ এ নয় যে ওরা অসামাজিক জীব। কারণটা অর্থনৈতিক। ওদের সমাজে শেষ ভরসা হল একটি ভরা-বয়সের মেয়ে। নিজের হোক পরের হোক, তফাত নেই কোন। মা-মাসীর রোজগারে ভাটা পড়লে ভয় কিসের? মেয়ের যৌবনের জোয়ার মানেই তো রোজগারেও জোয়ার।

কিন্তু দু-একটা মেয়ে হঠাৎ একসময় বেঁকে দাঁড়ায়।

চোখ কপালে ওঠে বিপত্তারিণীর। বিপত্তারিণী অবশ্য নাম নয়, আসল নামটা যে কী ছিল তা আর মনেই নেই কারও। বয়সকালে যতবার পাড়া বদলেছে ততবার নাম, তারপর এ তল্লাটে যখন ব্যবসা জাঁকিয়ে বসল তখন থেকে সবাই ঠাট্টা করে নাম দিল—বিপত্তারিণী। ব্যবসাটা মন্দ চলে না। আইন কানুনের যত কড়াকড়ি হচ্ছে, বিপত্তারিণীর ততই লাভ। দিশী বিলিতী পাঁচ রকমের মদ রাখে বিপত্তারিণী। রাত্তিরে মদের দোকানগুলো

যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন অনেকে ছুটে আসে তার কাছে। বাড়তি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। লুকোচুরির কাজ, কিন্তু থাকে দুপয়সা। সত্যি বলতে কি, শেষ বয়সে মেয়ের রোজগারে খাবার লোভও নেই, প্রয়োজনও হবে না বিপত্তারিণীর। তা বলে সমাজ-ছাড়া হবে কেন তার মেয়ে।

চিরকাল যা দেখে এসেছে, বাকী দিন কটাও তাই দেখে যেতে চায় বিপত্তারিণী। উঠতি বয়সে অমন অনেক কথা মনে হয়, অনেক স্বপ্ন ও নিজেও দেখেছিল। তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে ভুল ভেঙে গেছে, বুঝেছে যে যার নিজের নিজের ফুটপাথ ধরে চলাই ভাল। তাই সুর্মাকে ভুল করতে দিতে চায় না। সোনাদানায় গা মুড়ে বেশ রবরবা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে মেয়ে তার, এইটুকু দেখে যেতে পেলেই যেন খুশী হয় বিপত্তারিণী। আর বিয়েই যদি করতে হয় তো শেঠেদের সেই ছোকরা বাবুটি—

তা নয়, সুর্মার মন পড়েছে রতনের ওপর। এ পাড়ারই ছেলে, এ পাড়াতেই গান শিখিয়ে বেড়ায়। গলির মধ্যে চায়ের দোকানটা চালায় রতনের মা। দোকানটা ছিল এক হিন্দুস্থানীর, রতনের মার কাছে আনাগোনা ছিল তার। কলেরা না বসন্ত কী হয়ে যেন মারা যায় লোকটা, তারপর থেকে ওটা রতনের মা চালিয়ে আসছে।

রতনের দোকান-টোকান ভাল লাগত না। গান গাইতে পারত ভাল, হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শেখাত পাড়ার মেয়েদের।

যে যা পারত দিত মাইনে, রোজগার মন্দ হত না।

সবচেয়ে বড় রোজগার হয়ে গেল সুর্মা।

সুর্মাকে গান শেখাতে শুরু করেছিল সে খুব ছেলেবেলা থেকে। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে সকলের অজ্ঞাতে হঠাৎ বড় হয়ে উঠেছে সুর্মা, তা রতন লক্ষ্যও করে নি।

ও সব অত লক্ষ্য করেও না রতন। এই পাড়ায় মানুষ, জন্মে থেকে অনেক-কিছু দেখছে, অনেক-কিছু শিখছে, তাই সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে। কার বয়স বাড়ল, কার বয়স ছাড়ল—এ সব খোঁজই রাখে না।

তবু হঠাৎ একদিন তার মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। সুর্মার চোখে, সুর্মার হাসিতে, এমন কি তার গলার স্বরেও কী যেন একটা নতুন নতুন ঠেকল। রতন যাকে রোজ দেখে, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, এ যেন সেই সুর্মা নয়। অন্য কেউ।

গান শেখাতে শেখাতে এক এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রতন। কী যেন ভাবে। আর তা দেখে মুচকি হাসে সুর্মা।

এমনি ভাবেই চলছিল। বিপত্তারিণীর যে চোখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু এমন ধারার ইয়ারকি ফাজলামিকে কোনও গুরুত্ব দিলে চলে না ওদের। তাই দেখেও দেখেনি।

কিন্তু এমন একটা সাংঘাতিক কথা সুর্মার কাছে শুনতে পাবে, বিপত্তারিণী কোনদিন কল্পনাও করেনি।

দুম্ করে একদিন সুর্মা বলে বসল, রতন বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

চোখ কপালে উঠল বিপত্তারিণীর : কী করবে ? বিয়ে ? ওই রতন ?

অট্টহাসি হেসে উঠল বিপত্তারিণী। মোটাসোটা থসথসে চেহারাটা কেঁপে কেঁপে উঠে আরও কুৎসিত দেখাল। নিজের মেদবহুল দু হাতে চেপে বসে আছে সোনার তাগা, গলায় মোটা বিছে হার, সেগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বিপত্তারিণী বললে, তা এগুলো পরিয়ে দিতে হবে তোকে, তাই না!

ঠাট্টা বুঝে চুপ করে রইল সুর্মা।

বিপত্তারিণী হেসে বললে, তারপর এগুলো বেচে দু দিন পরে আবার ফিরে আসবি, এই তো!

মেয়ের কথা শুনে তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। বিয়ে করবে সুর্মা ? তাও রতনকে ?

সুর্মা ধীরে ধীরে বললে, কিছু চাই না তোমার কাছে, ফিরেও আসব না কোনদিন।

—অ, রতন বুঝি বাসা করে নিয়ে যাবে ? কথাগুলো বিছুটির মত ছিটিয়ে দিলে বিপত্তারিণী।

কিন্তু গায়ে মাখল না সুর্মা। বললে, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না আমি। এ পাড়াটা আমার বিষ লাগে ।

হঠাৎ যেন একটা ঘা খেল বিপত্তারিণী। রাগে জ্বলে উঠল তার সর্বশরীর। বললে, দেখ্ সুর্মো, নাটক-নবেলের মত কথা বলিসনে, হাড় জ্বলে যায় শুনলে। বলে দপ দপ করে পা ফেলে চলে গেল বিপত্তারিণী চায়ের দোকানটার দিকে। অর্থাৎ রতনের মায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

কিন্তু রতনের মায়ের কোন আপত্তি নেই। এমন বিয়ে তো কতই হয়েছে তাদের পাড়ায়। হবে না কেন ? বিয়ের পর কেউ সরে গেছে, ঘর-

সংসার করেছে, আবার কেউ বিয়ে করেও ব্যবসা ছাড়েনি। রতন যদি বিয়ে করে এখান থেকে চলেই যায় তো কী অন্যায় হবে?

সুর্মা দেখতে একটু সুশ্রী ছিমছাম তাই এত আপত্তি বিপত্তারিণীর, তা বোঝে সবাই।

পর পর দিনকয়েক কান্নাকাটি ঝগড়া বিবাদ চলল। তারপর একদিন সকলের চোখের সামনে দিয়েই সুর্মা আর রতন চলে গেল।

ও-পাড়া ছেড়ে দিয়ে এসে বাসা করল। গলির মধ্যে নিচের তলায় একখানা ঘর, একেবারে বস্তির গায়ে।

নতুন ঘর-সংসার পাতার স্বপ্ন দেখল সুর্মা। রতনের উৎসাহও কম নয়।

রতনের মা এসে যোগাড়যন্তর করে দিয়ে গেল, উপদেশ দিয়ে গেল একরাশ। কিন্তু ফিরে গিয়ে সাতটা দিনও পার হল না। খবর পেয়ে ছুটে গেল রতন। কিন্তু তখন সব শেষ।

চায়ের দোকানটা নিয়ে বিপদে পড়ল রতন। গান শেখাবে, না দোকান দেখবে?

সুর্মা বললে, না। ও-পাড়ায় আর গান শেখানো হবে না।

রতন হাসল: ও-পাড়ায় না শেখালে আর কোথাও কাজ পাব নাকি? ভদ্দর পাড়ায় অচেনা অজানা লোক রাখবে কেন?

সুর্মা বললে, তবে দোকানটা এদিকে কোথাও তুলে আন, দোকানের রোজগারে বেশ চলে যাবে।

রতন আপত্তি করলে: চালু দোকান ছেড়ে দিয়ে এদিকে করলে চলবে কিনা কে জানে!

—চলবে, চলবে। সুর্মার কথাটাই যেন সবচেয়ে বড় যুক্তি।

বোঝাবার চেষ্টা করল রতন। বললে, ও-দোকানটাই চালাই এখন, ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে এদিকে একটা শুরু করা যাবে। এ দোকানটা দাঁড়ালে তখন ও পাড়ারটা তুলে দেব।

সুর্মার কিন্তু তাতে আপত্তি। যে পাড়াটাকে ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, যে জীবনকে ছেড়ে চলে এসেছে, তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে রতন চলে গেল শেঠেদের সেই ছোকরাটির কাছে। গঙ্গাধরকে ও-পাড়ায় একদিন রতনই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বড়

লোকের ছেলে, তিন-তিনটে বাড়ি, টাকার শেষ নেই। দু-একটা ভাল খবর-টবর দিলে দু-চার টাকা রতনকে দিত গঙ্গাধর।

বৈঠকখানায় বেরিয়ে এসে রতনকে দেখে গঙ্গাধর প্রথমটা তাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, কোন নতুন খবর-টবর।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির হাতাটা সরিয়ে হাতে রিস্ট-ওয়াচের সোনার চেনটার কড়া লাগাতে লাগাতে গঙ্গাধর প্রশ্ন করলে, কী খবর রতন?

হাত কচলাতে কচলাতে রতন বললে, আজ্ঞে, খবর একটা আছে। বিয়ে করেছি।

—বিয়ে? তুই? আতকে উঠল যেন গঙ্গাধর।

বোকা-বোকা হাসি হেসে রতন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যে রাতে বিয়েতে মদ বেচত বিপত্তারিণী, তার মেয়ে সুর্মা।

—হুঁ। বলে চুপ করল গঙ্গাধর। অর্থাৎ আরও কিছু শুনতে চায়।

রতন বললে, তা বউটার জন্যে ও-পাড়া ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। রোজগারপাতি নেই—

—তা আমি কী করব? গঙ্গাধর যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

রতন হাত কচলাতে কচলাতে বলে, কিছু টাকা দিতেন তো একটা চায়ের দোকান করতাম।

গঙ্গাধর তাকাল রতনের মুখের দিকে, কী যেন খুঁজল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কোথায়?

—আজ্ঞে, আমার ওই বাসার সামনেই একটা ঘর আছে খালি, ওইখানেই করব ভাবছি।

—কতটাকা লাগবে?

রতন বললে, উপস্থিত একশো টাকা পেলেই—

কথা শেষ করতে দিল না গঙ্গাধর। বললে, ঠিক আছে, কাল গিয়ে ঘরটা দেখে আসব, তারপর—

—আজ্ঞে, কখন আসব তাহলে?

বিনয়ে গলে পড়ল রতন। এত সহজে টাকাটা পেয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সে। তাই মনটা খুশী হয়ে উঠল। এত খুশী হল যে পরের দিন গঙ্গাধরকে দোকানঘরটা দেখিয়ে এনে একেবারে তার একতলার ছোট্ট ঘরখানার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ির দরজা খুলে বললে, আজ্ঞে, একটু চা-টা খেয়ে যাবেন না?

—তাই চ। নেমে পড়ল গঙ্গাধর।

তারপর সুর্মাকে দেখল। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন ছিমছাম সুন্দর মেয়েটা এতকাল ও-পাড়ায় ছিল অথচ খবরটা দেয়নি রতন? মনে মনে একটু রাগও হল, একটু ঈর্ষাও হয়তো বা।

রতন পরিচয় করিয়ে দিল: ইনি গঙ্গাধরবাবু, টাকা দিচ্ছেন তোমার সেই দোকান করবার।

ইনিই তাহলে টাকাটা দিচ্ছেন? কৃতজ্ঞতার চোখে তাকাল সুর্মা। বললে আপনাদের মত লোক থাকতে আমাদের আর ভয় কী বলুন?

—না, না। গঙ্গাধর অন্তরঙ্গ স্বরে বলে ওঠে, আমরা থাকতে তোমাদের কোনও ভয় নেই।

ভয় নেই বলল বটে গঙ্গাধর, কিন্তু ভয় যেন বেড়ে গেল সুর্মার।

শেঠেদের এই ছোকরা বাবুটিকে দূর থেকে কয়েকবার দেখেছে সে এর আগে, ও-পাড়ার অনেকে দু-একটা রসিকতাও করত গঙ্গাধরকে নিয়ে।

কিন্তু সামনাসামনি এই প্রথম দেখল সুর্মা। না, লোকটা ভালই।

রতনের বন্ধু নিশ্চয়ই, তা না হলে দোকান করবার জন্যে এতগুলো টাকা দিয়ে দেয়।

রতন ফিরে আসতেই সুর্মা বললে, বাবুটি লোক ভাল। তোমার বন্ধু বুঝি?

রতন বললে, হ্যাঁ, বন্ধু বলতে পার, অনেকদিনের। তবে খুব বড়লোক তো। তাই একটু আপনি আজ্ঞে করি, এই আর কী।

সুর্মা বললে, তা টাকা যখন দিচ্ছেন, দোকানটা ভাল করে চালাতে হবে।

বলে নিজেই উঠে-পড়ে লাগে সুর্মা। দোকানঘরের চুনকাম থেকে শুরু করে কাচের গেলাস কেনা পর্যন্ত সব-কিছু নিজে দেখে শুনে করে দেয়।

প্রথম প্রথম নিজেও দোকানের দু-একটা কাজ করেছিল, খদ্দেরগুলো বড় বেশী ক্ষিদে-ক্ষিদে চোখে তাকায় বলেই পর্দার আড়ালে চলে গেল সুর্মা।

ও যেখানে মানুষ হয়েছে সেখানকার মেয়েরা কারও চোখকে ভয় পায় না। কিন্তু সুর্মা যে সে জীবনটাকে ভুলে যেতে চায়।

সুর্মা বোধ হয় সত্যিকার ভালবেসে ফেলেছে রতনকে। এমনভাবে ভাল-বেসে ফেলেছে যে অতীতের আতঙ্ক দেখলেই ভয় পায়। সব ভুলে গিয়ে ও নতুন করে ঘরসংসার বাঁধতে চায়। সুখী হতে চায় শুধু রতনকে নিয়ে।

চায়ের দোকানটায় লাভ কিন্তু তেমন হয় না। একটু একটু করে ধারের অঙ্ক বেড়ে ওঠে আর একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে গঙ্গাধর।

মাঝে মাঝেই আসে সে রতনের বাড়িতে। আর সুর্মাও বেশ বুঝতে পারে কার টানে ছুটে আসে গঙ্গাধর। দোকানের ভালমন্দ নিয়ে সুর্মার সঙ্গে, রতনের সঙ্গে এমনভাবে আলোচনায় মেতে ওঠে গঙ্গাধর, যেন তারই দোকান, যেন লাভ লোকসানের ওপর তার ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে। প্রথম প্রথম কোনও সন্দেহ হয়নি সুর্মার। রতনের বন্ধু, টাকা ধার দিয়ে রতনকে দোকান করে দিয়েছে, ভয় পাবার কারণ নেই। আর ভয় সত্যিই কাউকে পায় না সুর্মা। নিজের ভালমন্দ নিজেই বোঝে। বিরক্ত হয়ে ও যার দিকে তাকায় তার সাধ্য নেই ফিরে তাকাবার। আসল ভয় রতনকে। কখন কী ভুল বোঝে।

সুর্মা জানে, ও ও-পাড়ার মেয়ে। ওর মা সারা জীবন ব্যবসা করেছে। ছেলেবেলা থেকে সকলকেই ব্যবসা করতেই দেখেছে ও। তাই ওর সব সময়ে ভয়, রতন না ওকে ভুল বোঝে, ওকে অবিশ্বাস করে। ভুল বোঝা অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস করারই কথা। তবু সুর্মা যে অন্য ধরনের, অন্য জাতের মেয়ে তা রতন বুঝবে কী করে!

এদিকে ঘন ঘন যাতায়াতের ফাঁকে গঙ্গাধর যেন কেমন কেমন চোখে তাকায় তার দিকে। যেন ইশারায় ইঙ্গিতে কী বলতে চায়।

এক-এক সময় রাগ হয় সুর্মার। ইচ্ছে হয় তার মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে। পারে না। কেমন একটা সঙ্কোচ।

দু-একদিন ভেবেছে রতনকে বলবে, তোমার বন্ধু লোক ভাল নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি। কী জানি, যদি রতন তারই দোষ দেখে। যদি ভাবে, ও-পাড়ার মেয়ে, তার আবার এত সতী-সতী ভাব কেন!

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত আর বলতে সাহস পায় নি। আর বলেনি যে, ভালই করেছে।

চায়ের দোকানটা আর চলে না। রেখে লাভ নেই। শুধু ধারের অঙ্কই বেড়ে চলেছে। আর যতই ধার বাড়ে ততই গঙ্গাধরকে ভয় পায় সুর্মা।

রতনকে বলে, ও দোকান তুলে দাও তোমার। অন্য কিছু চেষ্টা কর।

হাসে রতন। অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিল ও। সুর্মাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে ভেবেছিল।

এদিকে একটা ছেলে আসছে সুর্মার কোলে। কিন্তু সুর্মার চেহারায় সে জলুস নেই। চোখ দুটো যেন বসে যাচ্ছে ক্রমশ। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা হয়ে গেছে সুর্মার।

এ-সবই দেখতে পায় রতন। দেখেও কিছু করবার নেই।

বলে, ও-পাড়াতেই ফিরে যাও সুর্মা, তোমার মায়ের কাছে।

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকায় সুর্মা। যেন সম্ভব হলেই দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে ফেলত সে রতনকে। তিল তিল করে যদি না খেয়ে মরতেও হয় তবু ও-পাড়ায় ফিরে যাবে না সুর্মা। ওদের হাসি-ঠাট্টা, বিপন্ন'গিনীর শ্লেষ সহ্য করতে পারবে না বলেই কিনা কে জানে। হয়তো ত নয়। ওই জীবনটাই পছন্দ নয় তার। ওই জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

নতুন বাসাটায় উঠে এসে সেই সভ্যতা যেন নতুন করে চোখে পড়েছে তার। আশেপাশের পাঁচটা বাড়ির বউ-ঝিদের সঙ্গে দেখা হয়, গল্প করে। দুপুরে দু-একজন বেড়াতে যাবার জন্যে ডাকে।

নানান উপদেশ দেয় তারা। এ সময় কী খাওয়া উচিত, কোন্‌টা উচিত নয়। তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক-এক সময় সুর্মা ভুলে যায় যে, সে এ পাড়ার লোক নয়, অন্য পাড়ার। ভুলে যায় যে এত অন্তরঙ্গতা, এত হাসিঠাটা সব বন্ধ হয়ে যাবে এক মুহূর্তে, যদি কেউ জানতে পারে এ জীবনের অধিকার নিয়ে সে জন্মায়নি।

এখানে যেন অনেক বেশী আনন্দ, অনেক বেশী মর্যাদা। তাই এই জীবনটার ওপর এতখানি লোভ তার। তাই ফিরে যেতে বললেই চটে যায় সুর্মা।

বলে, না-খেয়ে মরব, তবু --

হাসে রতন। দুর্বল অসহায় মানুষের মত হাসে।

কী করবে বেচারী! সুর্মা বোঝে দোষ রতনের নয়। দোষ ভাগ্যের। যে ভাগ্য নিয়ে এসেছিলও, সে পথ থেকে সরে আসতে গিয়েই তো এমন অবস্থা।

গঙ্গাধর আসে। বলে, অন্য কিছু ব্যবসা শুরু কর্ রতন—

কথার সঙ্গে একটু ইশারাও ছুঁড়ে দেয়।

জোড়হাত করে রতন। বলে, ও-কথাটি বলবেন না আজ্ঞে, সুর্মা ও-লাইনে যেতে দেবে না।

কিন্তু কোন্ লাইনে যে যাবে তা ঠিক করতে পারে না রতন। দিন কয়েক একটা ছাপাখানায় কাজ পায়। তারপর আবার বেকার। এটা-ওটা ব্যবসা করার চেষ্টা করে।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে চলে। এদিকে দু-দুটো ছেলে হয়েছে সুর্মার।

চেঁচায় আর কাঁদে ছেলে দুটো। ক্ষিদের জ্বালায়।

সুর্মার চেহারাও একেবারে শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে। মেয়েছেলে বলে মনেই হয় না।

গঙ্গাধর মাঝে মাঝে আসে। খোলাখুলিই বলে, আমার কাছে থাক তো বল সুর্মা, সব ব্যবস্থা করে দেব।

বিরক্ত হয়, ভয় পায় সুর্মা। কিন্তু রাগে না। রাগবার মত শক্তিটুকুও যেন নেই তার।

হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে বলে, আপনি আসবেন না আর, আসবেন না এখানে।

তবু রতনকে কিছু বলতে পারে না সুর্মা। বলতে পারে না, তোমার বন্ধুটিকে আসতে বারণ করো।

বললেও বারণ করতে কি পারত রতন? সে সাহস কোথায় তার, সোজা হয়ে দাঁড়াবার জোর কোথায় শরীরে?

রতনের নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয়, সুর্মাকে বিয়ে করে তাকে ও-পাড়া থেকে নিয়ে এসে ভুল করেছে সে। তা না হলে হয়তো গঙ্গাধরের মতই কারও কাছে থাকতে পেত সুর্মা, কিংবা তার মা বিপত্তারিণীই সব বিপদ তাড়াত।

ক্রমশই যেন ভেঙে মুষড়ে পড়ে রতন। সুর্মা তবু মনে জোর আনতে চায়। রতনকে খুশী করার জন্যে এক-একদিন পুরনো হারমোনিয়মটা টেনে এনে গান গাইতে বলে।

গান গায় রতন। কিন্তু সে গলা নেই। তবু সেই পুরনো দিনের রেশটা মনে পড়ে যায়। মুগ্ধ হয়ে শোনে সুর্মা। চোখের সামনে ভেসে

ওঠে স্বপ্নে-ঘেরা মধুর দিনগুলো—যখন গান শেখাত রতন আর শিখত সুর্মা।

এমনি ভাবে চলছিল দিনগুলো।

তারপর হঠাৎ একদিন ফিরল না রতন।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল সুর্মা। ভাবল, কোথাও কোনও কাজে আটকে পড়েছে। হয়তো কাজ পেয়েছে কোন।

সে-রাতটা আশায় আশায় কাটল। কিন্তু পরের দিনও ফিরল না রতন। পরের পরের দিনও।

এমনি করে আশায় আশায় রতনের পথ চেয়ে দিনের পর দিন কেটে গেল। রতন আর ফিরল না।

কেউ ভাবলে, গাড়িচাপা পড়ে মারা গেছে। কেউ ভাবলে, বউকে ফেলে পালিয়েছে।

ও-পাড়ায় বিপত্তারিণীর কাছেও কী করে যেন খবর পৌঁছে গেল।

ও-মেয়ের আর মুখ দেখবে না ভেবেছিল সে, তবু মেয়েব বিপদেব কথা শুনে এল দেখা করতে।

বললে, ফিরে চ সুর্মো।

সুর্মা হাসল। বলে, যাবার হলে অনেব আগেই যেতাম। তুমি ফিরে যাও। আমি না খেয়ে মরব, তবু—

সেই এক প্রতিজ্ঞা।

উপায় না দেখে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল বিপত্তারিণী।

বিপত্তারিণী যেতে-না-যেতে বিপদ নিজেই এসে হাজির হল।

গঙ্গাধর এসে বললে, আমার কাছে থাকবে তো চল সুর্মা, রতন আর ফিরবে না।

হাসল সুর্মা। বললে, আপনার বাড়িটা তো চিনি। যাবার হলে আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব। বলে গঙ্গাধরকে বিদেয় করে দিল সুর্মা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না সে। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখল ছোট ছেলেটা নড়ছে না। বুকে হাত দিয়ে টের পেল না কিছু।

তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল সুর্মা। বুঝতে পারল ছেলে তার নড়বে না। না-খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে মরে গেছে ছেলেটা।

মরে গেছে ?

চোখ মুছল সুর্মা। তারপর বড় ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল একেবারে গঙ্গাধরের বৈঠকখানায়।

ঠিক এমনি ভাবেই একদিন রতন এসে দাঁড়িয়েছিল। আর এমনি ভাবেই ঘড়ির চেনটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে এসে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গাধর।

সুর্মাকে দেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল গঙ্গাধর। ঠিক এমনটি যেন কোনদিনই আশা করতে পারেনি।

সুর্মা হাসল ম্লান ভাবে। বললে, এলাম।

খুশী হয়ে উঠল গঙ্গাধর। এ মেয়েটা একদিন তার মনে নেশা ধরিয়েছিল। তখন রূপ ছিল সুর্মার। কিন্তু রূপ হারিয়েও দারিদ্রের মধ্যেও মেয়েটা কিসের জোরে সব লোভ জয় করেছিল ভেবে পায় না গঙ্গাধর। যে বার বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার রূপ নেই আজ, তবু তাকেই হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না।

সুর্মা বললে, আমাকে নয়, আমার ছেলেকে বাঁচান।

সুর্মাকে আশ্রয় দিল গঙ্গাধর। দিল যা কিছু চাইতে পারে সুর্মা, যা কিছু বাসনা।

এতদিন শুধু ভালবাসার স্বপ্ন দেখেছিল সুর্মা। এবার দেখতে পেল ঐশ্বর্যের সুখ।

এমনি করেই বছরের পর বছর কেটে গেল। চেহারা বদলে গেল সুর্মার। বিলাসে বৈভবে সারা দেহে তার নতুন করে যৌবন এল যেন। আর সেই যৌবনকে বিকশিত করে তুলল গঙ্গাধরের ঐশ্বর্য। জড়োয়া গহনায়, বহুমূল্য বসন-ভূষণে অপ্সরীর রূপ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে একদিন থমকে দাঁড়াল সুর্মা।

—কে ? রতন ?

রতন কিন্তু তখনও যেন চিনতে পারছে না সুর্মাকে। এই তার সুর্মা ? এমন রূপ তার ?

অথচ রতনের চেহারা শীর্ণ ভিক্ষুকের মত। নোংরা শতচ্ছিন্ন কাপড়। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর উস্কখুস্ক চুল, চোখ দুটো পাগলের মত ঘোলাটে।

রতন চাপা গলায় বললে, হ্যাঁ সুর্মা।

নিজের ঘরে নিয়ে গেল সে রতনকে, বললে, এস, আমার ঘরে এস।

সুর্মার ঘরে ঢুকল রতন, সঙ্কোচের সঙ্গে। তাকাল চারপাশের দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে, দামী দামী আসবাবপত্রের দিকে।

বললে, সুর্মা, এ-সব তোমার? এ-সব?

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ হাসল সুর্মা।

রতন ধীরে ধীরে বললে, আমি সব দেখেছি সুর্মা, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।

সুর্মা প্রশ্ন করে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি এতদিন? কেন ফেলে গিয়েছিলে আমাকে?

চুপ করে থাকে রতন, দু চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। বলে, তোমার জন্যেই গিয়েছিলাম সুর্মা, ভেবেছিলাম, যেমন করেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর এসে নিয়ে যাব তোমাকে—

সুর্মার চোখ দুটোও চিকচিক করে উঠল।

বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন?

—অনেক কষ্ট, সে অনেক দুঃখ সুর্মা। কিন্তু পারলাম না, এত চেষ্টা করেও পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়ে রতন।

হঠাৎ রতনের পিঠে হাত রাখল সুর্মা। বললে, ভেঙে পড়ো না। শোন—

মুখ তুলে তাকাল রতন। বললে, চলে যাবার আগে একবার ছেলেটাকে দেখে যেতে চাই সুর্মা। দেখাবে?

ম্লান হাসি হাসল সুর্মা। সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল। তারপর বললে, শোন, চল, আমাকে নিয়ে চল। আবার জীবন শুরু করব আমরা, নতুন করে চেষ্টা করবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার।

—যাবে, যাবে সুর্মা? কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না রতনের। এমন নির্ঝঞ্ঝাট, এমন আরামের জীবন ছেড়ে সত্যিই যাবে সুর্মা?

—হ্যাঁ, যাব। যাব আমি।

উঠে দাঁড়ায় সুর্মা। তারপর দ্রুত পায়ে ভিতরে চলে যায়: বোস তুমি। এখনই যাব, যাব তোমার সঙ্গে।

বিস্মিত হয় রতন। মনে মনে খুশী হয়। এত ভালবাসা ? এত গভীর টান তার ওপর ?

না, রতন আবার দাঁড়াবে, আবার—

সুর্মার এত টাকা, এত অলঙ্কার, এই মূলধন নিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করবে সে, জীবন শুরু করবে। সুখী হবে। নানা কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রতন। আনন্দে ফুর ফুর করে ওঠে তার মন।

—চল।

সুর্মার কথায় চমকে চোখ তুলে রতন। ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে সুর্মা।

দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয় রতন, কিন্তু পর-মুহূর্তেই সুর্মার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে চমকে ওঠে। এ কী। সমস্ত গহনা খুলে ফেলেছে সুর্মা, পোশাক বদলে এসেছে। একখানা সাদাসিধে শাড়ি আর দু হাতে শাঁখা।

সুর্মা আবার বললে, চল।

বিস্মিত হল রতন: কিন্তু তোমার গায়ের গয়নাগুলো কী হল সুর্মা ? তোমার জিনিসপত্তর ?

হাসল সুর্মা: দুঃখ কষ্টকে তো আমি ভয় পাই না। যত দুঃখই পাই, যত কষ্ট হোক, তোমার সঙ্গেই চলেছি এই তো সবচেয়ে বড় সুখ।

—কিন্তু—কিন্তু সুর্মা, তোমার টাকা, তোমার গয়না এসব না দিলে কী নিয়ে ব্যবসা করব, কী করে দাঁড়াব আবার ?

হঠাৎ যেন চীৎকার করে উঠল সুর্মা। বললে, না না, যে আমাকে সব দিয়েছে, তাকে তো কিছুই দিইনি আমি। কী দিয়েছি ? না না, তার দেওয়া কোনও কিছুই আমি নিয়ে যেতে পারব না —পারব না।

- পারবে না ? কেমন যেন বিরক্ত হল রতন।

অট্ট হাসি হেসে উঠল সুর্মা: না, পারব না, পারব না। যে আমাকে বিশ্বাস করে সব দিয়েছে, আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছে, তার দেওয়া একটা কানাকড়িও আমি নিতে পারব না।

রতন স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুর্মার মুখের দিকে।

। গল্প সমগ্র ।

ষষ্ঠ ঋতু | সমরেশ বসু

মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

সামনের রাস্তাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। সরু রাস্তা, দু পাশে ঘিঞ্জি বাড়ি। রাস্তার ধারে পানবিড়ির দোকানপাট। দক্ষিণে জেলেপাড়া, উত্তরে মালী-পাড়া। মালীপাড়ার মালী আর নেই। এখন নামটি বেঁচে আছে। ভাল কথায় লোকে বলে খারাপ পাড়া। মফঃস্বলের ছোট শহর হলেও, বেচাকেনা, হাট বাজার—বেশ জমজমাট শহর।

মেয়েমানুষটি যে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল ওইখান থেকে মালীপাড়ার শুরু বলা যায়।

পৌষের দুপুর। দেখতে দেখতে রোদ কাত হয়ে গেছে কখন। পাড়াটার পূর্বের বাড়ির চালাগুলি পেরিয়ে কোঠাবাড়ির মাথায় ঠেকেছে রোদ।

মেয়েমানুষটির দরজার মাথায় একটি ছোট সাইন বোর্ড টাঙানো রয়েছে। লেখা আছে, 'শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী. কীর্তন গায়িকা। ভিতরে অনুসন্ধান করুন।'

দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণভামিনী নিজেই। মাজা মাজা রং, দোহারা গড়ন। মধ্য-ঋতু আশ্বিনের নিস্তরঙ্গ ঢলো ঢলো শরীর। বয়সটা অবশ্য গিয়ে ঠেকেছে

তলে তলে আর একটু দূরে। দিনের হিসেবে আশ্বিনের দিন কাবার হয়ে অগ্রহায়ণের একটু শীত ধরেছে সেখানে। একটু রাশভারি, দলমলে কৃষ্ণভামিনী। কপালের সামনে, পাতা পেড়ে চুল এগিয়ে দিয়েছে। সিঁথির সিঁদুর সামান্য। ডাগর চোখে এখনো সলাজ চাহনি, খরতাও আছে। কালো শাড়ি পরনে, গায়ে জামা নেই।

মুখে পান টিপে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণে। চোখে ঠোঁটে রাগ-রাগ ভাব। নাকছাবিটিও নড়েচড়ে উঠছে নাকের পাটায়।

পুব কোণের কোঠাবাড়ির বারান্দা থেকে একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়িয়ে আছ যে কেষ্টদিদি?'

কৃষ্ণভামিনী সেদিকে না তাকিয়ে বলল, 'দেখছি।'

: কাকে?

: মরণকে।

মেয়েটি হেসে বলল, 'বুঝিনি। তোমার বরটিকে তো? তা স মিনসেকে তো দেখলাম, একটু আগে ভেঁপু ফুঁকতে ফুঁকতে, রিকশা চালিয়ে একটা লোক নিয়ে গেল পাড়ার মধ্যে।'

কথা শেষ হতে না হতেই হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণভামিনীর দরজায়। রিকশায় যাত্রী নেই। রিকশাওয়ালা নেমে একটু অপ্রতিভ মুখে হাসল কৃষ্ণভামিনীর দিকে চেয়ে।

কালো মানুষ। পেটা পেটা শক্ত চেহারা। বাবরি চুলও কালো। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। এসব মানুষ একটু বয়স-চোরা হয়। ধরা যায় না কিছু। কালো মুখে ধুলো লেগে রুক্ষ দেখাচ্ছে। সদ্য রিকশা চালিয়ে ফুলে উঠেছে হাত পায়ের পেশী। অপ্রতিভ হয়ে হাসলে তাকে বোকা দেখায়।

ভ্রূ বাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণভামিনী, 'কটা বেজেছে?'

সে বলল, 'এট্টুস দেরি হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণভামিনীর রাগ চড়ল তার কথা শুনে। বলল, 'রিকশা চালিয়ে বাবে, ওই চালিয়ে মরবে। ভগবান তোমার হাতে কেন শাঁখোল দিয়েছিল, বলতে পার?'

সদ্য মেয়েটির কথানুযায়ী বোঝা গেল, লোকটি কৃষ্ণভামিনীর খোলুকি অর্থাৎ খোল বাজিয়ে। নাম গগন। হেসে বলল, 'ভগবানের বিষয় বলে কথা?

কি যে কে হয়, কেউ জানে? পয়সার কাজটা আমাকে করতে হবে তো! না, কি বলো গো।'

বলে পুবের বারান্দার মেয়েটির দিকে তাকাল। কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণচোখের তারা জ্বলে উঠল দপ্‌ দপ্‌ করে। চতুর্থ ঋতু অগ্রহায়ণেও বৈশাখের বিদ্যুৎ-বহ্নি। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'ও আবার কি বলবে? আমিই বলছি, না পোষায় ছেড়ে দিলেই পার। আমার কি শ্রীখোলবাজিয়ের অভাব হবে, না তোমাকে পয়সা আমি দিতে চাইনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী মানছ লোককে, খ্যাপামো করে তবে মরতে আসা কেন এখানে?'

বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণভামিনী। দাঁড়িয়েছিল রাণীর মত, ফিরে গেল ক্রুদ্ধা রাজেন্দ্রাণীর মত। দরজাটির পাল্লা নেই। নইলে বন্ধ করে দিয়ে যেত।

বিমর্ষ হেসে গগন ফিরে তাকাল পুবের বারান্দার দিকে। সে মেয়েটি গগনকে নয়, কৃষ্ণভামিনীকে ভেংচে চলে গেল।

বাড়ির দরজাটি বড়। সেকেলে বড়লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা নেই। পাঁচিল আর দরজার মাথাটা রয়ে গেছে। রিকশাটা ঢুকিয়ে দিল গগন উঠোনে।

ভিতরে তখন কৃষ্ণভামিনী হাঁক দিয়েছে, 'রাধি, ও রাধা, কোথায় গেলি?'

রাধা ছুটে এল ঘরে। ডাগর-সাগর রাধা, কটা রং। ছোট ছোট চোখে ডাগর চোখের ঢুলুনি। ঠোঁট দুটি বড় লাল, একটু স্থূল। কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে হারমোনিয়ামটা টেনে নে।'

রাধা বলল, 'খোলুঙ্কি খুড়ো এল না মাসী?'

কৃষ্ণভামিনী দেয়ালের পেরেক থেকে খঞ্জনি জোড়া পেড়ে ধমকে উঠল, 'তুই বোস্ দিকিনি। শ্রীখোল ছাড়াই হবে। পোষ মাসের আর কটা দিন মাত্তর বাকী। নবদ্বীপ থেকে বাবাজীর চিঠি এসে পড়েছে। দোসরা মাঘ বেরুতেই হবে। আমার কাজ আছে।' রাধা চোরা চোখে মাসীর মুখ দেখে আর কথা বাড়াল না। ওই মুখের কাছে মুখ বাড়ানো যায় না।

প্রতি বছর মাঘ মাসেই কৃষ্ণভামিনী নবদ্বীপে যায়। মাঘ মাস ভোর, ভোর-সকাল নবদ্বীপে, আখড়ায় আখড়ায় মন্দিরে মন্দিরে কীর্তনের আসর বসে। নবদ্বীপের চেহারা বদলে যায়। স্বয়ং বিষ্ণু অবতরণ করেন। লোকে মাঘে যায় প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, মথুরায়। ত্রিবেণীতে কল্পবাস করে। আর

নবদ্বীপে আসেন নামকরা মহাজনেরা, মহাশয় বৈষ্ণবেরা। ত্রৈলোক্য আচার্য, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য, মোহিনী মোহন মল্লিক, এই সব বড় বড় পণ্ডিত, লেখাপড়া জানা, বৈষ্ণব গায়কেরা আসেন। পদ রচনা করেন, ভাঙেন গড়েন, পুঁথি নিয়ে বসেন বড় বড। আসর হয়, এক একদিন এক এক আখড়ায়। সে আসরে স্কুল কলেজের ছাত্র মাস্টার মশাইরাও ভিড় করেন এসে। নবদ্বীপের ওই সব আসরে কৃষ্ণভামিনীর বড আদর। মহাশযেরা স্নেহ করেন মেয়ের মত। বাবাজীরা তাকিয়ে থাকেন সতৃষ্ণ নয়নে। ভক্ত অভক্ত জনতার রক্তে ও আখরের দোলা লাগে।

পানটি নেশার জিনিস। নবদ্বীপেও ভোরবেলা স্নান করে পানটি মুখে দেয় কৃষ্ণভামিনী। ঠোঁট রক্তরেখায় বেকে ওঠে। ধোয়া নীলাম্বরী পবে আঙুল তুলে গায়।

বঁধু, তোমার দেওযা গরবে,
তোমার গরব টুটাব হে।

নবদ্বীপে না গিয়ে পারে না কৃষ্ণভামিনী। আজকাল, শহরে বাজারে আর তাদের বড় একটা ডাক পডে না। বায়স্কোপ থিযেটার, রেডিও রেকর্ড অনেক কীর্তন শোনে লোকে। কত শত মিঠে গলায় বাহারে পদের গান। তা ছাড়া দিন গেছে বদলে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ ও বয়সের ধারায়, যুগটা পাশ কাটিযে গেছে অন্যদিকে। পাডাতে তাদের ডাকতেও নাকি অসম্মান। সাইনবোর্ডটা ঝুলানো আছে এক যুগ ধরে। ওইটি দেখে কোনদিন কেউ ডাকতে আসেনি তাকে। সাইনবোর্ডটির বযস বেড়ে গিযে টিন বেরিয়ে পড়েছে।

তাই নবদ্বীপ যেতে হয়। সেইখানে কিছু বাযনা পাওয়া যায। এখনো দূর জেলা থেকে ডাক আসে। বর্ধমান, বাঁকুডা, আরো তলায় মেদিনী-পুর, উঁচুতে মানভূম -প্রবাসের বাঙ্গালীরা ডাকেন কখনো সখনো। কীর্তনের খোঁজে সবাই নবদ্বীপেই আসেন এখনো। কৃষ্ণভামিনী কাছে না থাকলেও বাবাজীরা ঠিকানা দিয়ে পাঠিযে দেয় এখানে। না গিযে উপায কি!

বছর দুয়েক আগে, রাধামাধব আখড়ার রাধাহরি বাবাজী একদিন গানের শেষে এসে বলেছিল, 'কেষ্ট, আচাষ্যি মশাই বলছিলেন, এবার তোমার আখেরটা একটু দেখতে হয়।'

ধ্বক করে উঠেছিল কৃষ্ণভামিনীর বুক।—'কেন বাবাজী? গান জমেনি?'

বাবাজী বলেছিল, 'রাধেমাধব! এমনটি আর কার জমে গো। আচায্যি বলছিলেন, কেষ্টর বয়স হল। আখেরের কিছু না করলে শেষ বয়সটা...র' একটু থেমেই আবার বলেছিল, 'তোমার কথা সবাই ভাবেন। তাই বলছিলাম, সব গুটিয়ে সুটিয়ে একেবারে নবদ্বীপেই চলে এস। শেষ বয়েসটা রাধামাধবের সেবা করে—'

ধ্বকধ্বকানিটা থেমেছিল, যন্ত্রণাটা বুকের কমেনি কৃষ্ণভামিনীর। শেষ বয়স! যে কথাটি অনেকবার তার রক্তস্রোত বলে গেছে কানে কানে, আজ সকলে মিলে বলছে সেই কথা। সময় হয়ে এসেছে। বেলা যায়, বেলা যায়। কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল, শুধু তার রূপ নয়, আরো কিছু আছে। বিলাপের দুই জায়গায় স্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল। বুক ভরে দম নিয়ে, গলার শির ফুলিয়েও শেষরক্ষে হয়নি।

বাবাজী আরো বলেছিল, 'গলার আর দোষ কি বল। যেখানে আছ, সেখানে থাকলে অনাচার তো একটু হবেই।'

অনাচার অর্থে নেশা ভাং আর শরীর পীডনের ইঙ্গিত করেছিল বাবাজী। একেবারে মিছে বলেনি। কিন্তু নবদ্বীপে এসে থাকলে কি সে সবের কিছু কমতি হবে? একে তো সে-আশ্রয় হবে পরের আশ্রয়। কৃষ্ণভামিনীর তাতে বড় ঘৃণা। আর, রাথহরি বাবাজী যখন ভালোবাসবে, তখন? অমন ঢুলঢুল চোখ বাবাজীর, কেষ্টকে ভাল না বেসে উপায় কি।

সে ভালোবাসার আশ্রয় তো সইবে না তার।

তবে আখেরের ব্যবস্থা করেছিল কৃষ্ণভামিনী। মালীপাড়ার মেয়ে সে, নিজের জীবন তাকে শিখিয়েছে অনেক কিছু। রাধাকে পেয়েছিল সে আট বছর বয়স থেকে। আরো বার বছর খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছে, গান গেয়ে, দেহ পণ্য করে। কীর্তনে দীক্ষাও দিয়েছে অনেকদিন। মালীপাড়ার কারবারে ছেড়ে দেয়নি পুরোপুরি। মেয়েটার রং-ঢং আছে। গলাটি একটু খর, তবে মন্দ নয়। কিন্তু বড় মাথা মোটা। দিন রাত্রই সেজে গুজে আছে। সন্ধ্যে হলেই উঁকি ঝুঁকি মারবে এদিকে ওদিকে। মালীপাড়ার মন্ত্র পড়ছে তো কানে দিবানিশি। এখন রক্তে বড় জ্বালা।

প্রথম দিকে শেখাবার অতটা চেষ্টা ছিল না কৃষ্ণভামিনীর। গত দু বছর থেকে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে সে রাধাকে। তালিম দিচ্ছে চুলের মুঠি ধরে। গত বছর নবদ্বীপের বায়নার জায়গায় জায়গায় নিয়ে গেছল তাকে।

আখেরের ব্যবস্থা করেছে সে। কাউকে বলে দিতে হয়নি। তার গান, গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, তারও যে আখের আছে, সেকথা ভেবে কেন মন পোড়ে।

বঁধু, পীরিতি করিয়া রাখিলে যদি,
অভিসার নিশি কাটে কেন।
না রাখিতে নিশি কাটে না যেন।

খঞ্জনিতে দুবার ঝুন ঝুন করে কৃষ্ণভামিনী বলল, 'নে, মানের গানটা ধর।'

রাধা উস্‌খুস্ করছে। এ বাড়িতে আরো তিন ঘর মেয়ে আছে। এ সময়ে তাদের কাছে বসে রাধা তাদের রাসলীলার কাহিনী শোনে। বলল, 'কোন্‌টা ?'

: কালকে যেটা হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার মনে পড়ছে না মাসী।

কৃষ্ণভামিনী রাগে জলে উঠল। বলল, 'তা তো তোর মনে পড়বে না! চিরকাল বারোভাতারি তোর কপালে আছে, খণ্ডাবে কে।'

তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে গুন্ গুন্ করে উঠল সে।

তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান
সখীর বচনে কমলনয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান।...

রাধা গান ধরতে না ধরতেই, গগন এসে ঢুকল। কৃষ্ণভামিনী চেয়েও দেখল না। রাধার ভ্রূ দুটি নেচে উঠল শুধু।

এ আসরে সে, নিতান্ত বেমানান। ময়লা হাফসার্ট গায়ে, তালিমারা ফাটা ফুলপ্যান্ট পরা রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে কোন মিল নেই এ ঘরের। এ ঘরের সাজানো গোছানো অল্পসল্প জিনিস, পরিষ্কার যুগল শয্যা, সব কিছুতেই বিপরীত।

দেয়াল থেকে খোলটি পেড়ে, কপালে ঠেকিয়ে একটু দূরেই বসল সে। কৃষ্ণভামিনীর চোখের পাতা নড়ল না। কিন্তু খঞ্জনার রিনিঠিনি খোলের বোলে একাত্ম হয়ে গেল। রাধাও গলা ছাড়ল।

গগন লোকটি এ তল্লাটের নয়। বছর দশেক আগে বর্ধমানের এক গ্রাম

থেকে, চলে এসেছে কৃষ্ণভামিনীর পিছনে পিছনে। কৃষ্ণভামিনী গাইতে গিয়েছিল সেখানে।

লোকটির পেছু নেওয়া নজরে ছিল তার। দেখেই বুঝেছিল, অন্তঃসার-শূন্য গেঁয়ো বাউণ্ডুলে। ঘর বউ জোটেনি কপালে। রেস্ত থাকলে একটু আসকারা দিত হয়তো কৃষ্ণভামিনী। মাগনা পীরিতে মন দূরের কথা, সখও ছিল না একটু।

লোকটি কয়েকদিন এদিক সেদিক করে হঠাৎ এসে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে এট্রুস খোল বাজাব ভাই।'

আজকে যেমন অপরাধীর মত হেসে এসে দাঁড়াল, সেদিনও তেমনি করে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কৃষ্ণভামিনীর শ্রাবণের খরস্রোত দেহে, আশ্বিনের ঢল বয়সের হিসেবে। চোখের পাতার নিঃশব্দ ঝাপটাতেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। ওদিকে আবার গগনের একটু চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছিল। বলেছিল, 'আমার রং কালা, ট্যাঁকও কালা, একটু বাজাতে চাই খালি।'

বাজিয়েছিল। বাজিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। তেওড়ার ঢং-এ তুক্কী বাজাতে বাজাতে গোলাপী নেশার মত ঢলেছিল গগন। আর চোখ দিয়ে যেন চাটছিল কৃষ্ণভামিনীকে। দেখে শুনে ভামিনী বং ফিরিয়ে কালেংড়া সুরে গেয়ে উঠেছিল—

মতলবে তোর মন ঠাসা,
ঘরের ভাতে কাগের আশা।
নাগর পথ দেখ হে॥

গগন দমেনি। এক মুহূর্ত থেমে তাল চড়িয়ে দিয়েছিল আড়খেমটায়। এমন বাজিয়েছিল, পথ দেখানো যায়নি একবারে গগনকে।

তারপর বছর চলে গেছে। নানান কাজ করে, গগন রিক্শা কিনে বসেছে এখানে। সারাদিন দুটি কাজ এখন। রিকশা চালানো, ওইটি পেটের। কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে খোল বাজানো, ওইটি শুধু সখ না আর কিছু টের পাওয়া যায়নি দশ বছর ধরে। এখন কৃষ্ণভামিনীরও দরকার হয়ে পড়েছে তাকে। তবে, গগনের ওই লালাঝরা চোখ দুটিকে কোনদিন আসকারা দেয়নি সে। রিকশাওয়ালার কাছে, কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী বেচতে পারেনা নিজেকে। মাগনা মানিনী নয়, কৃষ্ণভামিনীর মান আছে।

মালীপাড়ার মেয়েরা ফোসলায় গগনকে, 'কী আশায় আছ ? না হয় রিকশাই চালাও, আর মেয়েমানুষ নেই এ সোম্সারে !'

আছে। কার ঘরে যাতায়াত নেই গগনের! তার রিকশাওয়ালা বন্ধুরা বলে, 'ওরে শালা কেষ্টভামিনীর মধু যে চলে যাচ্ছে বছরে বছরে। যারা খাওয়ার তারা খেয়ে নিলে। তোকে ব্যাটা পাকাচুল বাছতে হবে ভামিনীর।'

গগন বলে, 'তা জানি। চাকে মধু না থাক, মোম তো থাকবে। ভামিনীর পাকাচুল, সেও যে অনেক ভাগ্য।'

: এই মরেছে, শালা কুত্তা নাকি রে।

গগন হাসে। মাথা গুঁজে সোয়ারি বয়। তখন বোঝা যায়, তারো বয়সে শীতের বেলা লেগেছে।

কৃষ্ণভামিনী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মরণ! রিকশাওয়ালা হলেই অমন নোলা হয়।'

কথায় কথায় গগন দু একবার ভামিনীর বাড়ীতেই থাকবার প্রস্তাব করেছে। খাওয়াটা থাকাটা যদি এখানেই ব্যবস্থা হত মন্দ হত না; ভামিনী উগ্র চণ্ডী মূর্তি নিয়ে তেড়ে এসেছে, 'বেরো বেরো বেরো।'

রাধার ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে। ভামিনী খঞ্জনির খুন্ খুন্ শব্দ থামিয়ে বলে, 'হল না। মুখপুড়ি, একটু হেসে গা। হারমোনিয়া ছাড, খালি গলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা। আগে বল্—'

বলে নিজেই বলে, 'সখি, আমার মন নেই, কাকে বল। আমার চোখ নেই, কাকে দেখাও! আমি বধির, শুনতে পাইনে সই। তবুও ওইখেনে কে দেখা দেয় ? কে, ও ?

সখি কেন কুঞ্জের ধারে দাঁড়িয়ে কালা,
ফিরে যেতে বল্।'

এদিকে গগনের হাত যেন অবশ। খোলে চাটি নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণভামিনীর দিকে। রুখে উঠল কৃষ্ণভামিনী, 'আ মরণ!'

মরবার আগেই ঘিচ্ ঘিচ্ করে খোল কথা বলে উঠল, 'ফিরে যেতে বল্।'

রাধা হাসে মিটমিট করে। জোরে হাসতে ভয় পায়। মাসী গলায় পা দেবে যে!

আশ্চর্য! রাধা চোরা চোখে বিজলী হানে গগনকে। তার কটা রং-এর

শরীরের রেখায় বড় খাঁজ। নেশা করার মত স্থূল টকটকে ঠোঁট দুটিতে যেন মনে মনে কি বলে। দেখেশুনে ঘেন্না করে কৃষ্ণভামিনীর। ছুঁড়ির রুচি বলে কিছু নেই। গগনের রকম সকমও তেমনি। রাধার হাসিতে ঢুলে ঢুলে খোল বাজায়।

বেলা গেল। পৌষের বেলা, এল কখন, গেল কখন, কে জানে। এর মধ্যেই ঘরের মধ্যে মশার শানাই বাজছে। স্থির হয়ে বসতে দেয় না একদণ্ড। ঘরে ঘরে, ধোয়া মোছা, সাজাগোজা চলেছে। বাতি জ্বলছে বারোবাসরে।

গান শেখানো শেষ হল, গগন উঠতে যাবে, কৃষ্ণভামিনী বলল, 'রাধি, রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস কর, ওর খোল বাজাবার কত চাই।'

গগন বলল, 'খুব রেগে গেছ বাপু। দশ বচ্ছর যখন দেওনি, থাক। সবটা একসঙ্গেই দিও না হয়।'

কৃষ্ণভামিনী বলল, 'বাকী বকেয়া আমি ভালবাসিনে।' টান মেরে আঁচল নামিয়ে চাবির গোছা খুলতে খুলতে বলল, 'আর রাস্তার মানুষের সামনে, ছোটলোকের মুখে ছোট কথাও শুনতে চাইনে।'

কালো মুখে, হলদে চোখে গগনকে বোবা অসহায় জানোয়ারের মত মনে হয়। এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, 'আচ্ছা বাপু, আর কোনদিন কিছু বলব না। এবার থেকে সময়মত আসব।'

বলে না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। রিকশা বার করতে যাবে, দরজার পাশ থেকে রাধা বলল, 'চললে খোলুক্তি খুড়ো?'

গগন বলল, 'হ্যাঁ লো। তোর মাসীর যা রাগ।'

রাধা বলল ঠোঁট ফুলিয়ে, 'তা বলে আমি তো আর রাগ করিনি।'

গগন বলল হেসে, 'করিবি কেন। তুই তো আর কেষ্টভামিনী নোস্। হ্যা হ্যারে, রাতে কেউ আসবে নাকি তোর মাসীর গান শুনতে?'

: আজ? হ্যাঁ, ওপারের মথুর ভট্‌চায আসবে রাত দশটায়।

: থাকবে বুঝি রাত্রে?

: কী জানি। তুমি আসবে?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গেল গগন। রাস্তার উপর থেকে কে একজন শিস দিয়ে উঠল রাধার দিকে চেয়ে। রাধা হাসল। মালীপাড়া জমে উঠেছে শীতের সন্ধ্যায়।

জুড়িয়ে এল রাত দশটাতেই। শীতে আপাদমস্তক ঢেকে কোঁকাতে কোঁকাতে এল মথুর ভট্টাচার্য। তার পিছনে পিছনে গগন।

কৃষ্ণভামিনী সেজেছে। শান্তিপুরের নীলাম্বরী তার বড় প্রিয়। রংটি ঝাজা ঝাজা হলেও মানায়। মুখে স্নো-পাউডার মেখেছে, জামার গলাটি একটু বেশী কাটা। চওড়া ঘাড়ে ও গলায় বয়সের ঢেউ পড়েছে। ঢাকা পড়েছে একটু চওড়া বিছা হারে। পানরাঙানো ঠোঁট, পায়ে আলতা। ভট্টাচার্যকে দেখে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন ভট্চায মশাই।'

মথুর বলল বুড়োটে গলায়, 'অ্যাঁ? আসব? তা আসব। কিন্তু তোমার সেই মেয়েটি, কি নাম তার? রাধা, হ্যাঁ রাধা। আজ তার মুখে একটু ভাব-সম্মিলনের গান শুনব। তোমার গান তো অনেক শুনেছি কেষ্টভামিনী।'

চকিত ছায়ায় এক মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণভামিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক শোনা হয়েছে, অনেক। গান শুনবে লোকে, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দিন বুঝি আর নেই। ভাব-সম্মিলনের মিলন কোলাকুলির রস উপছে পড়বে না বুঝি আর তার গানে। পরমুহূর্তেই হাসল। পঞ্চম ঋতুর শীতার্ত শুভ্র হাসি যেন। ভাল, ভালই তো। সে আসল, রাধা যে তার সুদ। তারই গান শুনুক লোকে। বলল, 'বেশ তো, শুনবেন, বসেন।'

মথুর বসল। ভূতের মত বেমানান, তালি মারা প্যাণ্টটা পরে হাঁ করে বোকা চোখে গগন তাকিয়েছিল ভামিনীর দিকে। চোখে চোখ পড়তে, চমকে খোল নামাল সে।

রাধা তখন অন্য ঘরে। ভামিনী বলল, 'বসুন, ডেকে নিয়ে আসি।' রাধাকে নিয়ে তখন অন্য ঘরে টানাটানি। ছাড়িয়ে নিয়ে এল ভামিনী। মথুর বলল, 'এস, এস।'

পৌষ সংক্রান্তি গেল। উত্তরায়ণে বাক নিল সূর্য। সোনার মত রোদে, ছায়া বেঁকে গেল একটু দক্ষিণে। দিনের ঘোমটা খুলতে লাগল একটু একটু করে।

দোসরা মাঘ রাধাকে নিয়ে রওনা হল ভামিনী। গগনও এসে ঢাকা বারান্দায় তুলে দিল রিক্শা। শ্রীখোল নিল কাঁধে। সেও যায়। না গিয়ে পারে না। বাজাবার বড় সাধ। দশ বছর ধরে নবদ্বীপে সেও চেনা হয়ে গেছে। কেষ্টভামিনীর খোলবাবাজী তার নাম হয়েছে। গগন বড় খুশী।

আর আজকাল অপরে খোল ধরলে একটু বাধ বাধ লাগে ভামিনীর। গগনের সেখানে বেশ নাম। তবে বেশীদিন থাকতে পারে না। পেট চালাতে হবে তো। দু-চারদিনই বাদেই ফিরে এসে রিকশা নামায়।

মালীপাড়ার মেয়ে পুরুষেরা বলে, 'কেষ্ট খেতে দিল না বুঝি ?'

গগন বলে, 'আমি কেন খাব ?'

রওনা হল তারা। পাড়ার মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, মাগীর ঠ্যাকার দেখলে গা জ্বালা করে।'

স্টেশনে গিয়ে ভামিনী দুটি টিকিটের টাকা দিল গগনের হাতে। গগন তিনটি টিকিট কেটে নিয়ে এল।

নবদ্বীপে আসর জমে উঠেছে সংক্রান্তির দিন থেকেই। সকলেই অভ্যর্থনা করল কৃষ্ণভামিনীকে। আখড়ায়, মন্দিরে, চেনাশোনা বাড়িতে। রাধাকে গত-বছরই সবাই দেখেছে। গতবছর রাধা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে, রাধার কাছ ঘেঁষাঘেঁষির জন্য সকলেই বড় ঠেলাঠেলি করেছে। গগন খোলুঙ্কিকেও চেনে সকলে। রাখহরি বাবাজীর আখডাতেই আস্তানা নিল ভামিনী।

মহাজন মশাইয়েরা এসে ঠাই নিয়েছেন এক এক জায়গায়। আসরে দেখা হয় সকলের সঙ্গে। সকলেই ডেকে ডেকে কুশল জিজ্ঞেস করলেন ভামিনীর।

পরদিনই গানের আসরে বসল ভামিনী। লোকারণ্য হল সেই আসরে। প্রথম দিন। সে কৃষ্ণ-রাধা ভজল, খোল করতাল ভজল, মান্য গণ্য মহাজন গুরুজন ভজল। তারপর ধরল,

প্রভু না বাঁধিয়ে টানো,
কী যে টানে টানো
আমারে জনম ভরিয়ে টানো।
পীরিতি রশিতে বাঁধিয়া টানো।
টানো হে।
ধুলায় পড়ে, কাঁটায় ফুটে
রক্ত ঝরে, জ্বালায় পুড়ে,
মরিব, তবু টানো হে নাথ॥

অনেকক্ষণ গাইল ভামিনী। কিন্তু তেমন সাড়া শব্দ পড়ল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল ভামিনীর। ঠোঁট শুকিয়ে উঠতে লাগল। চোখের

কটাক্ষে সেই রং ফুটছে না। সুরের দোলায় দোলায় হাত উঠছে না তেমন করে।

এক ফাঁকে বাইরে এল। রাখহরি বলল, 'কি হয়েছে তোমার কেষ্ট?'

: কেন?

: গলায় যে তোমার বয়সা ধরেছে।

বয়সা? হেসে উঠল ভামিনী। বলল, 'এ বয়সে আবার বয়সা কি বাবাজী? সে তো ছেলেমানুষের ধরে।'

রাখহরি বলল, 'এ বয়সেও ধরে গো! গলায় তোমার দোআঁসলা জট পাকাচ্ছে কেন?'

দোআঁসলা জট। আচমকা শীতের কাঁপ ধরে গেল যেন ভামিনীর বুকে। হেসে বলল, 'একটু চা খেয়ে নিতে হবে।'

রাখহরি ভামিনীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, 'থাক না। এবার না হয় থাক্। তোমার রাধাকে গাইতে দাও। দেখা যাক্ কেমন শিখেছে।' রাখহরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভামিনীর বাঙ্গা শুকনো ঠোঁটও বেঁকে উঠল। কিন্তু গাইতে বলল রাধাকেই।

রাধা ভ্রূ তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাইল,

আমারে অবলা পেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
বাঁধিলে পীরিতি ফাঁন্দে।
অতি অভাগিনী কুট নাহি জানি
ফান্দ খোলে কি ছান্দে॥

গলা একটু খরো। কিন্তু কাঁচা গলায় চড়া সুরে, আর কাঁচা বয়সের কিশোরী ঠমকে আসর গুন্ গুন করে উঠল। কোথায় ছিল আসরেব এই হাসি ও আনন্দাশ্রু।

অন্ধকার চেপে আসছে কৃষ্ণভামিনীর মুখে। তবু হাসছে। শীত, বড় শীত। গুড়্ গুড় করে কেঁপে কেঁপে উঠেছে বুকের মধ্যে। কেন? চুলের মুঠি ধরে যাকে শিখিয়েছে, সেই রাধার গুণে বলিহারি যাচ্ছে সব। তার সুদের ঐশ্বর্য।

স্বয়ং মোহিনী মল্লিক মহাজন আশীর্বাদ করলেন ভামিনীকে, 'বাঃ বেশ! শুধু আখেরের স্বার্থে এমনটি শিখুনো যায় না মা। তুমি, সত্যি-কারের আখেরের কাজ করেছ।'

বড় সুখ, তবু মুচড়ে মুচড়ে ওঠে বুক। কীর্তন গায়িকা কৃষ্ণভামিনী আর নেই, আখেরের কাজ আছে। এমন মহাজন কেন হল না ভামিনী, সুদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে!

কেবল দুটো দিন গগন চুপচাপ খোল বাজাল। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখল ভামিনীকে। যতবার চোখাচোখি হল, তার হ্যাংলামো দেখে ভামিনী বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে নিল মুখ। মরলে ওকে হাড় কখানা চিবুতে দিয়ে যাবে।

দুদিন পরে, গগন বিদায় নিল। বলে গেল, আবার আসবে মাঘেই। ভামিনী মনে মনে বলল, পাছ ছাড়লে বাঁচি।

তারপর গান চলল আখড়ায় আখড়ায়। রাধা এবার ভাসিয়ে দিল নবদ্বীপ। যা গায়, সবই মানিয়ে যায়। একদিন কৃষ্ণভামিনীরও যেত। যা করত, যা বলত, যা গাইত, তাই ভাল লাগত লোকের। খরস্রোতা কৃষ্ণভামিনীকে দেখছে সে রাধার মধ্যে। সবাই রাধার পিছনে পিছনে।

রাত্রে রাধাকে বুকে নিয়ে আদর করল ভামিনী। বলল, 'রাধি, আমার মান রেখেছিস্ তুই, মান রেখেছিস্।'

বলতে বলতে চোখ ফেটে জল এল। রাধা অবাক হল। একটু বিরক্তও। বলল, 'এ আবার তুমি কি শুরু করলে বাপু। ঘুমোতে দেও।'

ঘুমোতে দিল তাকে। নিজের হাতে ভাল করে কম্বল ঢেকে দিল। হয়, এমনটি হয়। এত জনে জনে, মহাজনে, সবাই মিলে চোখে মুখে তাকে বন্দনা করছে। হবে না। এক সময়ে কৃষ্ণভামিনীরও যে হয়েছিল।

আসরে আর ভাল করে ভামিনীকে কেউ সাধেও না। রোজ গাওয়াও হয়না তার। তবু আসরে থাকতে হয়, বসতে হয়।

বায়না পাওয়া গেছে কয়েকটি। বায়নার সর্ত রাধা, তবে কৃষ্ণভামিনীকে চাই। চাই বৈকি। সুদকে একলা ছাড়বে কি করে সে।

মাঘের শেষে এল আবার গগন। এসে দেখল, ভামিনীর চোখের কোলে কালি। মুখখানি শুকনো। চলতে ফিরতে পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। যেন এতদিনে সত্যি সত্যি বুড়ি হয়ে গেছে সে। পা ছড়িয়ে বসে। তেমন সাজাগোজা নেই। যেন মালীপাড়ার মুকী মাসী।

গগন বলল, 'শরীলটা তোমার খারাপ দেখছি যে!'

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ভামিনী, 'শরীলটা ছাড়া বুঝি আর কিছু দেখতে পাও না ওই মরাখেগো চোখে।'

গগন বলল, 'তাও দেখতে পাই।'

: কী দেখতে পাও?

: তোমার দুঃখু।

: মরে যাই আর কি! উনি এলেন আমার দুঃখু দেখতে, হু!

তারপর হঠাৎ কি হল ভামিনীর। ভীষণ ক্ষেপে উঠল, বলল, 'গতরখেগো মিন্‌সে, আর কবে ছাড়বে পেছন? মলে? তবে আগে মরি, তার পরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেও।'

গগন একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা তাই হবে, তাই হবে, তুমি চুপ কর এখন।'

বলে সরে পড়ল।

মাঘমাসের শেষ কটা দিন কাটিয়ে, যাত্রা শুরু হল। গুটি সাতেক বায়না আছে। কৃষ্ণনগরে,চোত্‌খণ্ডে, রামপুরহাট, ধানবাদে, গোটা দেশটায় প্রায়। সব জায়গাতেই সবাই ছুটে এল কৃষ্ণভামিনীর নাম শুনে। মুঠি ভরে পয়সা আর বাহবা দিয়ে গেল রাধাকে। তবে, কৃষ্ণভামিনীকেও বাহবা দিয়েছে সবাই। সে নইলে, এমন মেয়ে সাকবেদ আর কাব হয়।

চোত্‌খণ্ড অবধি সঙ্গে রইল গগন। ওখানেই কাছাকাছি তার জন্মভূমি। সে বিদায় চাইলে ভামিনী বলল, 'আগে বলনি কেন? আমার খোল বাজাবে কে?'

গগন বলল, 'পেটের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো আমাকে। ট্যাক যে ফাঁক।'

ভামিনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না হয় খেতেই দেব।'

হলদে চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল গগন, 'তা পারব না বাপু আমি। খোল বাজিয়ে যোগাড় করে দিয়ে যাচ্ছি।

সেইদিনই বর্ধমান সহর থেকে জুটিয়ে দিয়ে গেল একজনকে। ভামিনী ঠোঁট উল্টে বলল, 'মুরোদ বড মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আপদ কোথাকার! ও আবার খাবে খোল বাজিয়ে।'

পয়লা বৈশাখ ফিরে এল কৃষ্ণভামিনী আর রাধা। রোজগারে একটু

ভাটা পড়েছিল কয়েকবছর। এবার সুদসুদ্ধ আদায় করে নিয়ে এসেছে ভামিনী। কিন্তু বুকের কাঁটার মত একটা লোক পেছন নিয়েছে বর্ধমান থেকে। যত জায়গায় তারা গেছে, সব জায়গায় গেছে লোকটা। ভাবও হয়েছে খুব রাধার সঙ্গে। রাধার আস্কারাতেই এখানেও ছুটে এসেছে।

বুকে বড় ধুকুপুকু ভামিনীর। গগনের মত হলেও ভাল ছিল। কিন্তু লোকটি অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা উগ্রক্ষত্রিয় ঘরের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে ভামিনীর সঙ্গে। রাধার সঙ্গে পীরিত হয়েছে। একেবারে দূর দূর করতে পারেনি।

ফিরে এসে রাধা বলল, 'মাসী লোকটা কিন্তু দুদিন থাকবে এখানে।'

ভামিনী গম্ভীর গলায় বলল, 'না।'

রাধা ফুঁসে উঠল, 'হ্যাঁ, থাকবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রহিল কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু সে তেজ নেই তার। নিস্তেজ গলায় বলল, 'মুখপুড়ি, বেশী অত্যাচার করলে গলাটা যে যাবে।'

রাধা হুকুমের সুরে বলল, 'যাক। গলার জন্য কি কারুর ঘরে লোক আসা বাদ ছিল?'

অন্ধকার মুখে চুপ করে রইল ভামিনী। বুকটার মধ্যে পুড়তে লাগল চাপা আগুনে। চোখের মণিতে সে আগুন নেই। অঙ্গুলি সংকেতের সেই নিদেশ নেই। রাজেন্দ্রাণী কৃষ্ণভামিনী নেই।

সারা বাড়ি মজা দেখল। রাধা আর তার লোকটিকে নিয়ে গুলজার করল সবাই মালীপাড়ার বুড়ি ছুঁড়ি সবাই বলল 'মাগীর তেজ একটু কমেছে।'

কিসের তেজ। কোন তেজ তো কোনদিন ভামিনী দেখায়নি কাউকে। সে য তাই তো সকলের কাছে তেজ।

গগন এল যথাপূর্ব। আসতে লাগল রোজ আগের মতই। রাধার লোকটি বিদায় নিয়েছে। সবসময় ভামিনীর কথা মানে না রাধা। তবু, ঝগড়া করে, টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে বসে ভামিনী। গান হয়। খোল বাজায় গগন।

রাধাকে দেখাতে গিয়ে গলা খুলতেও লজ্জা করে কেন যেন ভামিনীর। সপ্তমে বাঁধা রাধার গলা টং টং করে বাজে। ভামিনীর গলা বেসুরো

চ্যাবচেবে শোনায় সেখানে। অপ্রতিভ হয়ে খ্যাকারি দেয়, আবার তোলে গলা। বলে, 'নে বল—'

রাধা বলে, 'থাক বাবু, তুমি বরং একটু শুয়ে থাকোগে।'

বলে উঠে যায়। কথা সরে না ভামিনীর মুখে। শুধু বসে থাকে চুপ করে। হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হয়, মুখোমুখি খোল কোলে করে আছে গগন। ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'বসে আছ যে?'

গগন বলে অপ্রতিভ হেসে, 'যদি এট্টু গাও তাহলে বাজিয়ে যাই।'

: কে, আমি? রস যে প্রাণে ধরে না দেখছি। গাইব এবার ঘাটে গিয়ে, পালাও পালাও।

আরো একটি বছর গেল অমনি। বাবার সেই পীরিতের ছেলেটি এসেছে মাসে একবার করে। এ বছরও ঘুরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে মালীপাড়ায়ও এসেছে। এবার ফিরে এসে রাধা দুদিন বাদেই বলল, 'মাসী আমি চলে যাব।'

ধ্বক্ করে উঠল কৃষ্ণভামিনীর বুকের মধ্যে। চার বছর আগে রাংহরির কথায় এমনি ধ্বক্ করে উঠেছিল। গানের গলা নেই, আজ কথা বলবারও গলা নেই ভামিনীর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাধার নির্বিকার দৃঢ় মুখের দিকে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'কোথায় যাবি?'

: ওর সঙ্গে।

ওর মানে, সেই পীরিতের লোকটির সঙ্গে। বুকের মধ্যে কনকন্ করছে কৃষ্ণভামিনীর। পঞ্চম ঋতুর দারুণ শীতে নেমেছে হিমপ্রবাহ। গলা গেছে, গান গেছে, ধমক-টমক গেছে। সুদ যাচ্ছে আজ, আসল খেয়ে গেছে কবে। মথুর ভটচাযরা কবেই ছেড়ে গেছে। টাকা পয়সা সোনাদানাও কিছু বাণীর ঐশ্বর্য নেই। এ বয়সে আর কিসের বেসাতি করবে। কে আসবে এ ঘরে।

ভামিনী বলল, ভীত করুণ চোখে তাকিয়ে বলল কীর্তন গায়িক কৃষ্ণভামিনী, 'যাবি মানে? তোকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করলাম শেখালাম পড়ালাম, আমাকে কোথায় রেখে যাবি?'

রাধা বলল কট্ কট্ করে, 'খাইয়েছ পরিয়েছ বলে আইন নেই যে, তুমি আমাকে চিরদিন ধরে রাখবে। মন চাইছে যাকে তার সঙ্গেই চলে যাব।'

মন চেয়েছে! এ বুঝি ভালবাসা। থিয়েটার বায়স্কোপে এমনি পীরিতের

আজকাল নাকি বড় ছড়াছড়ি। কিন্তু দুদিনে যে তেজ ভেঙে যাবে। ঘরের বউ না, কুলটা। তোকেও যে একদিন এমনি করে এক রাধাকে খাওয়াতে পরাতে হবে।

গম্ভীর গলায় বলল ভামিনী, 'যা।'

এমন আচমকা আর নির্বিকার ভাবে বলল ভামিনী যে রাধাও এক মুহূর্ত থমকে রইল। কুঁকড়ে উঠল ঠোঁট দুটি।

ভামিনী বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখল। একটা রিকশাওয়ালা যাচ্ছিল তাকে বলে দিল, 'তোমাদের গগন রিকশাওয়ালাকে একটু ডেকে দিও তো।'

ওদিকে যাবার তাড়া লেগেছে। আর তিন ঘরের মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। খবর রটেছে সারা মালিপাড়া। সবাই একবার করে দেখতে আসছে রাধা আর তার নাগরকে। রাত দশটায় চলে যাবে ওরা।

ভামিনী বসেছিল বাতি জালিয়ে। মনটা বড় গান করতে চাইছে, পারছে না ওদের কথার ফিস্‌ফিস্‌ খিল্‌খিল্‌ হাসিতে।

একটু পরেই এল গগন। বলল, 'তুমি নাকি ডেকেছ ?'

ভামিনী বলল, হুঁ। বলছিলাম, আমার একটা লোক দরকার। রোজগেরে লোক। আমাকে রাখতে পারে এই রকম।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইল গগন। বৈশাখ মাস। সারা গায়ে ধুলো বালি গগনের। কালো মুখে ঘাম। তারপরে হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল গগন। অন্যদিকে চেয়ে বলল 'তা আমাকে যদি বল···এখনো রিক্‌শাটা চালাই, রোজগারও হয়। আমি তোমার কাছে থাকতে পারি।'

ভামিনী বলল, 'তোমার যদি মন চায়। থাকা তো নয়, আমাকে রাখাও বটে।'

গগন বলল, 'তা তো বটেই। তবে আজকের রাত থেকেই থাকি ?'

কৃষ্ণভামিনীর চোখে যন্ত্রণা ও ঘৃণা। বলল, 'এস।'

: খাওয়াটাও আজ থেকে তাহলে এখানেই হবে ?

: তাই হবে।

গগন বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল। একটু খাটো হলেও কোঁচা দিয়ে আজ ধুতি পরে এসেছে গগন। গায়ে ক্ষারে-কাচা জামা, গলায় একখানি সুতীর চাদর। পায়ে অবশ্য টায়ার কাটা স্যাণ্ডেলটাই আছে।